सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*** (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.**

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).Constitution of India.*

ভারত
জনগণ ও অর্থনীতি
দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
এন সি ই আর টি-র
India: People and Economy
পাঠ্যপুস্তকের
২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

প্রচ্ছদ : সুদীপ দাস

অক্ষর বিন্যাস : সুদীপ দাস

মূল্য: ১০০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

পুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন

১। আশীষ দেবনাথ, শিক্ষক

২। ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, শিক্ষিকা

৩। দোলন চৌধুরী, শিক্ষিকা

৪। রূপা ভৌমিক, শিক্ষিকা

৫। ডঃ সীমা মজুমদার, শিক্ষিকা

৬। শর্মিলা দেববর্মা, শিক্ষিকা

৭। সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

৮। সুদীপ্তা পাল, শিক্ষিকা

ভাষা পরিমার্জনায় ঃ

১। গৌতম রুদ্রপাল, শিক্ষক

২। এমেলী নাগ, শিক্ষিকা

৩। প্রবুদ্ধ সুন্দর কর, শিক্ষক

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory committee for textbooks in Social Sciences, at the higher secondary level, Professor Hari Vasudevan and the Chief Advisor for this book, Professor M.H. Qureshi for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Sciences at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

M. H. Qureshi, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Abdul Shaban, *Assistant Professor*, Centre for Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Deonar, Mumbai

Archana K. Roy, *Lecturer*, Department of Geography, B.H.U., Varanasi

B. S. Butola, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Beena Srikumar, *PGT*, CRPF Public School, Rohini, New Delhi

G. Parimala, *Dean*, College Development Council, University of Madras, Chennai

M.S. Jaglan, *Reader*, Department of Geography, Kurukshetra University, Kurukshetra

P.K. Malik, *Lecturer*, Government College, Bahadurgarh, Jhajjar

Sucharita Sen, *Associate Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Sudeshna Bhattacharya, *Reader*, Department of Geography, Miranda House, University of Delhi, Delhi

Sutapa Sengupta, *Lecturer (Selection Grade)*, Department of Geography, St. Mary's College, Shillong

Member-Coordinator

Aparna Pandey, *Lecturer*, Department of Education in Social Sciences and Humanities, NCERT, New Delhi

Acknowledgements

The National Council of Educational Research and Training acknowledges the contribution of Kalpana Markandeya, *Professor,* Department of Geography, Osmania University, Hyderabad, and Pervez Ahmed, *Lecturer*, P.G. Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Kashmir in the development of this textbook.

Special thanks are due to Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanities, for her valuable support at every stage of preparation of this textbook.

The Council is thankful to the Survey of India for certification of maps given in the textbook. It also gratefully acknowledges the support of individuals and organisations as listed below for providing various photographs, illustrations, cartoons and articles used in this textbook: Zaheen Alam, *Lecturer*, Dayal Singh College, New Delhi, for Fig.10.4; Swapnil Sakhare, Mumbai, for Fig. on page 137, 142; Centre for Dalit and Tribal Studies, TISS, Mumbai, for Fig. on page 140; Janhit Foundation, Meerut for Case Study on page 139; M.S. Jaglan, *Reader*, Kurukshetra University, for Fig. 9.1, 9.4, 9.5; R.K. Laxman (*The Times of India*) for cartoon on page 139; Shveta Uppal, NCERT, for Fig. 4.1, 4.2, 4.3, 5.10 and 10.7; Kalyan Banerjee, NCERT, for Figs. on page 23, 32, 60; Directorate of Extension, Ministry of Agriculture I.A.R.I Campus, New Pusa, New Delhi, for Fig. 5.7, 5.8;The *Times of India*, New Delhi, for Fig. 5.5, 10.1 and for news items on page 12, 29, 57, 82, 137,138, 141, 142; *The Hindu* for Fig. 12.1 and for news items on page 18, 141; CCSHAU, Hisar, for Fig. 5.12; *The Economic Times*, New Delhi, for news items on page 57, 74, 82; *Hindustan*, New Delhi, for news items on page 57, 66, 82, 95, 141; *Dainik Jagran*, Varanasi, for news item on page 57; Ministry of Mines, Government of India for Fig. 12.2 and a figure on page 72; Geological Survey of India for Fig. 7.4; ITDC/Ministry of Tourism, Government of India for Fig. 10.8 and a figure on page 85; National Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs, Government of India for a figure on page 68; Working in the mill no more, Oxford for Fig. on page 91; *India Today* for Fig.10.2; *Competition Success Review*, Year Book, 2006 for Fig. 10.5 and 10.6; Ministry of Shipping, Government of India for Fig. 11.3 and on page 125; *Down to Earth*, CSE, New Delhi for a figure on page 135.

The Council also acknowledges the contributions of Ishwar Singh, *DTP Operator;* Ajay Singh, *Copy Editor;* and Dinesh Kumar, *Computer In-charge*, who have helped in giving final shape to this book. The contribution of the Publication Department, NCERT is also duly acknowledged.

The following are applicable to all the maps of India used in this textbook

1. © Government of India, Copyright 2006
2. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
4. The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh.
5. The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act.1971," but have yet to be verified.
6. The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India.
7. The state boundaries between Uttaranchal & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chhattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
8. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

School Bhuvan–NCERT an Online web portal

Web based online e-learning Geo spatial portal **School Bhuvan–NCERT** (URL: http://bhuvan.nrsc.gov.in/governance/mhrd_ncert/) has been launched by NCERT and ISRO in collaboration to enhance geo spatial skills among students. This online e-learning portal includes thematic maps given in Geography textbooks. This portal enables students to use Geo-spatial technology for better understanding of concepts in Geography. Online activities available on the portal as Level 1, Level 2 and Level 3 encourage learners from Classes VI to XII to develop neighbourhood maps and their attributes on satellite imageries available on **School Bhuvan–NCERT**.

সূচিপত্র

একক I

1. জনসংখ্যা বণ্টন, ঘনত্ব, বৃদ্ধি ও গঠন 1-14
2. পরিব্রাজন প্রকারভেদ, কারণ ও পরিণাম 15-22
3. মানব উন্নয়ন 23-31

একক II

4. মানব বসতি 32-39

একক III

5. ভূ-সম্পদ ও কৃষি 40-59
6. জল সম্পদ 60-71
7. খনিজ এবং শক্তি সম্পদ 72-84
8. শ্রম শিল্প 85-103
9. ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও স্থিতিশীল উন্নয়ন 104-112

একক IV

10. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 113-124
11. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 124-132

একক V

12. ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত কিছু বিষয় ও সমস্যাসমূহ 133-143

পরিশিষ্ট 144-155

শব্দকোশ 156

References 157-158

একক I

অধ্যায় 1

জনসংখ্যা

বণ্টন, ঘনত্ব, বৃদ্ধি ও গঠন

(POPULATION *Distribution, Density, Growth and Composition)*

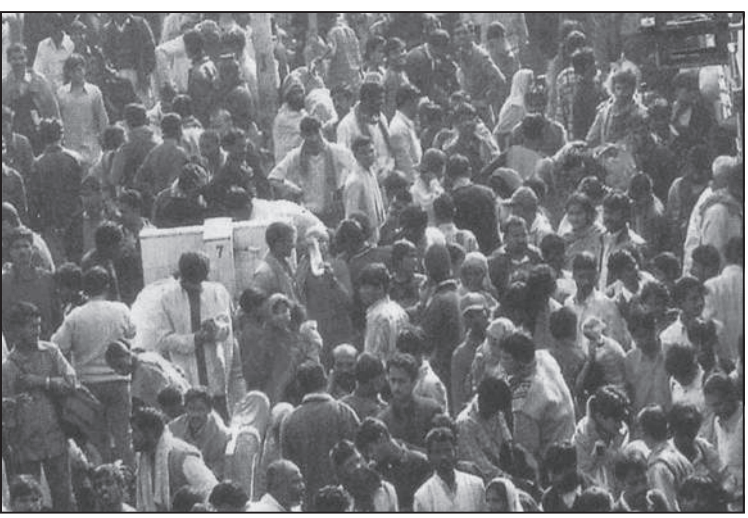

একটি দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জনগণ। বিশ্বে চিনের পর ভারতই হল দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। যার মোট জনসংখ্যা 1,210 মিলিয়ন (2011)। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা থেকেও ভারতের জনসংখ্যা অধিক। প্রায়শই এটি বিতর্কিত বিষয় যে, এ রকম বৃহৎ জনসংখ্যা তার সীমিত সম্পদের ওপর নিশ্চিতভাবে চাপ সৃষ্টি করে এবং দেশের অনেক আর্থ–সামাজিক সমস্যার জন্যও দায়ী থাকে।

ভারত সম্পর্কে তোমার উপলব্ধিটা কী? এটা কি সাধারণ একটা অঞ্চল? এটা কি মানুষের সংমিশ্রণকে সূচিত করে? এটা কি শাসনের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে বসবাসকারী মানুষের অঞ্চল বিশেষ?

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের জনসংখ্যার বণ্টনের ধরন, ঘনত্ব, বৃদ্ধি ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব।

জনসংখ্যা তথ্যের উৎসসমূহ

আমাদের দেশের জনসংখ্যার তথ্য প্রতি দশ বছর পর পর জনগণনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ভারতের প্রথম জনগণনা 1872 সালে সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু এর প্রথম সম্পূর্ণ জনগণনা 1881 সালে সম্পন্ন হয়েছিল।

জনসংখ্যা বণ্টন (Distribution of Population)

চিত্র 1.1 পরখ করো এবং এতে প্রদর্শিত জনসংখ্যার স্থানিক বণ্টনের ধরন বর্ণনা করার চেষ্টা করো। এটি স্পষ্ট যে ভারতের জনসংখ্যার বণ্টনের ধরন অত্যাধিক অসম প্রকৃতির। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ভাগ (পরিশিষ্ট) প্রদর্শিত করেছে যে উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা সর্বাধিক, এরপর মহারাষ্ট্র, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

কাজ

পরিশিষ্ট : i -এ দেওয়া তথ্য দেখো, ভারতীয় রাজ্যগুলো ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলোকে তাদের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত করো এবং খুঁজে বের করো :

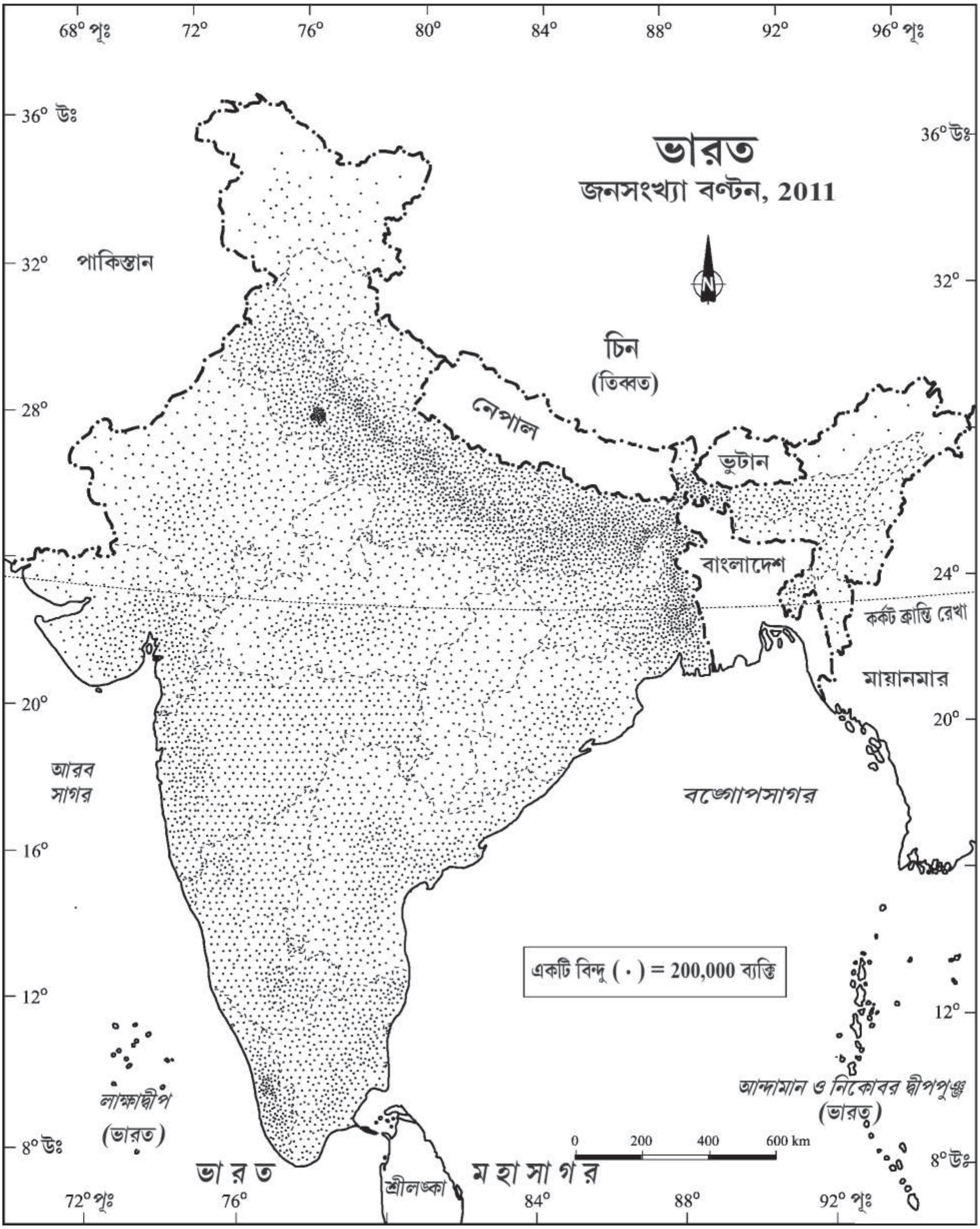

চিত্র 1.1 : ভারত— জনসংখ্যা বণ্টন

বিশাল আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যা সম্পন্ন রাজ্যসমূহ / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহ

বিশাল আয়তন কিন্তু ক্ষুদ্র জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্যসমূহ/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন কিন্তু বৃহত্তর জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্যসমূহ/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহ

সারণি থেকে (পরিশিষ্ট-iA)) দেখা যায় যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক ও গুজরাট ইত্যাদির জনসংখ্যা একত্রে দেশের মোট জনসংখ্যার 76 শতাংশ। অন্যদিকে, বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীর (1.04%), অরুণাচল প্রদেশ (0.11%) এবং উত্তরাখণ্ড (0.84%) এর মতো রাজ্যের জনসংখ্যার আকার খুবই ছোটো।

ভারতের জনসংখ্যার এমন অসম স্থানিক বণ্টন দেশের জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। যতদূর প্রাকৃতিক উপাদান সমূহের সম্বন্ধ রয়েছে, এটি স্পষ্ট যে বিস্তৃত ভূখন্ড সহ জলবায়ু ও জলের সহজলভ্যতা মূলত জনসংখ্যা বণ্টনের ধরনকে নির্ধারণ করে থাকে। ফলস্বরূপ, আমরা লক্ষ করেছি যে উত্তর ভারতীয় সমভূমি, বদ্বীপ ও উপকূলীয় সমভূমিগুলোর জনসংখ্যার অনুপাত দক্ষিণ ও মধ্য ভারতীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ জেলাসমূহ, হিমালয়, উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিমের কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় বেশি। তবে, সেচ ব্যবস্থার (রাজস্থান) বিকাশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ সমূহের প্রাপ্যতা (ঝাড়খন্ড) এবং পরিবহণ ব্যবস্থার (উপদ্বীপীয় রাজ্যসমূহ) উন্নতির ফলে এমন অঞ্চলে জনসংখ্যার মাঝারি থেকে উচ্চ স্তরের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে যা আগে খুবই স্বল্প জনবসতি যুক্ত ছিল।

জনসংখ্যার বণ্টনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল স্থায়ী কৃষির বিবর্তন ও কৃষি উন্নয়ন, মানব বসতির ধরন, পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের বিকাশ। এটি লক্ষ করা যায় যে ভারতের নদী গঠিত সমভূমি ও উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত অঞ্চলসমূহে বৃহত্তর জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। যদিও এই অঞ্চলসমূহে ভূমি ও জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে অবক্ষয়ের চিহ্ন প্রদর্শিত হয়েছে, তবুও মানব বসতির প্রারম্ভিক ইতিহাস এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জনসংখ্যার উচ্চ কেন্দ্রীভবন বজায় রয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালুরু, পুনে, আমেদাবাদ, চেন্নাই ও জয়পুরের পৌর অঞ্চলগুলো শিল্পোন্নয়ন এবং নগরায়ণের কারণে অধিক সংখ্যক গ্রামীণ পরিব্রাজকদের শহুরে আকৃষ্ট করে, তাই এই সব অঞ্চলে জনসংখ্যার উচ্চ কেন্দ্রীভবন দেখা যায়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

প্রতি একক অঞ্চলে ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা জনসংখ্যার ঘনত্বকে প্রকাশ করা হয়। এটি ভূমির সাথে জনসংখ্যার স্থানিক বণ্টনের সম্পর্ককে আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য করে। ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.-তে 382 জন (2011)। 1951 সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব 117 জন/বর্গ কি.মি. থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2011 সালে 382 জন/বর্গ কি.মি. হওয়ায় বিগত 50 বছরে প্রতি বর্গ কি.মি. তে 200 জন এরও অধিক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশিষ্ট (i) এ প্রদর্শিত তথ্য দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের স্থানিক বিভিন্নতার ধারণা দেয়, যার প্রসর অরুণাচল প্রদেশে এত কম যে প্রতি বর্গ কিমিতে 17 জন অন্যদিকে দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিমিতে 11,297 জন। উত্তর ভারতীয় রাজ্যসমূহ, বিহার (1102), পশ্চিমবঙ্গ (1029) এবং উত্তরপ্রদেশের (828) জনসংখ্যার ঘনত্ব উচ্চতর, যদিও উপদ্বীপীয় ভারতীয় রাজ্যসমূহ যেমন কেরালা (859) ও তামিলনাড়ুতে (555) উচ্চতর জন ঘনত্ব দেখা যায়। আসাম, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, ওড়িশার মতো রাজ্যগুলিতে জনঘনত্ব মাঝারি প্রকৃতির। হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যগুলো এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যে (আসাম বাদে) জনঘনত্ব অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রকৃতির যদিও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বাদে) উচ্চ জনঘনত্ব দেখা যায় (পরিশিষ্ট–i)।

জনসংখ্যার ঘনত্ব, যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে, তা মানব ও ভূমির মধ্যেকার সম্পর্কের একটি অশোধিত পরিমাপ। মোট কৃষিযোগ্য জমির ওপর জনসংখ্যার চাপের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ-জমির অনুপাতকে আরও ভালো করে বোঝা যায়, এ জন্য শারীরবৃত্তীয় ও কৃষিজ ঘনত্বকে বের করতে হবে যা ভারতের মতো এক বিশাল কৃষি নির্ভর জনসংখ্যার দেশে তাৎপর্যপূর্ণ।

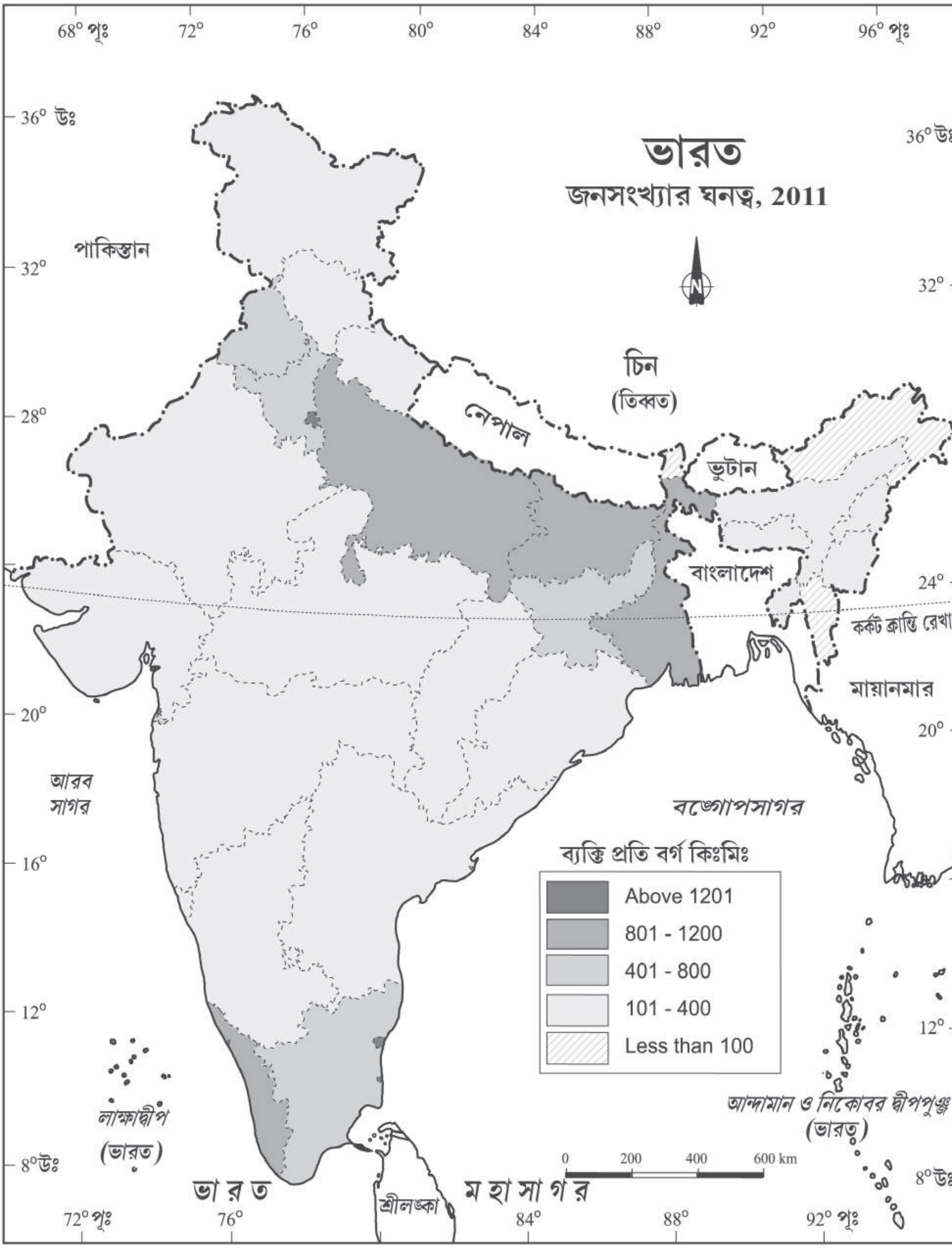

চিত্র 1.2 : ভারত— জনসংখ্যার ঘনত্ব

শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব = মোট জনসংখ্যা/মোট চাষযোগ্য জমি

কৃষিজ ঘনত্ব = মোট কৃষির সঙ্গে যুক্ত জনসংখ্যা/মোট চাষযোগ্য জমি

কৃষি জনসংখ্যায় কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত।

কাজ

পরিশিষ্ট (ii) এর তথ্যের সাহায্যে ভারতের রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলোর শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব ও কৃষিজ ঘনত্বের গণনা করো। জনসংখ্যা ঘনত্বের সাথে এদের তুলনা করো এবং দেখো, এগুলো কীভাবে পৃথক?

জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Growth of Population)

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হল কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যার পরিবর্তন। এর হার শতকরায় প্রকাশিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দু'টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হল— প্রাকৃতিক (natural) ও অভিপ্রেরিত (induced)। যদিও প্রাকৃতিক বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করার জন্য স্থূল জন্ম হার ও মৃত্যু হারকে পরিমাপ করা হয়, অভিপ্রেরিত উপাদানের ব্যাখ্যা যে কোনো প্রদত্ত অঞ্চলের মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গতির পরিমাপের ভিত্তিতে করা হয়। যাই হোক, এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিই কেবল আলোচনা করব।

ভারতের জনসংখ্যা দশকীয় ও বার্ষিক বৃদ্ধির হার উভয় ক্ষেত্রেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব উচ্চ ও দৃঢ় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ভারতের জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার 1.64 শতাংশ (2011)।

জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময় (Population Doubling Time)

জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময় হল বর্তমানের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে যে কোনো জনসংখ্যার দ্বিগুণ হওয়ার জন্য যে সময় লাগে, তাকে বোঝায়।

বিগত এক শতাব্দীতে ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বার্ষিক জন্মহার ও মৃত্যু হার এবং প্রব্রজনের হারের কারণে হয়েছে, এর ফলে এটি বিভিন্ন প্রবণতাকে দর্শায়। এ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির চারটি সুস্পষ্ট পর্যায় শনাক্ত করা যায়:

সারণি 1.1 : ভারতের প্রতি দশকের বৃদ্ধির হার 1901-2011

আদমশুমারী বছর	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার *	
		পরম সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি
1901	238396327	------------	------------
1911	252093390	(+) 13697063	(+) 5.75
1921	251321213	(-) 772117	(-) 0.31
1931	278977238	(+) 27656025	(+) 11.60
1941	318660580	(+) 39683342	(+) 14.22
1951	361088090	(+) 42420485	(+) 13.31
1961	439234771	(+) 77682873	(+) 21.51
1971	548159652	(+) 108924881	(+) 24.80
1981	683329097	(+) 135169445	(+) 24.66
1991	846302688	(+) 162973591	(+) 23.85
2001	1028610328	(+) 182307640	(+) 21.54
2011**	1210193422	(+) 181583094	(+) 17.64

* প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার : $g = \frac{p_2 - p_1}{p_1} \times 100$

যেখানে, P_1 = ভিত্তি বছরের জনসংখ্যা

P_2 = বর্তমান বছরের জনসংখ্যা

** উৎস : Census of India, 2011(Provisional)

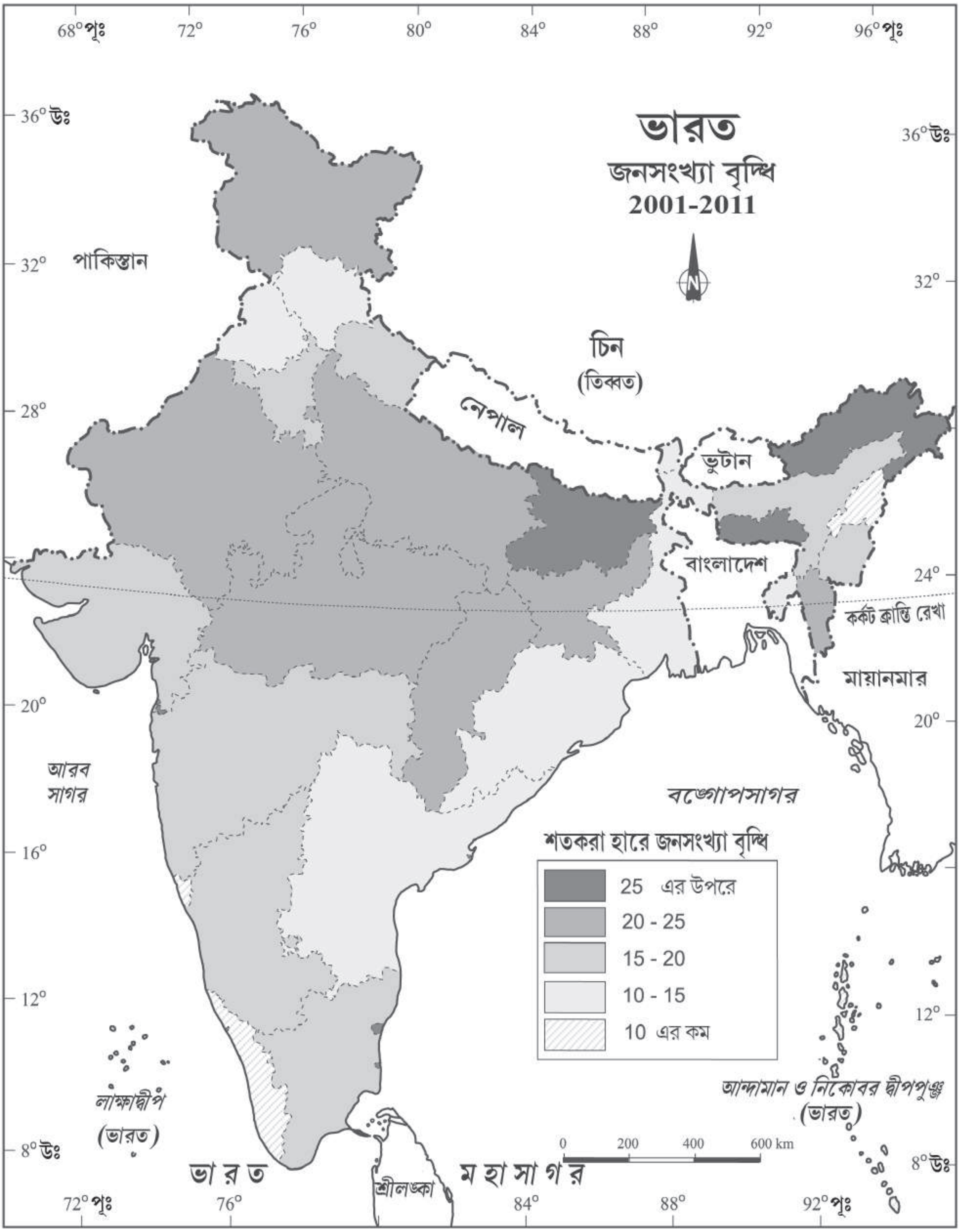

চিত্র 1.3 : ভারতে–জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পর্যায় I : 1901-1921 এর সময়কালকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্থির বা স্থায়ী পর্যায়ের সময়কাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যেহেতু এই পর্যায়ের সময়কালে বৃদ্ধির হার খুব কম ছিল, এমনকি 1911-1921 সালে ঋণাত্মক বৃদ্ধির হার নথিভুক্ত করা হয়েছে। জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে রাখার জন্য দায়ী (পরিশিষ্ট-iii) ত্রুটিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিসেবা, মানুষের নিরক্ষরতা এবং খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তাসমূহের বৃহৎ ও অক্ষম বণ্টন ব্যবস্থা এই সময়ে উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হারের জন্য মূলত দায়ী ছিল।

পর্যায় II : 1921-1951 এর দশকগুলো স্থির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সময় হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশে স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালীর সার্বিক উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছিল। ওই সময়ে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বণ্টন ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটে। পূর্বের পর্যায়ের তুলনায় এই পর্যায়ে স্থূল জন্মহার বেশি ছিল যা উচ্চ বৃদ্ধির হারকে নির্দেশ করে। 1920 এর দশকের বৃহৎ অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এই বৃদ্ধির হার প্রভাবশালী বিষয় ছিল।

পর্যায় III : 1951-1981 এর দশকগুলোকে ভারতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের পর্যায় রূপে উল্লেখ করা যায়, যা দেশে মৃত্যু হারে দ্রুত হ্রাস এবং জনসংখ্যায় উচ্চ প্রজননশীলতার হারের ফলস্বরূপ হয়েছিল। গড় বার্ষিক হার 2.2 শতাংশের বেশি ছিল। স্বাধীনতার পর এটিই সেই পর্যায় ছিল যেখানে একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলো আরম্ভ করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বৃহৎ পরিসরে মানুষের জীবনশৈলির উন্নতি সুনিশ্চিত করে ছিল। ফলস্বরূপ জনসংখ্যার প্রাকৃতিক বৃদ্ধি উচ্চ এবং বৃদ্ধির হার উচ্চতর হয়। এছাড়াও তিব্বতীয়, বাংলাদেশী, নেপালীরা এবং পাকিস্তান থেকে আগত জনগণও আন্তর্জাতিক প্রব্রজনের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বর্ধিত করতে অবদান রেখেছে।

পর্যায় IV : 1981 সালে পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার উচ্চ থাকলেও ধীরে ধীরে তা হ্রাস পাচ্ছে (সারণি 1.1)। স্থূল জন্মহারের নিম্নমুখী প্রবণতা এই জাতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। পরিবর্তে এটি দেশে বিবাহের গড় আয়ু বৃদ্ধি, জীবনের গুণগত মান বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও দেশে উচ্চতর এবং এটি বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে যে—2025 সালে ভারতের জনসংখ্যা 1350 মিলিয়ন ছুঁয়ে যাবে।

তবে, এ পর্যন্ত করা বিশ্লেষণ গড় বৃদ্ধির হারকে প্রদর্শিত করে, কিন্তু দেশে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বৃদ্ধির হারে বিস্তৃত পার্থক্য দেখা যায় (পরিশিষ্ট iv) যা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক বিভিন্নতা (Regional Variation in Population Growth)

1991-2001 এর সময়কালে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হারে সুস্পষ্ট ধরন দেখা যায়।

কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পন্ডিচেরি এবং গোয়ার মতো রাজ্যগুলোতে নিম্ন বৃদ্ধির হার দেখা যায় যা দশকে 20 শতাংশের বেশি হয়নি। কেরালায় (9.4) শুধু এই শ্রেণির রাজ্যেই নয় বরং সম্পূর্ণ দেশের মধ্যে নিম্ন বৃদ্ধির হার নথিভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর মধ্য ভাগে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যের একটানা বলয়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর তুলনায় তুলনামূলকভাবে উচ্চ বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, মধ্যপ্রদেশ, সিকিম, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খন্ডের মতো রাজ্য নিয়ে গড়ে ওঠা বলয়ে গড় বৃদ্ধির হার 20-25 শতাংশ।

2001-2011 সময়কালে প্রায় সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে বৃদ্ধির হার আগের দশকের তুলনায় অর্থাৎ 1991-2001 সাল এর তুলনায় কম পরিমাণে নথিভুক্ত করা হয়েছে। দশকীয় বৃদ্ধির শতকরা হার সবচেয়ে জনবহুল ছ'টি রাজ্যসমূহ যথা— উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে

1991-2001 সালের তুলনায় 2001-2011 সালে হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাস অন্ধ্রপ্রদেশে (শতকরা 3.5 পয়েন্ট) সর্বনিম্ন এবং মহারাষ্ট্রে (শতকরা 6.7 পয়েন্ট) সর্বোচ্চ পরিলক্ষিত হয়। বিগত দশকে 2001-2011 সালে তামিলনাড়ু (শতকরা 3.9 পয়েন্ট) এবং পুদুচেরি (শতকরা 7.1 পয়েন্ট) কিছু বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে।

কাজ

পরিশিষ্ট i এবং iA-এ প্রদত্ত তথ্যের সাহায্যে 1991-2001 এবং 2001-2011 সালের মধ্যেকার বিভিন্ন রাজ্যের/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করো।

তোমাদের রাজ্যের জেলাগুলো/নির্বাচিত জেলাগুলোর পুরুষ ও নারীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির তথ্য নাও এবং যৌগিক লেখচিত্রের সাহায্যে চিত্রিত করো।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর বয়ঃসন্ধিকালীন জনসংখ্যার বৃদ্ধি। বর্তমানে বয়ঃসন্ধিকাল অর্থাৎ 10-19 বছর বয়ঃশ্রেণির ভাগ হল 20.9 শতাংশ (2011), যেখানে কৈশোরকালীন পুরুষের সংখ্যা 52.7 শতাংশ এবং নারীর সংখ্যা 47.3 শতাংশ। বয়ঃসন্ধিকালীন জনসংখ্যাকে যদিও উচ্চ সম্ভাবনাময় যৌবনোচ্ছল জনসংখ্যা রূপে গন্য করা হয়, কিন্তু একই সময়ে যদি তাদের পরিচালনা ও দিক নির্দেশ করা না হয় তাহলে তারা খুবই অস্থিরও হয়ে যেতে পারে। সমাজকে এসব বয়ঃসন্ধিকালের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, এরূপ কিছু সমস্যা হল বিবাহের সময় কম বয়স, নিরক্ষরতা- বিশেষত নারীদের নিরক্ষরতা, বিদ্যালয় ছুট, পুষ্টির স্বল্পপ্রাপ্তি, বয়ঃসন্ধিকালীন মায়েদের উচ্চ হারে মাতৃত্বকালিন মরণশীলতা, উচ্চ হারে HIV ও AIDS সংক্রমণ, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা অথবা বিকলাঙ্গতা, ঔষধের অপব্যবহার ও মদের প্রতি আসক্তি, কৈশোর সুলভ অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি।

এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, ভারত সরকার বয়ঃসন্ধি বয়ঃশ্রেণি উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন যাতে তাদের গুণগুলোকে আরও ভালোভাবে দিক নির্দেশ করা যায় এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। জাতীয় যুব নীতি (The National Youth Policy) হল এর একটি উদাহরণ যা আমাদের সুবিশাল যৌবন ও বয়ঃসন্ধিকালীন জনসংখ্যার সার্বিক উন্নতি অনুসন্ধান করতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

2014 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হওয়া জাতীয় যুব নীতি বা National Youth Policy (NYP–2014) ভারতের যুব সম্প্রদায়ের জন্য এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করে যা হল "দেশের যুব সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে করতে সক্ষম করে এবং তাদের মাধ্যমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতকে তার যথার্থ স্থান খুঁজে নিতে সক্ষম করে।" জাতীয় যুব নীতি- 2014, 15–29 বছরের বয়ঃশ্রেণির ছেলেমেয়েদের 'যুব' বলে সংজ্ঞায়িত করেছে।

ভারত সরকার দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য 2015 সালে জাতীয় নীতিও প্রণয়ন করেছিল যাতে দেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত সমস্ত দক্ষতামূলক কার্যকলাপকে একটি কাঠামো প্রদান করা যায় এবং এগুলোকে সাধারণ মানের মতো করে, চাহিদা কেন্দ্রের সাথে দক্ষতাকে সংযুক্ত করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থান ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও তুলে ধরে। তবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে ধারণা পেতে জনসংখ্যার সামাজিক গঠনের দিকও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

জনসংখ্যা গঠন (Population Composition)

জনসংখ্যা গঠন হল জনসংখ্যা ভূগোলের অন্তর্গত অধ্যয়নের এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র যেখানে বয়স ও লিঙ্গের বিশ্লেষণ, বসবাসের স্থান, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জনজাতি, ভাষা, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা, বৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এই বিভাগে গ্রামীণ পৌর বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম এবং জীবিকার ধরন সম্পর্কে ভারতের জনসংখ্যার গঠন আলোচনা করা হবে।

গ্রামীণ পৌর গঠন (Rural – Urban Composition)

নিজ নিজ বাসস্থান অনুসারে জনসংখ্যার গঠন হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। একটি দেশের জন্য এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যেখানে মোট জনসংখ্যার 68.8 শতাংশ (2011) গ্রামে বসবাস করে।

কাজ

পরিশিষ্ট (iv) এবং iv A-এ প্রদত্ত তথ্যের তুলনা করে ভারতের রাজ্যগুলোর গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার গণনা করো এবং মানচিত্র বিদ্যার পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের মানচিত্রে দেখাও।

তোমরা কি জানো যে, 2011 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে 640,867 গ্রাম আছে, তা থেকে 597,608 টি (93.2 শতাংশ) গ্রাম জনবসতি অধ্যুষিত? যাই হোক, দেশের সর্বত্র গ্রামীণ জনসংখ্যা এক নয়, তোমরা হয়ত বা লক্ষ করেছ যে, বিহার এবং সিকিমের মত রাজ্যগুলোতে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার খুব বেশি। গোয়া ও মহরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি জনসংখ্যা গ্রামে বসবাস করে।

অপরদিকে দাদরা ও নগর হাবেলি ব্যতীত (53.38 শতাংশ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত কম। গ্রামগুলোর আয়তনও যথেষ্ট পরিবর্তিত হতে থাকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ী রাজ্যগুলো, রাজস্থানের পশ্চিমাংশ এবং কচ্ছের রান অঞ্চলে গ্রামীণ জনসংখ্যা 200 জনেরও কম এবং কেরালা ও মহারাষ্ট্রের অংশ বিশেষে এটি 17 হাজার জন। ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার বণ্টন ধরনের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে যে, অর্ন্তরাজ্য (intra-State) এবং আন্তঃরাজ্য (inter-State) উভয় স্তরে নগরায়ণের আপেক্ষিক মাত্রা ও গ্রামীণ পৌর পরিব্রাজন গ্রামীণ জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন নিয়ন্ত্রণ করে।

তোমরা লক্ষ করেছ যে, ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পৌর জনসংখ্যার অনুপাত (31.15 শতাংশ) খুবই কম কিন্তু বিগত দশকগুলোতে এটি খুবই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিকাশের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পৌর জনসংখ্যার বণ্টনেও দেশের সর্বত্র বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

কাজ

পরিশিষ্ট (iv) এবং iv A-এ প্রদত্ত তথ্য তুলনা করো এবং পৌর জনসংখ্যার খুব বেশি ও খুব কম অনুপাতযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করো।

তাসত্ত্বেও প্রায় সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পৌর জনসংখ্যা যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ইঙ্গিত করে যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৌর এলাকা ও গ্রামীণ-পৌর পরিব্রাজন উভয়েরই বিকাশ ঘটেছে। উত্তর ভারতীয় সমভূমি, কলকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালুরু-মাইশুরু, মাদুরাই-কোয়েম্বাটুর, আহমেদাবাদ-সুরাট, দিল্লি-কানপুর এবং লুধিয়ানা-জলন্ধর ইত্যাদি স্থানে পৌর এলাকায় গ্রামীণ-পৌর পরিব্রাজন প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে এবং রেলপথ বরাবর সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির কৃষিগতভাবে স্থিতিশীল অংশটি, তেলেঙ্গানা, সেচবিহীন মধ্য রাজস্থান, উত্তর-পূর্বের প্রত্যন্ত পার্বত্য ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, উপদ্বীপীয় ভারতের বন্যাপ্রবন অঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ বরাবর নগরায়ণের মাত্রা নিম্ন।

ভাষাগত গঠন (Linguistic Composition)

ভারত হল ভাষাগত বৈচিত্র্যের ভূমি, গ্রিয়ারসন (ভারতের ভাষাসংক্রান্ত সার্ভে, 1903 – 1928)-এর মতানুসারে, দেশে 179টি ভাষা এবং 544টি উপভাষা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে, আধুনিক ভারতে 22 প্রকার ভাষা তালিকাভুক্ত এবং বহু ভাষা তালিকাভুক্ত নয়।

কাজ

দশ টাকার নোটে কতগুলো ভাষা রয়েছে সেগুলো দেখো।

তালিকাভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে, হিন্দি ভাষী লোকের সংখ্যার হার সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম যে ভাষা বলা হয় তা হল সংস্কৃত। বোরো এবং মণিপুরী ভাষা (2011)। তা সত্ত্বেও এটি লক্ষ করা গেছে যে, দেশের ভাষাগত অঞ্চলগুলোর সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র সীমানা থাকে না, বরং এগুলো ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাদের সংশ্লিষ্ট সীমান্ত অঞ্চলের সাথে একত্রিত ও অধ্যারোপিত হয়ে যায়।

ভাষাগত শ্রেণিবিভাগ (Linguistic Classification)

প্রধান ভারতীয় ভাষাভাষী লোকেরা চারটি ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। যাদের উপ-পরিবার এবং শাখা বা শ্রেণি রয়েছে। একে সারণি 1.2 থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে।

ধর্মগত গঠন (Religious Composition)

ধর্ম হল সর্বাধিক প্রভাবশালী কারণ যা অধিকাংশ ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। যেহেতু, ধর্ম মানুষের পরিবার এবং সাম্প্রদায়িক জীবনের প্রায় সকল অংশেই ব্যাপ্ত, সেহেতু ধার্মিক গঠন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি 1.2 : আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রেণিবিভাগ

পরিবার বা গোষ্ঠী	উপ-পরিবার	শাখা/শ্রেণি	ভাষা অঞ্চল
অষ্ট্রিক (নিশাদ) 1.38%	অস্ট্রো-এশিয়া	মন-খামের	মেঘালয়, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
		মুন্ডা	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র।
	অস্ট্রো-নেসিয়ান		ভারতের বাইরে।
দ্রাবিড় (দ্রাবিড়া) 20%		দক্ষিণ-দ্রাবিড়	তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা।
		মধ্য-দ্রাবিড়	অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র।
		উত্তর-দ্রাবিড়	বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ।
চিন-তিব্বত (কিরাত) 0.85%	তিব্বত-মায়ানমারি	তিব্বত-হিমালয়ান	জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম
		উত্তর অসম	অরুণাচল প্রদেশ
	সিয়ামি-চাইনিজ	অসম-মায়ানমারি	অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়।
ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য) 73%	ইন্দো-আর্য	ইরানি	ভারতের বাহিরে
		দার্দিক	জম্মু ও কাশ্মীর
		ইন্দো-আর্য	জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া।

উৎস : Ahmed, A. (1999) : Social Geography, Rawat Publication, New Delhi

কাজ

সারণি 1.2 -এর দিকে লক্ষ করো এবং প্রতিটি ভাষাগত গঠনের বিভাগীয় অংশ দেখিয়ে ভারতের ভাষাগত গঠনের একটি পাই চিত্র প্রস্তুত করো।

অথবা

দেশের বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণি বন্টন দেখিয়ে ভারতের একটি গুণগত প্রতীক মানচিত্র প্রস্তুত করো।

দেশে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্থানিক বন্টন দেখায় যে, কিছু রাজ্য এবং জেলা রয়েছে যেখানে একটি ধর্মের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, অন্যদিকে এই একই ধর্ম অন্যান্য রাজ্যগুলোতে সংখ্যায় নগণ্য থাকতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত, জম্মু ও কাশ্মীব, উত্তর-পূর্বের পাহাড়ী রাজ্যসমূহ এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির বিক্ষিপ্ত এলাকা ও গাঙ্গেয় সমভূমি ব্যতীত হিন্দুরা বহু রাজ্যে এক প্রধান গোষ্ঠী রূপে বণ্টিত (শতকরা 70-90 ভাগ এবং এর অধিক)

সারণি 1.3 : ভারতের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ, 2011

ধর্মীয় গোষ্ঠী	2011	
	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ (%)
হিন্দু	966.3	79.8
মুসলিম	172.2	14.2
খ্রিস্টান	27.8	2.3
শিখ	20.8	1.7
বৌদ্ধ	8.4	0.7
জৈন	4.5	0.4
অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মমত বা Other Persuasions (ORP)	7.9	0.7
Religion Not Stated	2.9	0.2

উৎস : Census of India, 2011

বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমরা জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গা ও কেরালার নির্দিষ্ট জেলাসমূহ, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা, দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ এবং লাক্ষাদ্বীপে কেন্দ্রীভূত।

ধর্ম ও ভূ-দৃশ্য (Religion and Landscape)

ভূ-দৃশ্যের উপর ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পবিত্র অবয়ব, কবরখানার ব্যবহার এবং উদ্ভিদ ও প্রাণি সংগ্রহ, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গাছের খাঁজ ব্যবহার করার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়। পবিত্র অবয়বগুলো সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত। এগুলো অসম্পূর্ণ গ্রাম মন্দির থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো হিন্দু মন্দির, স্মৃতিসৌধ মসজিদ বা বড়ো বড়ো মহানগরীতে সুসজ্জিতভাবে পরিকল্পিত গির্জা পর্যন্ত হতে পারে। অঞ্চলটির সম্পূর্ণ ভূ-দৃশ্যকে বিশেষ মাত্রা প্রদান করার পাশাপাশি এই মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, মঠ এবং গির্জাগুলোর আকার, গঠন, স্থানের ব্যবহার এবং ঘনত্বে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

অধিকাংশ খ্রিস্টানধর্মী জনসংখ্যা দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বন্টিত। পশ্চিম উপকূল বরাবর গোয়া, কেরালা এবং মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের পাহাড়ী রাজ্যগুলোতেও ছোটনাগপুর অঞ্চল ও মণিপুরের পাহাড়গুলোতে প্রধান কেন্দ্রীভবন পরিলক্ষিত হয়।

বেশিরভাগ শিখগণ দেশের অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যগুলোতে।

ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ধর্মীয় গোষ্ঠী যথা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ দেশের কেবলমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। জৈন কেন্দ্রীভবন প্রধানত রাজস্থান, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের পৌর এলাকায় লক্ষ করা যায়। অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অধিকাংশ মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রধান্য অন্যান্য অঞ্চলগুলো হল সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ, ত্রিপুরা এবং হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিটি ইত্যাদি।

ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছে জোরো অস্ট্রিয়ান উপজাতি এবং অন্যান্য আদিবাসী আস্থা ও বিশ্বাসের অন্তর্গত ধর্ম। এই শ্রেণিগুলো সারা দেশে ছোট ছোট অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শ্রমজীবী জনসংখ্যার গঠন (Composition of Working Population)

আর্থিক স্থিতি অনুসারে ভারতের জনসংখ্যাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথা— প্রধান শ্রমিক, প্রান্তিক শ্রমিক এবং কর্মহীন শ্রমিক।

এটি লক্ষ করা গেছে যে, ভারতে শ্রমিকদের (প্রধান এবং প্রান্তিক উভয়ই) অনুপাত হল শতকরা মাত্র 39.8 ভাগ (2011) যা

প্রমাণ জনগণনা সংজ্ঞা

প্রধান শ্রমিক হল এমন এক ব্যক্তি যে এক বছরে কমপক্ষে 183 দিন (অথবা ছ'মাস) কাজ করে।

প্রান্তিক শ্রমিক হল এমন এক ব্যক্তি যে এক বছরে কমপক্ষে 183 দিন (অথবা ছ'মাস)-এর কম দিন কাজ করে।

কর্মহীন শ্রমিকের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্টতা প্রদান করে যা হল শতকরা 60 ভাগ। এটি এক আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করে যেখানে এক বড়ো অনুপাত নির্ভরশীল জনসংখ্যা, যা ভবিষ্যতে কর্মহীন বা আংশিক বেকার লোকের বিশাল জনসংখ্যার সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করে।

কাজে অংশগ্রহণের হার বলতে কী বোঝ?

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শ্রমজীবী জনসংখ্যার অনুপাত গোয়াতে শতকরা প্রায় 39.6 ভাগ থেকে দমন ও দিউতে শতকরা প্রায় 49.9 ভাগ পর্যন্ত মাঝারি ধরনের পরিবর্তন দর্শায়। শ্রমজীবীদের অপেক্ষাকৃত শতকরা ভাগ বেশি এমন রাজ্যগুলো হল হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং মেঘালয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দমন ও দিউতে অংশগ্রহণের হার বেশি। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রতীয়মান যে, অর্থনৈতিক উন্নতির নিম্নস্তরযুক্ত অঞ্চলে কাজে অংশগ্রহণে ঝোঁকের হার বেশি থাকে যেহেতু জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক অথবা প্রায় জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য হস্ত সাধিত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

ভারতের জনসংখ্যার (বাক্স দেখো) পেশাগত গঠন (যার আসল অর্থ হল এক ব্যক্তি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিসেবা বা যে কোন প্রকারের পেশাদারী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকে) দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলির তুলনায় প্রাথমিক ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের এক বিশাল অনুপাত দেখায়। মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় 54.6 ভাগ হল কৃষক ও কৃষিজ শ্রমিক। যেখানে কেবলমাত্র 3.8 ভাগ গৃহস্থালি শিল্প এবং 41.6 ভাগ হচ্ছে অন্যান্য শ্রমিক যারা অ-গৃহস্থালি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ ও মেরামত এবং অন্যান্য সেবার সাথে জড়িত। যতদূর পর্যন্ত দেশের পুরুষ ও নারীর পেশার বিষয়ে প্রশ্ন আসে, পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা নারী শ্রমিকের চেয়ে তিন ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে যায় (চিত্র 1.4 এবং সারণি 1.4)।

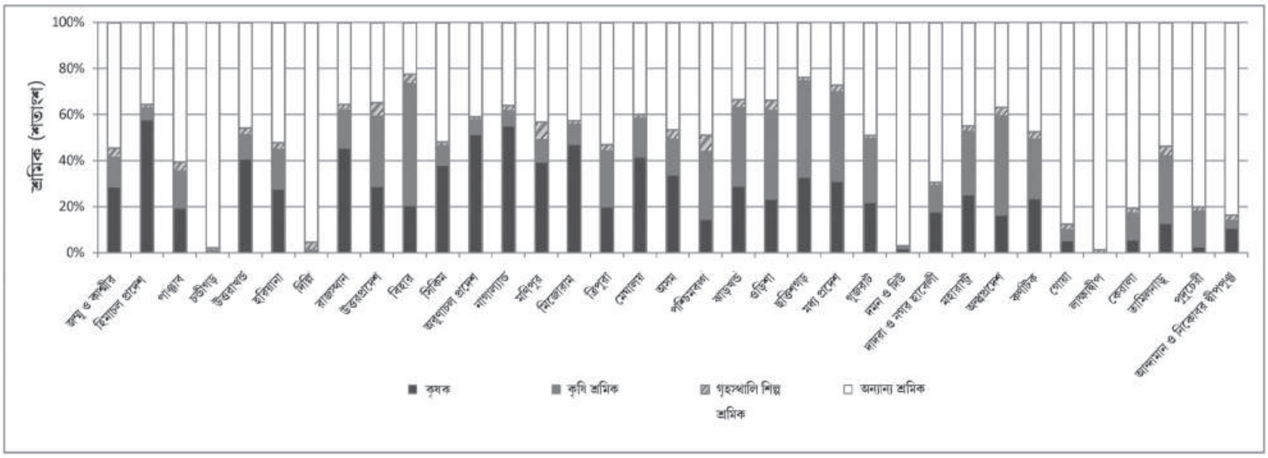

চিত্র 1.4 : ভারত — পেশাগত গঠন, 2011

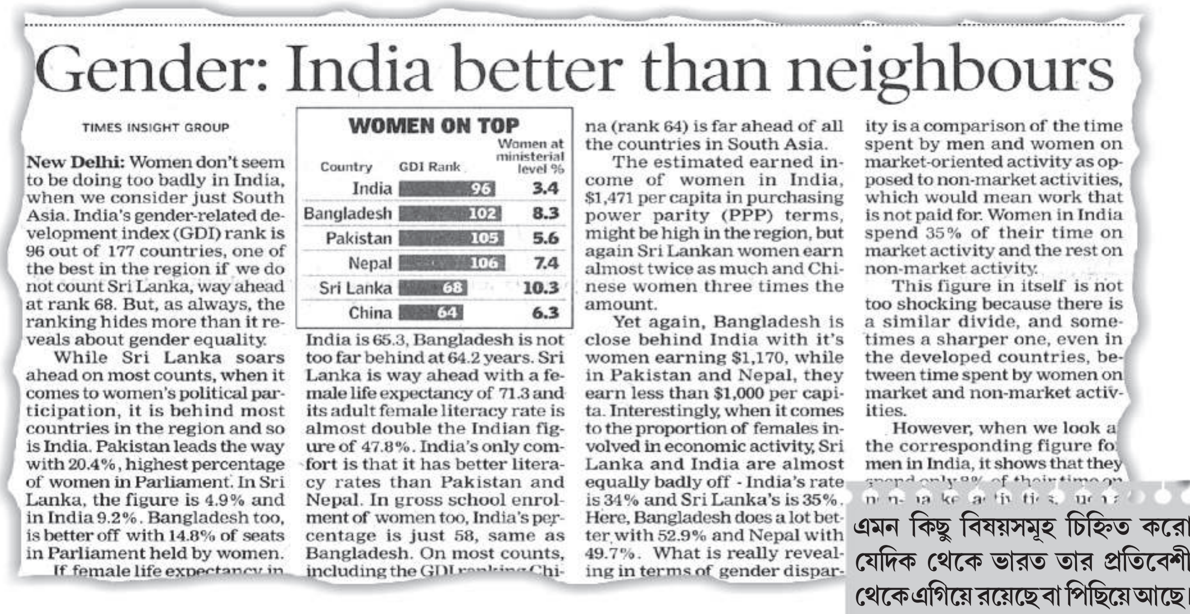

Gender: India better than neighbours

TIMES INSIGHT GROUP

New Delhi: Women don't seem to be doing too badly in India, when we consider just South Asia. India's gender-related development index (GDI) rank is 96 out of 177 countries, one of the best in the region if we do not count Sri Lanka, way ahead at rank 68. But, as always, the ranking hides more than it reveals about gender equality.

While Sri Lanka soars ahead on most counts, when it comes to women's political participation, it is behind most countries in the region and so is India. Pakistan leads the way with 20.4%, highest percentage of women in Parliament. In Sri Lanka, the figure is 4.9% and in India 9.2%. Bangladesh too, is better off with 14.8% of seats in Parliament held by women.

If female life expectancy in India is 65.3, Bangladesh is not too far behind at 64.2 years. Sri Lanka is way ahead with a female life expectancy of 71.3 and its adult female literacy rate is almost double the Indian figure of 47.8%. India's only comfort is that it has better literacy rates than Pakistan and Nepal. In gross school enrolment of women too, India's percentage is just 58, same as Bangladesh. On most counts, including the GDI ranking China (rank 64) is far ahead of all the countries in South Asia.

WOMEN ON TOP

Country	GDI Rank	Women at ministerial level %
India	96	3.4
Bangladesh	102	8.3
Pakistan	105	5.6
Nepal	106	7.4
Sri Lanka	68	10.3
China	64	6.3

The estimated earned income of women in India, $1,471 per capita in purchasing power parity (PPP) terms, might be high in the region, but again Sri Lankan women earn almost twice as much and Chinese women three times the amount.

Yet again, Bangladesh is close behind India with it's women earning $1,170, while in Pakistan and Nepal, they earn less than $1,000 per capita. Interestingly, when it comes to the proportion of females involved in economic activity, Sri Lanka and India are almost equally badly off - India's rate is 34% and Sri Lanka's is 35%. Here, Bangladesh does a lot better with 52.9% and Nepal with 49.7%. What is really revealing in terms of gender disparity is a comparison of the time spent by men and women on market-oriented activity as opposed to non-market activities, which would mean work that is not paid for. Women in India spend 35% of their time on market activity and the rest on non-market activity.

This figure in itself is not too shocking because there is a similar divide, and sometimes a sharper one, even in the developed countries, between time spent by women on market and non-market activities.

However, when we look a the corresponding figure fo men in India, it shows that they

এমন কিছু বিষয়সমূহ চিহ্নিত করো যেদিক থেকে ভারত তার প্রতিবেশী থেকে এগিয়ে রয়েছে বা পিছিয়ে আছে।

‘বেটি বাঁচাও—বেটি পড়াও’ সামাজিক প্রচারের মাধ্যমে লিঙ্গা সংবেদনশীলতা বাড়ানো

পুরুষ, নারী ও তৃতীয় লিঙ্গো সমাজের বিভাজনকে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু, বাস্তবে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য সামাজিক গঠন এবং ভূমিকা নির্ধারণ করা থাকে যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা পুনরায় বলবৎ করা হয়। ফলস্বরূপ, এই জৈবিক পার্থক্যগুলো সামাজিক বিভেদ, বৈষম্য এবং বহিষ্করণের ভিত্তিতে পরিণত হয়। জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশি সংখ্যার বাহিষ্কার যে কোনও উন্নয়নশীল এবং সভ্য সমাজের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, যা সংযুক্ত জাতিসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল যাতে উল্লেখ ছিল, “If development is not engendered it is endangered” (HDR UNDP 1995) অর্থাৎ যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় লিঙ্গা বৈষম্যের অবসান না করা হয়, তাহলে এটি বিপজ্জনক হতে পারে। সাধারণত বৈষম্য এবং বিশেষত লিঙ্গা বৈষম্য এক মানবতা বিরোধী অপরাধ।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, একই ধরনের কাজের জন্য কম বেতনের সুযোগ, সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি সুযোগকে অস্বীকার করার জন্য সকল প্রকার প্রচেস্টা প্রয়োজন। একটি সমাজ যা এর ‘স্বীকৃতি দিতে এবং বৈষম্য দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ তাদের সুসভ্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। ভারত সরকার এসকল বৈষম্যের বিরুপ প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে এবং দেশব্যাপী এক প্রচার শুরু করেছে যার নাম হল ‘বেটিঁ বাঁচাও—বেটি পড়াও’।

পেশাগত বিভাগ (Occupational Categories)

2011 সালের জনগণনায় ভারতের শ্রমজীবী জনসংখ্যাকে চারটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয় :

1. কৃষক
2. কৃষি শ্রমিক
3. গৃহস্থালি শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিক
4. অন্যান্য শ্রমিক

সারণি 1.4 : ভারতের শ্রম শক্তির ক্ষেত্রগত গঠন, 2011

বিভাগ	জনসংখ্যা			
	ব্যক্তি	মোট শ্রমিকের শতকরা হার (%)	পুরুষ	নারী
প্রাথমিক স্তর	26,30,22,473	54.6	16,54,47,075	9,75,75,398
দ্বিতীয় স্তর	1,83,36,307	3.8	97,75,635	85,60,672
তৃতীয় স্তর	20,03,84,531	41.6	15,66,43,220	4,37,41,311

কাজ

মিশ্র স্তম্ভ লেখচিত্র তৈরি করো যেখানে একটিতে ভারত এবং অন্যটিতে তোমাদের নিজ নিজ রাজ্যের কৃষি, গৃহস্থালি শিল্পসমূহ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত পুরুষ ও নারীর অনুপাতকে দেখাও এবং তুলনা করো।

নারী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রাথমিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি, যদিও বিগত বছরগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে নারীদের কাজের অংশীদারিত্বে উন্নতি ঘটেছে।

এটি লক্ষণীয় বিষয় যে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের অনুপাত গত কয়েক দশক ধরে (2001 সালে 58.2% থেকে 2011 সালে 54.6 এ) হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি শ্রমিকদের খামার ভিত্তিক পেশার পরিবর্তে অ-খামার ভিত্তিক পেশার নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়, যা দেশের অর্থনীতিতে ক্ষেত্রগত পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের অংশীদারির হারের স্থানিক ভিন্নতা (পরিশিষ্ট-v এবং vA) খুবই বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ, হিমাচলপ্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যগুলোতে কৃষকদের খুব বড়ো অংশ রয়েছে। অন্যদিকে বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে কৃষি শ্রমিকের আনুপাতিক ভাগ হার বেশি। দিল্লি, চন্ডীগড় ও পুদুচেরির মতো উচ্চ নগরীয় অঞ্চলগুলোতে অন্যান্য সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা খুবই বেশি। এটি কেবল সীমিত কৃষি জমির সহজলভ্যতাই নয়, বৃহৎ পরিমাণে নগরায়ণ এবং শিল্পায়নও অ-খামার ক্ষেত্রে আরও বেশি শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

   (i) 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল :

   (a) 1028 মিলিয়ন (c) 3287 মিলিয়ন

   (b) 3182 মিলিয়ন (d) 1210 মিলিয়ন

(ii) নিম্নলিখিত ভারতের রাজ্যগুলোর কোন্‌টিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়?

(a) পশ্চিমবঙ্গ (c) উত্তরপ্রদেশ

(b) কেরালা (d) পাঞ্জাব

(iii) 2011 সালের ভারতের জনগণনা অনুসারে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলোর কোন্‌টিতে পৌর জনসংখ্যার অনুপাত সর্বাধিক?

(a) তামিলনাড়ু (c) কেরালা

(b) মহারাষ্ট্র (d) গোয়া

(iv) নিম্নলিখিত কোন্‌টি ভারতের বৃহত্তম ভাষা গোষ্ঠী?

(a) চিন—তিব্বতীয় (c) অস্ট্রিক

(b) ইন্দো—আর্য (d) দ্রাবিড়

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

(i) ভারতে অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক এবং অত্যন্ত শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব নিম্ন প্রকৃতির। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার বণ্টনে জলবায়ুর ভূমিকা ব্যক্ত করো।

(ii) ভারতের কোন্ রাজ্যগুলোতে বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা রয়েছে? এই বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা হওয়ার একটি কারণ দর্শাও।

(iii) ভারতের কিছু রাজ্যে অন্য রাজ্যের তুলনায় কাজে অংশগ্রহণের হার উচ্চ হয় কেন?

(iv) 'কৃষি ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকদের বৃহত্তম অংশীদারি রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো।

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

(i) ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্বের স্থানিক ধরন আলোচনা করো।

(ii) ভারতের জনসংখ্যার পেশাগত গঠনের বর্ণনা করো।

একক I
অধ্যায় 2

পরিব্রাজন

প্রকারভেদ, কারণ ও পরিণাম

(MIGRATION
Types, Causes and Consequences)

ছত্তিশগড়ের ভিলাই ইস্পাত শিল্প কারখানায় প্রকৌশলী রূপে কর্মরত রামবাবুর জন্ম বিহারের ভোজপুর জেলার ছোট একটি গ্রামে। 12 বছর বয়সের শুরুতেই মাধ্যমিক স্তরের অধ্যয়নের জন্য সে পার্শ্ববর্তী শহর ‘আরা’ তে চলে যায়। সে তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য ঝাড়খন্ডের সিন্দ্রীতে গিয়েছিল এবং ভিলাই-এ চাকরি পেয়ে যায় যেখানে সে বিগত 31 বছর ধরে বসবাস করছে। ওর মাতাপিতা অশিক্ষিত ছিল এবং কৃষি থেকে প্রাপ্ত অল্প রোজগারই তাদের জীবন যাত্রার শুধুমাত্র উৎস ছিল। তারা তাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই সেই গ্রামে অতিবাহিত করে দেয়।

রামবাবুর তিনটি সন্তান আছে যারা তাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ভিলাই থেকে প্রাপ্ত করেছিল এবং পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। প্রথম সন্তান এলাহাবাদ ও মুম্বাই-এ পড়াশোনা করেছে এবং বর্তমানে সে বৈজ্ঞানিক রূপে দিল্লীতে কর্মরত। দ্বিতীয় সন্তান তার উচ্চ শিক্ষা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করে এবং বর্তমানে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। তার তৃতীয় সন্তান লেখাপড়া শেষ করে বিয়ের পর সুরাট-এ স্থায়ী ভাবে বসবাস করে।

এটি শুধু রামবাবুর বা তার সন্তানদের গল্প নয়, পরন্তু এই ধরনের গতিবিধি ক্রমবর্ধমানভাবে বিশ্বজনীন প্রবণতা হয়ে ওঠেছে। মানুষ একটি গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর, ছোট শহর থেকে বড় শহর এবং একটি দেশ থেকে অন্য দেশে অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে।

তোমাদের পাঠ্য বই ‘মানব ভূগোলের মূল তত্ত্ব’ তে তোমরা ইতোমধ্যে পরিব্রাজনের ধারণা ও সংজ্ঞার ব্যাপারে অবগত হয়েছ। স্থান ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার বণ্টনে পরিব্রাজন একটি অখন্ড ও অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকেও অভিবাসীদের বিশাল ঢেউ ভারতে প্রবেশ করেছে এবং সারা ভারতবর্ষ তার সাক্ষী রয়েছে। বাস্তবে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হল অভিবাসীদের আসা ও একের পর এক দেশের বিভিন্ন স্থানে জনস্রোতের ইতিহাস। এক বিখ্যাত কবি ফিরাক্ গোরাখপুরির শব্দে;

সর জমিন-এ-হিন্দ পর আক্ওয়াম -এ-আলমকে
ফিরাক্
কফিলে বস্তে গয়ে, হিন্দুস্থান বন্তা
গয়া

(বিশ্বের বিভিন্ন ভাগ থেকে জনগোষ্ঠী ভারতে আসতে থাকে ও বসতি স্থাপন করে এবং এর থেকেই ভারতবর্ষের রচনা হয়।)

একইভাবে বহু সংখ্যক মানুষ ভারত থেকেও অন্য স্থানে উন্নত সুযোগ-সুবিধার জন্য পরিব্রাজন করে আসছে। বিশেষ করে মধ্যপূর্ব,

পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়।

ভারতীয় অভিবাসী (Indian Diaspora)

ঔপনিবেশিক কালে (ব্রিটিশ কালে) উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে ব্রিটিশরা লক্ষ লক্ষ চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের মরিশাস, ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (ত্রিনিদাদ, টোবেগো ও গুয়েনা), ফিজি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, ফরাসি ও ডাচ দ্বারা রিইউনিয়ন দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াদিলোপ, মার্টিনীক ও সুরিনামে এবং পর্তুগীজ দ্বারা গোয়া, দমন ও দিউ থেকে আঙ্গোলায় ও মোজাম্বিকে বাগিচা কর্মী রূপে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই সমস্ত প্রব্রজনগুলো 'গিরমিট এক্ট' (ভারতের প্রবসন আইন) নামক একটি সময়বন্ধ চুক্তির অধীনে হত। যদিও, এই সমস্ত চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ক্রীতদাসদের চেয়ে ভালো ছিল না।

বর্তমান সময়কালে অভিবাসীদের দ্বিতীয় জনস্রোত আকস্মিকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনেই ও আফ্রিকা দেশসমূহ ইত্যাদিতে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার খোঁজে পেশাদারী, শিল্পী, ব্যবসায়িক ও কারখানা কর্মী রূপে প্রব্রজন লক্ষ করা গেছে এবং এই প্রবণতা এখনো বর্তমান। 1970 এর দশকে পশ্চিম এশিয়ায় তৈল উত্তোলন শিল্পে আকস্মিক বৃদ্ধির কারণে ভারতের স্বল্প দক্ষ এবং দক্ষ শ্রমের অবিচ্ছিন্ন বহিরাগমন ছিল। এছাড়াও, পশ্চিম দেশগুলোতে উদ্যোক্তাদের বহিরাগমন বিপনি মালিকদের, পেশাদারদের, ব্যবসায়ীদের কিছু বহিরাগমন লক্ষ করা গিয়েছিল।

প্রবাসীদের তৃতীয় জনস্রোতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার (1960 সাল থেকে), সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালন পরামর্শদাতা, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, গণসঞ্চার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষ (1980 সাল থেকে) এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জার্মানি ইত্যাদিতে পরিব্রাজন লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই সমস্ত পেশাদার ব্যক্তিরা উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ উপার্জনশীল এবং সমৃদ্ধশালী দলের একজন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উদারীকরণের পর 90 এর দশকে শিক্ষা এবং জ্ঞান ভিত্তিক ভারতীয় প্রবসন ভারতীয় অভিবাসীকে বিশ্বের ক্ষমতাসম্পন্ন অভিবাসীর মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে।

এই সকল দেশে, নিজ নিজ দেশগুলোর উন্নতিতে ভারতীয় অভিবাসী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পরিব্রাজন (Migration)

তোমরা ভারতের জনগণনার সঙ্গো পরিচিত। এটিতে দেশের পরিব্রাজন সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। 1881 সালে পরিচালিত ভারতের প্রথম জনগণনার মাধ্যমেই পরিব্রাজনের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই তথ্যগুলো জন্মস্থানের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তবে, প্রথম মুখ্য সংশোধন 1961 সালের জনগণনায় প্রবর্তিত করা হয় যেখানে দুটি অতিরিক্ত উপাদান যোগ করা হয় যেমন- জন্মস্থান যথা গ্রাম বা শহর এবং বাসস্থানের স্থিতিকাল (যদি অন্য কোথাও জন্ম হয়ে থাকে, পরবর্তী সময়ে 1971 সালে শেষ আবাসের স্থান এবং গণনার স্থানে থাকার সময়কালের অতিরিক্ত তথ্যও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। 1981 সালের জনগণনায় পরিব্রাজনের কারণ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং পরের আদমশুমারীতে তা সংশোধনও করা হয়।

জনগণনায় পরিব্রাজন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা হয় :

- ব্যক্তিটি কি এই গ্রামে বা শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন ? যদি উত্তর না হয়ে থাকে তবে জন্মস্থানে গ্রামাঞ্চল/শহরে স্থিতি, জেলা ও রাজ্যের নাম এবং যদি ভারতের বাইরে হয় তবে যেই দেশে জন্মগ্রহণ হয়েছে সেই দেশের নামের মত অতিরিক্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়।
- ব্যক্তিটি কি অন্য কোথা থেকে এই গ্রামে বা শহরে এসেছেন ? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে পূর্ববর্তী বাসস্থানের গ্রামাঞ্চল/শহুরে স্থিতি, জেলার ও রাজ্যের নাম এবং যদি ভারতের বাইরে তবে সেই দেশের নামের মত অতিরিক্ত প্রশ্নগুলো করা হয়।

এছাড়াও শেষ বাসস্থান থেকে পরিব্রাজনের কারণ এবং গণনার স্থানে থাকার সময়কালও জিজ্ঞাসা করা হয়।

ভারতীয় জনগণনায় পরিব্রাজন বিষয়টিকে দু'টি ভিত্তিতে পরিগণনা করা হয় : (i) জন্মের স্থান, যদি জন্মের স্থান গণনার জায়গা থেকে আলাদা হয় (যা জীবনকালীন অভিবাসী হিসাবে পরিচিত); (ii) আবাসের স্থান, যদি অন্তিম আবাসের স্থান গণনার স্থান থেকে আলাদা হয় (অন্তিম আবাসের স্থান ভিত্তিক অভিবাসী হিসাবে পরিচিত)। তোমরা কি ভারতের জনসংখ্যায় অভিবাসীদের অনুপাত কল্পনা করতে পারো ? 2001 -এর জনগণনা অনুযায়ী, দেশের 1,029 মিলিয়ন মানুষের মধ্যে 307 মিলিয়ন (30 শতাংশ) জন্মের স্থান ভিত্তিক অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে, অন্তিম আবাসের স্থানের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা ছিল 315 মিলিয়ন (31 শতাংশ)।

কাজ

তোমাদের পাড়ার পাঁচটি পরিবারের পরিব্রাজনের স্থিতি নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা চালাও। যদি তারা অভিবাসী হয়ে থাকে তবে পাঠ্যে প্রদত্ত দুটি মানদন্ডের ভিত্তিতে তাদেরকে শ্রেণিবন্ধ করো।

পরিব্রাজনের ধারা (Streams of Migration)

অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন (দেশের অভ্যন্তরে) এবং আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন (দেশের বাইরে যাওয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা) সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজনের মধ্যে, বিভিন্ন ধারায় পুরুষ এবং মহিলা অভিবাসীদের বিতরণ চিত্র 2.1 a এবং 2.1 b তে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে মহিলারা উভয় প্রকারের পরিব্রাজনে গ্রামীণ থেকে গ্রামীণ স্বল্পদূরত্বের ধারাকে প্রাধান্য দেয়। এর বিপরীতে, অর্থনৈতিক কারণে পুরুষরা আন্ত:রাজ্য স্থানান্তরের গ্রামীণ থেকে নগরীয় ধারাকে প্রাধান্য দেয়।

অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজনের এই ধারাগুলো ছাড়াও, ভারত প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অভিবাসন (immigration) এবং প্রবসনের (emigration) অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তালিকা 2.1 প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসীদের বিবরণ উপস্থাপন করছে।

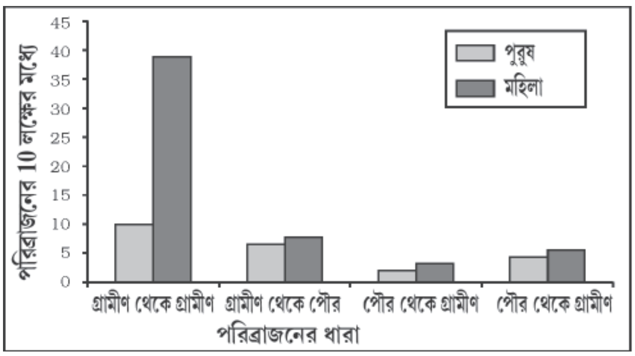

চিত্র 2.1 a : পরিব্রাজনের ধারা নির্দেশকারী অন্তিম বাসস্থান ভিত্তিক অন্তঃরাজ্য পরিব্রাজন (স্থিতিকাল-0-9 বছর), ভারত 2001

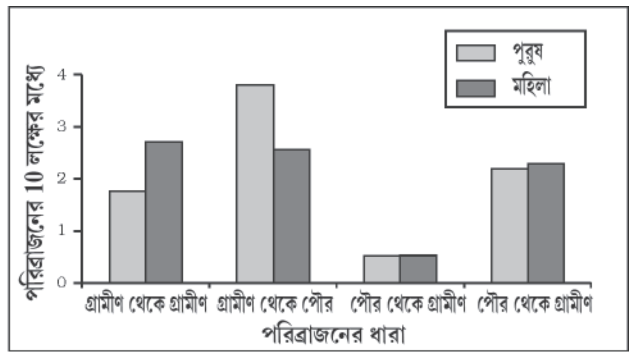

চিত্র 2.1 b : পরিব্রাজনের ধারা নির্দেশকারী অন্তিম বাসস্থান ভিত্তিক আন্তঃরাজ্য পরিব্রাজন (স্থিতিকাল-0-9 বছর), ভারত 2001

উৎস : ভারতীয় জনগণনা, 2001

কাজ

2001 সালের জনগণনা অনুসারে ভারত অন্ত:রাজ্য এবং আন্ত:রাজ্য পরিব্রাজন প্রদর্শনকারী 2.1 a) এবং 2.1 b) চিত্রগুলোকে পরীক্ষা করে দেখো এবং খুঁজে বের করো :

(i) উভয় চিত্রের মধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত মহিলাদের সংখ্যা কেন বেশি?

(ii) গ্রাম থেকে নগরে পুরুষদের স্থানান্তর কেন বেশি?

চারটি ধারা চিহ্নিত করা হয়েছে : a) গ্রামীণ থেকে গ্রামীণ ((R-R), b) গ্রামীণ থেকে পৌর (R-U), c) পৌর থেকে পৌর (U-U) এবং d) পৌর থেকেগ্রামীণ (U-R)। 2001 সালে ভারতে গত আবাসনের ভিত্তিতে গণনা করা 315 মিলিয়ন অভিবাসীর মধ্যে 98 মিলিয়ন গত 10 বছরে তাদর আবাসস্থল পরিবর্তন করেছিল। এর মধ্যে 81 মিলিয়ন ছিল অন্ত: রাজ্য অভিবাসী। এই পরিব্রাজনের ধারাটিতে মহিলা অভিবাসীদের আধিপত্য ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগই বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসী ছিলেন। অন্ত:রাজ্য ও আন্ত:রাজ্য পরিব্রাজনের 2001 সালের জনগণনা অনুসারে 5 মিলিয়নেরও বেশি লোক অন্য দেশ থেকে ভারতে পরিব্রাজন করেছে। এর মধ্যে 96 শতাংশ এসেছে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে : বাংলাদেশ (3.0 মিলিয়ন), এর পরে পাকিস্তান (0.9 মিলিয়ন), নেপাল (0.5 মিলিয়ন)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 0.16 মিলিয়ন তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীরা (refugees)। যতদূর ভারত থেকে অন্যদেশে প্রবসনের কথা জানা যায় তাতে এটা অনুমিত হয় যে ভারতীয় অভিবাসীর (Diaspora) 20 মিলিয়ন মানুষ 110 টি দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে।

কাজ

প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে পরিব্রাজন (4,918,266 জন ব্যক্তি 100 শতাংশ) হিসাবে ধরে 2.1 তালিকায় দেওয়া তথ্যগুলোকে পাই চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো।

পরিব্রাজনে স্থানিক বৈষম্যতা (Spatial Variation in Migration)

মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট ও হরিয়ানার মতো কিছু রাজ্য অন্যান্য রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি থেকে অভিবাসীদের আকর্ষণ করে। (বিশদ জানতে পরিশিষ্ট vii দেখো)। 2.3 মিলিয়নের অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের নিয়ে মহারাষ্ট্র তালিকা প্রথম স্থান অধিকার করেছে, এর পরে আছে দিল্লি, গুজরাট ও হরিয়ানা। অপরদিকে, উত্তরপ্রদেশ (-2.6 মিলিয়ন) এবং বিহার (-1.7 মিলিয়ন) হল কিছু রাজ্য যেখান থেকে সর্বাধিক বহি:পরিব্রাজন ঘটেছে।

নগরীয় পিন্ডীকরণের (urban agglomeration) মধ্যে বৃহত্তর মুম্বাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভ্যন্তরীণ অভিবাসী এসেছে। এর মধ্যে অন্ত:রাজ্য পরিব্রাজন সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এই তারতম্যগুলো মূলত রাজ্যের আকারের কারণে ঘটে যার মধ্যে নগরীয় পিন্ডীকরণ অবস্থিত।

তালিকা 2.1: ভারতে সকল স্থিতিকাল ধরে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অন্তিম আবাস ভিত্তিক অভিবাসী, 2001

দেশ %	*অভিবাসীর সংখ্যা*	*% হারে মোট অভিবাসী*
মোট আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন	**5,155,423**	**100**
প্রতিবেশী দেশ থেকে পরিব্রাজন	***4,918,266***	***95.5***
আফগানিস্তান	9,194	0.2
বাংলাদেশ	3,084,826	59.8
ভুটান	8,337	0.2
চিন	23,721	0.5
মায়ানমার	49,086	1.0
নেপাল	596,696	11.6
পাকিস্তান	997,106	19.3
শ্রীলঙ্কা	149,300	2.9

উৎস : ভারতীয় জনগণনা, 2001

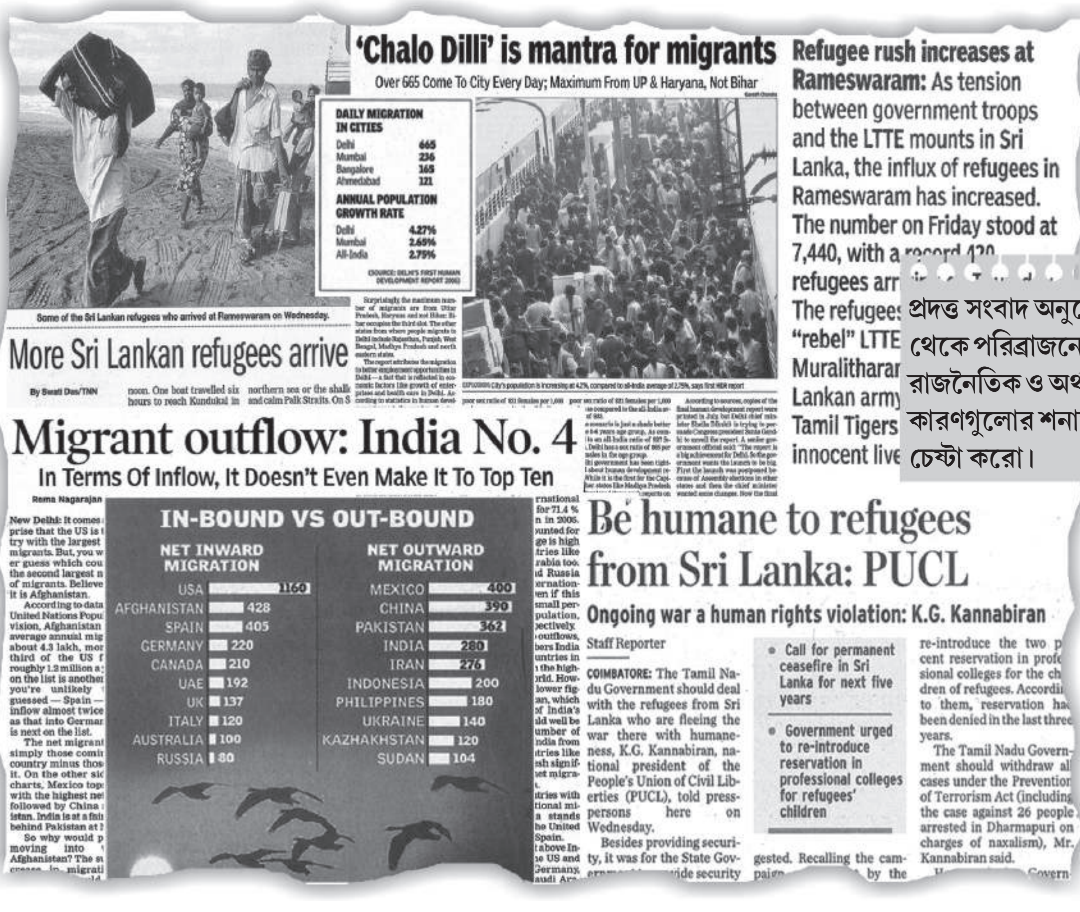

প্রদত্ত সংবাদ অনুচ্ছেদগুলো থেকে পরিব্রাজনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোর শনাক্ত করার চেষ্টা করো।

কাজ

পরিশিষ্ট (vii)-এ রাজ্যভিত্তিক অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন ও বহি:পরিব্রাজনের তথ্য দেওয়া আছে। ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলোর মোট পরিব্রাজন গণনা করো।

পরিব্রাজনের কারণ (Causes of Migration)

সাধারণত মানুষ নিজের জন্মস্থানের সাথে আবেগে আসক্ত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জন্মস্থান ও বাসস্থান ছেড়ে দেয়। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। এই কারণগুলোকে দুটি বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (i) বিকর্ষক কারণ (**push factor**) - এই কারণগুলো মানুষকে তাদের বাসস্থান বা উৎপত্তিস্থলকে ছাড়তে বাধ্য করে এবং (ii) আকর্ষক কারণ (**pull factors**) -যা বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষদের আকর্ষণ করে।

ভারতে মানুষ দারিদ্রতা, কৃষি জমিতে জনসংখ্যার অধিক চাপ, সাধারণ পরিকাঠামোগত সুবিধা যেমন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ইত্যাদির কারণে গ্রামীণ থেকে নগরীয় এলাকায় পরিব্রাজন করে। এই কারণগুলো ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প,

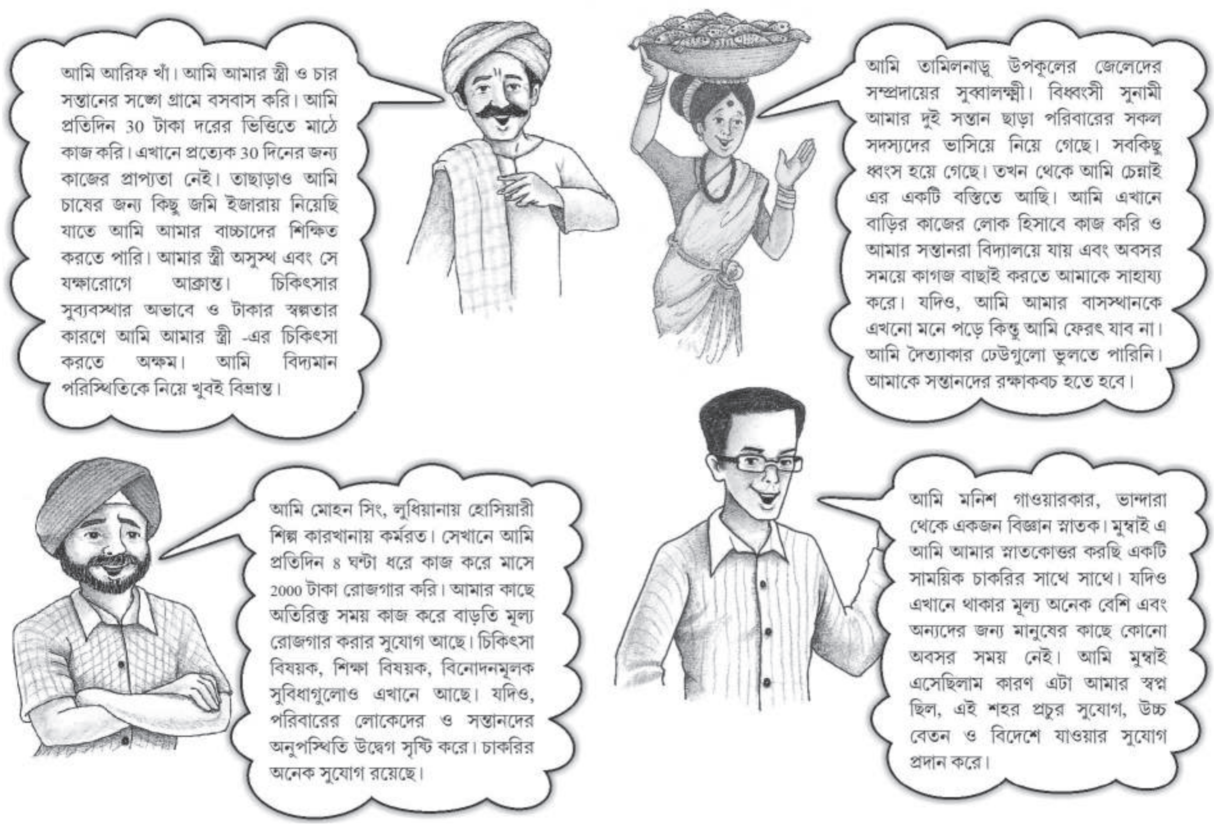

কাজ

চারটি গল্পে অভিবাসীদের বিভিন্ন পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে।

আরিফের পরিব্রাজনে আকর্ষক ও বিকর্ষক কারণগুলোর গণনা করো।

মোহন সিং-এর পরিব্রাজনের বিকর্ষক কারণগুলো কী কী?

সুব্বালক্ষ্মী ও মনিশ গাওয়ারকারের গল্পটি পড়ো। পরিব্রাজনের ধরন, পরিব্রাজনের কারণ ও তাদের থাকা খাওয়ার পরিস্থিতির ভিত্তিতে তাদের ঘটনাগুলো তুলনা করো।

সুনামি, যুদ্ধ এবং স্থানীয় দ্বন্দ্বও পরিব্রাজনে অতিরিক্ত জোর প্রদান করে। অপরদিকে মানুষকে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরের দিকে আকর্ষণ করার জন্য আকর্ষক কারণগুলো রয়েছে। বেশিরভাগ গ্রামীণ পরিব্রাজকদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষক কারণ হল উত্তম সুযোগ সুবিধার উপস্থিতি, নিয়মিত কর্মের প্রাপ্যতা, উত্তম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও বিনোদনের উৎস ইত্যাদি হল আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষক কারণসমূহ।

চিত্র 2.2-এ উল্লেখ্য পুরুষ ও মহিলা পরিব্রাজনের কারণগুলো পৃথকভাবে পরীক্ষা করো। চিত্রগুলোর ভিত্তিতে এটা দেখা যায় যে পুরুষ ও মহিলাদের পরিব্রাজনের কারণগুলো ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কর্ম ও চাকরি পুরুষ পরিব্রাজনের প্রধান কারণ হিসাবে থেকেছে (38 শতাংশ), অথচ এই কারণটি মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র 3 শতাংশ। এর বিপরীতে প্রায় 65 শতাংশ মহিলারা বিয়ের পর তাদের মাতাপিতার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ভারতের অন্য সকল গ্রামীণ এলাকায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিব্রাজনের কারণ হলেও মেঘালয় সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, কারণ সেখানে ঘটনাটি ঠিক বিপরীত।

মেঘালয়ে মহিলাদের বিবাহ সংক্রান্ত পরিব্রাজন আইন ভিন্ন কেন?

এগুলোর তুলনায় দেশে পুরুষদের বিবাহ সংক্রান্ত পরিব্রাজন হল মাত্র 2 শতাংশ।

পরিব্রাজনের ফলাফল (Consequences of Migration)

পরিব্রাজন হল স্থানের উপর সুযোগসুবিধার অসম বণ্টনের প্রতিক্রিয়া। মানুষের মধ্যে স্বল্প সুবিধাযুক্ত ও স্বল্প নিরাপত্তার স্থানের তুলনায় অধিক সুযোগসুবিধা ও উত্তম নিরাপত্তার স্থানে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এটি বিপরীতক্রমে প্রবাসের উৎস ও গন্তব্য ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতি উভয় উৎপন্ন করে। ফলাফলগুলোকে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Consequences)

পরিব্রাজকদের দ্বারা পাঠানো অর্থপ্রেরণই হল উৎসস্থলের প্রধান লাভ। আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের থেকে পাঠানো অর্থ বিদেশি বিনিময়ের মুখ্য উৎসের মধ্যে একটি। 2002 সালে ভারত বিদেশি অভিবাসীদের থেকে 11 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (US$ 11 billion) প্রাপ্ত করেছিল। পাঞ্জাব, কেরল ও তামিলনাডু তাদের বিদেশি অভিবাসীদের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থরাশি লাভ করে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের দ্বারা পাঠানো অর্থের পরিমাণ বিদেশী অভিবাসীদের তুলনায় খুবই অল্প, কিন্তু উৎসস্থলের অর্থনীতির বৃদ্ধিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেরিত অর্থগুলো মূলত খাদ্য, ঋণশোধ, চিকিৎসা, চাযের বিনিয়োগ, গৃহ নির্মাণ, বিবাহ, বাচ্চাদের শিক্ষা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি হাজার হাজার গরিব গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য অর্থপ্রেরণ জীবনীশক্তি রূপে কাজ করে। পূর্ব-উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার গ্রামাঞ্চল থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিব্রাজন, কৃষিজ উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের সবুজ বিপ্লব কৌশলের সাফল্যতাকে বোঝায়। এছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত পরিব্রাজন ভারতের মহানগরীয় শহরগুলোতে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণ হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও দিল্লির মত শিল্পোন্নত রাজ্যগুলোতে বস্তির বৃদ্ধি হল দেশের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত পরিব্রাজনের ঋণাত্মক পরিণাম।

তোমরা কী পরিব্রাজনের আরও অন্য কিছু ঋণাত্মক ও ধনাত্মক পরিণাম উল্লেখ করতে পারবে?

জনসংখ্যা সম্পর্কিত ফলাফল (Demographic Consequences)

পরিব্রাজনের কারণে একটি দেশে জনসংখ্যার পূর্ণবিন্যাস ঘটে। গ্রামীণ-নগরীয় পরিব্রাজন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে বয়স ও দক্ষতা ভিত্তিক নির্বাচিত ব্যক্তিদের বহিঃপরিব্রাজন, গ্রামীণ জনসংখ্যার গঠনের উপর প্রতিকূল প্রভাব এনে দেয়। যদিও উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব মহারাষ্ট্র থেকে উচ্চ বহিঃপরিব্রাজন এই রাজ্যগুলোকে বয়স ও লিঙ্গ কাঠামোর গঠনে গুরুতর অসামঞ্জস্যতা এনে দিয়েছে। এইরূপ অসামঞ্জস্যতা অভিবাসীদের গ্রহণকারী রাজ্যগুলোতেও উৎপন্ন হয়। অভিবাসীদের উৎস ও গন্তব্য স্থলে লিঙ্গ অনুপাতের অসামঞ্জস্যতার কারণ কী?

সামাজিক ফলাফল (Social Consequences)

পরিব্রাজকরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। এদের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি, পরিবার পরিকল্পনা, মেয়েদের শিক্ষা ইত্যাদি নতুন নতুন চিন্তাগুলো নগর থেকে গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

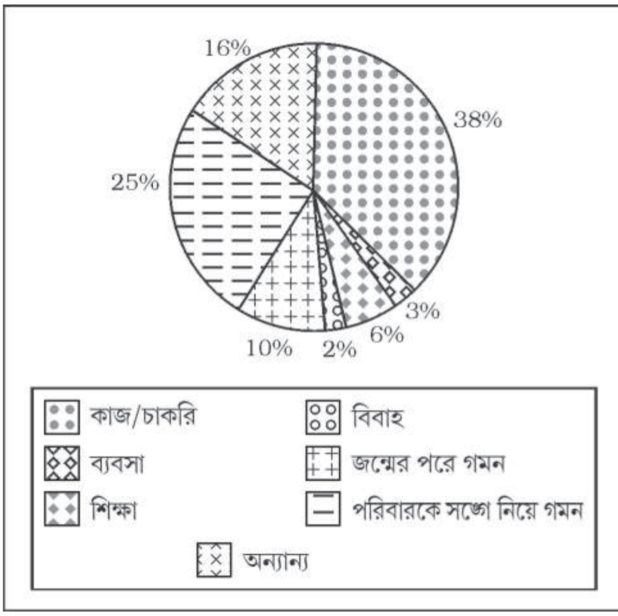

চিত্র 2.2 a : 0-9 বছর অবধির অন্তিম আবাস ভিত্তিক পুরুষ পরিব্রাজনের কারণ, ভারত 2001

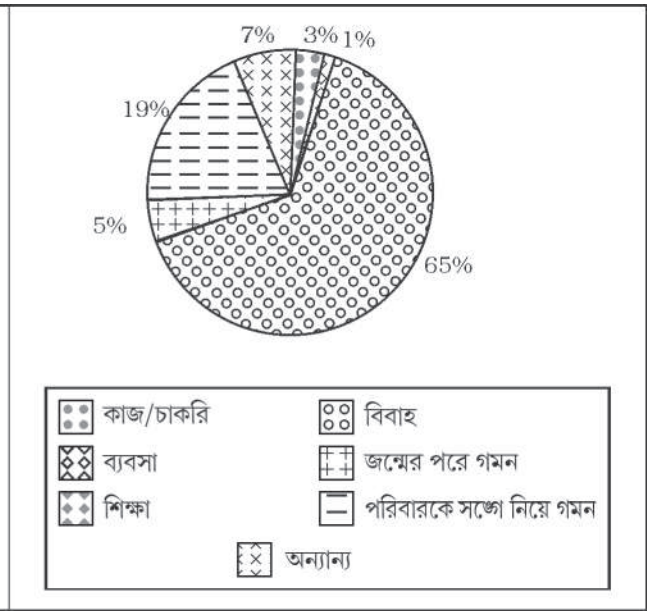

চিত্র 2.2 b : 0-9 বছর অবধির অন্তিম আবাস ভিত্তিক মহিলা পরিব্রাজনের কারণ, ভারত 2001

পরিব্রাজনের কারণে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সংমিশ্রণ ঘটে। এটির ইতিবাচক অবদানও রয়েছে যেমন, মিশ্র সংস্কৃতির বিবর্তন এবং সংকীর্ণ চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে বৃহৎ স্তরে মনোদিগন্তকে বিস্তীর্ণ করে তোলা। কিন্তু এটির পরিচয়হীনের মতো গুরুতর নৈতিবাচক পরিণামও রয়েছে যা মানুষের মধ্যে সামাজিক শূন্যতা ও নিরাশার অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রতিনিয়ত নিরাশার অনুভূতি মানুষকে অপরাধ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের মত অসামাজিক কার্যাবলীর ফাঁদে পড়তে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

পরিবেশগত ফলাফল (Environmental Consequences)

গ্রামীণ-নগরীয় পরিব্রাজনের কারণে সৃষ্টি হওয়া মানুষের অতিরিক্ত ভিড় নগরাঞ্চলের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এটি সর্বশেষে নগরীয় বসতির অপরিকল্পিত বৃদ্ধি ও ঝুপড়ি বস্তির কলোনী গড়ার দিকে অগ্রসর হয়।

এছাড়াও, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিমাত্রায় শোষণের কারণে নগরগুলো ভূগর্ভস্থ জলের নিঃশেষকরণ, বায়ু দূষণ, নর্দমার ময়লা পরিব্রাজনের কঠিন আবর্জনার ব্যবস্থ্যাপনার মত তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

অন্যান্য (Others)

পরিব্রাজন (বিবাহ সংক্রান্ত পরিব্রাজন বাদ দিয়ে) মহিলাদের পদমর্যাদাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামাঞ্চল থেকে কিছু সংখ্যক পুরুষ বহি:পরিব্রাজনের কারণে তাদের রেখে আসা স্ত্রীদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক চাপ পড়ে। মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বা চাকরির জন্য পরিব্রাজন, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে কিন্তু আবার দুর্বলতাও বৃদ্ধি করে।

যদিও উৎসস্থলের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পরিব্রাজনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অর্থপ্রেরণ, তবুও মানব সম্পদের হ্রাস, বিশেষত উচ্চ দক্ষ মানব সম্পদের হ্রাস হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি। উন্নত দক্ষতার বাজার, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী বাজার হয়ে উঠেছে এবং সবচেয়ে গতিশীল শিল্পভিত্তিক অর্থব্যবস্থা দরিদ্র এলাকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনুপাতে উচ্চ প্রশিক্ষিত পেশাদারদের ভর্তি ও নিয়োগ করছে। পরিণামস্বরূপ উৎস স্থলে বিদ্যমান অনুন্নয়ন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

(i) নিম্নলিখিত কোন্‌টি ভারতে পুরুষ পরিব্রাজনের মূল কারণ?

(a) শিক্ষা (c) কাজ ও চাকরি

(b) ব্যবসা (d) বিবাহ

(ii) নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যটি সর্বাধিক অভিবাসী গ্রহণ করে?

(a) উত্তরপ্রদেশ (c) মহারাষ্ট্র

(b) দিল্লি (d) বিহার

(iii) নিম্নলিখিত কোন্ ধারাটি পুরুষ পরিব্রাজনের অধীনে?

(a) গ্রামীণ-গ্রামীণ (c) গ্রামীণ-পৌর

(b) পৌর-গ্রামীণ (d) পৌর-পৌর

(iv) নিম্নলিখিত কোন্ নগরীয় পিন্ডীকরণে অভ্যন্তরীণ অভিবাসীর জনসংখ্যা বেশি?

(a) মুম্বাই ইউএ (Mumbai UA) (c) ব্যাঙ্গালুরু ইউএ (Bengaluru UA)

(b) দিল্লি ইউএ (Delhi UA) (d) চেন্নাই ইউএ (Chennai UA)

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) আয়ুষ্কাল অভিবাসী ও অন্তিম আবাস ভিত্তিক অভিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

(ii) পুরুষ/মহিলা কেন্দ্রিক পরিব্রাজনের মূল কারণগুলো নির্দিষ্ট করো।

(iii) গ্রামীণ-পৌর পরিব্রাজনের কারণে উৎসস্থল ও গন্তব্য স্থলে বয়স-লিঙ্গ গঠনের ওপর কী কী প্রভাব পড়ে তা লেখো।

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

(i) ভারতে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের ফলাফলগুলো আলোচনা করো।

(ii) পরিব্রাজনের সামাজিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত ফলাফলগুলো কী কী?

একক I

অধ্যায় 3

মানব উন্নয়ন
(HUMAN DEVELOPMENT)

ষাট বছর পূর্বে উত্তরাখণ্ডের একটি ছোটো কৃষক পরিবারে রেখা জন্মগ্রহণ করেছিল। সে তার মাকে গৃহস্থলীর কাজে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াত। তার ভাইয়েরা স্কুল যেত, সে কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে বিধবা হওয়ার পর সে শ্বশুর বাড়ির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে না পারায় অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিল। তার ভাই তাকে দিল্লিতে বসবাস করতে সাহায্য করেছিল।

সে প্রথমবার বাস এবং রেলগাড়ির মাধ্যমে যাতায়াত করে দিল্লির মতো বিশাল নগর দেখেছিল। কিছুদিন পর একই নগরের অট্টালিকা, সড়ক, রাজপথ, সুযোগ সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা তাকে আকৃষ্ট করেছিল সেই মোহ তার ভঙ্গ হয়েছিল।

নগরকে খুব ভালোভাবে দেখার পর সে একটা আত্মবিরোধী ধারণা উপলব্ধি করল। জুগ্গী (*jhuggi*) ও নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, যানজট, অতি জনসমাগম, অপরাধ, দরিদ্রতা, ট্রাফিক লাইটের নীচে ছোটো ছোটো শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি, ফুটপাতের উপর মানুষের ঘুমিয়ে থাকা, দূষিত জল ও বায়ু ইত্যাদি বিকাশের অন্য একটি চেহারা প্রকাশ করে। সে ভাবত উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের মধ্যে কি মহাবস্থান রয়েছে? উন্নয়ন কি জনসংখ্যার কিছু অংশকে অন্য অংশ অপেক্ষা অধিক সহায়তা করে? উন্নয়ন কি বিত্তবান এবং বিত্তহীন সৃষ্টি করে? চলো, আমরা এই আত্মবিরোধী ধারণা পরখ করে দেখি এবং এই ঘটনাকে বুঝতে চেষ্টা করি।

এই গল্পে উল্লিখিত আমাদের সময়কালের সমস্ত আত্মবিরোধী ধারণার মধ্যে উন্নয়ন সর্বাধিক তৎপর্যপূর্ণ। সময়ের স্বল্প পরিসরে কতিপয় অঞ্চল, ব্যক্তিবর্গের বিকাশ, বৃহদায়তনের বাস্তুতান্ত্রিক অবনমনসহ বহু মানুষের দরিদ্রতা ও অপুষ্টি নিয়ে আসে। বিকাশ কি শ্রেণি পক্ষপাতী?

প্রাথমিকভাবে, এটি বিশ্বাস করা যায় যে, 'বিকাশ স্বতন্ত্র' যার সম্বন্ধ প্রায়শই আধুনিকীকরণ, অবকাশ, আরামদায়ক এবং সমৃদ্ধির সাথে জড়িয়ে আছে। বর্তমানের আলোচনা প্রসঙ্গে কম্পিউটারীকরণ, শিল্পায়ন, দক্ষ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিস্তৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা, ব্যক্তিবর্গের সতর্কতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিকাশের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং সরকার নিজের সম্পাদিত কার্য কিংবা উন্নয়নের স্তরকে এই বস্তুগুলোর সামান্য সহজলভ্যতা এবং অভিগমনের সম্পর্কের দ্বারা পরিমাপ করে, কিন্তু এটি উন্নয়নের আংশিক অথবা এক তরফা

দৃশ্য হতে পারে। একে প্রায়শই উন্নয়নের পশ্চিমা অথবা ইউরো-কেন্দ্রিক বিচারধারা বলা যায়। ভারতের মতো ঔপনিবেশিকোত্তর দেশে, ঔপনিবেশিকতা, প্রান্তিকতা, সামাজিক বৈষম্য ও আঞ্চলিক অসমতা ইত্যাদি বিকাশের অন্য চেহারা দর্শায়।

এভাবে, ভারতের জন্য বিকাশ সুযোগসুবিধার সাথে সাথে অবহেলা ও বঞ্চনার একটি মিশ্রিত থলি। মহানগরীয় কেন্দ্র এবং অন্যান্য উন্নত অন্য রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রের মতো কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে তাদের জনসংখ্যার একটি ছোটো অংশে সমস্ত আধুনিক সুযোগসুবিধা প্রচুর থাকে। এর অন্য প্রান্তে বিশাল গ্রামীণ এলাকা এবং পৌর এলাকায় নোংরা বস্তি রয়েছে যেখানে অধিকাংশ জনসংখ্যার জন্য পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে না। যদি আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিকাশের সুযোগ সুবিধার বণ্টনের প্রতি লক্ষ করা যায় তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা যে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও নোংরা বস্তিতে বসবাসকারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সর্বাধিক প্রান্তিকতার (marginalised) অবস্থানে রয়েছে। সকলের মধ্যে মহিলা জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ সবচেয়ে বেশি কষ্ঠ ভোগ করে। এটিও সমভাবে সত্য যে, সারা বছর ধরে উন্নয়নের পরও অধিকাংশ প্রান্তিক শ্রেণির লোকদের আপেক্ষিকের সাথে সাথে নিরপেক্ষ পরিস্থিতি ও অধিকতর খারাপ হয়েছে। ফলস্বরূপ বিশাল সংখ্যক মানুষ শোচনীয় দারিদ্র্য এবং উপমানবীয় (sub-human) পরিস্থিতির অধীনে বাঁচতে বাধ্য হয়।

তথাপি বিকাশের অন্য একটিআন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা মানবীয় পরিস্থিতির অবনমনের সঙ্গো সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এটি পরিবেশ দূষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে যা বাস্তুসংস্থানিক সংকটের কারণ। বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও শব্দ দূষণই শুধুমাত্র 'জনসাধারণের দুঃখের' কারণ নয়, বরং আমাদের সমাজের অস্তিত্বের জন্যেও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, দরিদ্রদের সামর্থ্যের অবনমনের জন্য তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে, যথা- (1) সামাজিক সামর্থ্য-বিচ্যুতি এবং দুর্বল সামাজিক বন্ধন (সামাজিক পুঁজি)- এর কারণে, (2) পারিপার্শ্বিক সামর্থ্য-দূষণের কারণে এবং (3) ব্যক্তিগত সামর্থ্য-রোগের বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে। পালাক্রমে, তাদের জীবনের গুণমান এবং মানব বিকাশের ওপর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে, বর্তমান উন্নয়ন সামাজিক অন্যায়, আঞ্চলিক অসমতা ও পরিবেশের অবনমনের বিষয়কে সম্বোধন করতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে একে সামাজিক বন্টনজনিত অন্যায়, জীবনের গুণগতমান ও মানব বিকাশের অবনমন, বাস্তুসংস্থানের সংকট এবং সামাজিক অশান্তির মুখ্য কারণ হিসাবে বিশদভাবে গণ্য করা হয়। বিকাশ কি এই সংকটের সৃষ্টি, প্রচলন এবং সংকটকে চিরস্থায়ী করে? এভাবে, বিকাশের প্রচলিত পশ্চিমী ধারণা যা মানব বিকাশ, আঞ্চলিক অসমতা, পরিবেশ সংকটসহ সমস্ত প্রতিকূলতা দূরীকরণের উপায় হিসাবে মানা হয়। এর বিপরীতে মানব উনন্নয়নকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ভাবা হয়েছিল।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিকাশকে জটিলভাবে দেখার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেস্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, এই লক্ষ্যে সর্বাধিক নিয়মানুগ প্রচেস্টায় 1990 সালে সংযুক্ত রাষ্ট্র উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP) দ্বারা প্রথম মানব উন্নয়নের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে এই সংগঠন প্রতি বছর বিশ্ব মানব উন্নয়নের প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র মানব

মানব উন্নয়ন কী (What is Human Development)?

"মানব উন্নয়ন হল সুস্থ ভৌত পরিবেশ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত সকল প্রকারের মানব পছন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে জনগণের পছন্দের পরিসরকে বিস্তৃত করা এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, উপার্জন ও ক্ষমতায়নের সুযোগ-সুবিধাগুলো বৃদ্ধি করার একটি প্রকিয়া।"

এভাবে, জনগণের পছন্দের পরিসর বিস্তারই হল মানব বিকাশের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের পছন্দের অন্যান্য বিষয়গুলোও জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপন করা, শিক্ষিত হওয়া এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সুনিশ্চিত মানব অধিকার ও ব্যক্তিগত আত্মসম্মান ইত্যাদি সহ একটি উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পর্যন্ত অভিগমন যেখানে মানব উন্নয়নের কিছু বিষয়ের আপোস করা যায় না।

উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে না, এর সূচকগুলোতে সংশোধন এবং পরিবর্তন নিয়ে আসে, তথাপি গণনালব্ধ স্কোরের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের সকল দেশের পদক্রম তৈরি করে। 1993 সালের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদন অনুসারে, "প্রগতিশীল গণতান্ত্রিককরণ ও বর্ধিত জনগণের ক্ষমতায়ন মানব উন্নয়নের ন্যূনতম অবস্থা দর্শায়।" অধিকন্তু, এটি আরও উল্লেখ করে যে, "উন্নয়নকে মানুষের চারপাশে রেখে, না কি মানুষকে উন্নয়নের চারপাশে রেখে বোনা উচিত" যেমনটা আগের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

তোমরা "মানব ভূগোলের মূলতত্ত্ব" নামক পাঠ্যবইয়ে মানব উন্নয়নের ধারণা, সূচক ও অভিগমন এবং সূচক গণনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে অধ্যয়ন করেছ। চলো, আমরা এই অধ্যায়ে ভারতে এর ধারণা ও সূচকগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করি।

ভারত মানব উন্নয়ন (Human Development in India)

1.20 বিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা সহ ভারত মানব উন্নয়নের সূচক (HDI)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের 188টি দেশের মধ্যে 131-তম স্থানে রয়েছে।HDI-এর সংযুক্ত মূল্য 0.624 এর সাথে ভারত মধ্যম মানব উন্নয়ন স্তরকে দর্শায় (UNDP 2016) এমন দেশের শ্রেণিতে পড়ে।

সারণি 3.1 : ভারত ও অন্যান্য কিছু দেশের মানব উন্নয়নের সূচক মান

দেশ	মানব বিকাশের সূচক	ক্রম
নরওয়ে	0.949	1
জার্মানী	0.926	4
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	0.920	10
যুক্তরাজ্য (UK)	0.909	16
রাশিয়ান ফেডারেশন	0.804	49
মালয়েশিয়া	0.789	59
শ্রীলঙ্কা	0.766	73
ব্রাজিল	0.754	79
চিন	0.738	90
মিশর (Egypt)	0.691	111
ইন্দোনেশিয়া	0.689	113
দক্ষিণ আফ্রিকা	0.666	119
ভারত	0.624	131
বাংলাদেশ	0.579	139
পাকিস্তান	0.550	147

উৎস : *UNDP Human Development Report -2016, Economic survey 2016-17*

মানব বিকাশ সূচকে কম স্কোর একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়, কিন্তু পদ্ধতির পাশাপাশি রাজ্য/দেশগুলোর সূচকের মান এবং ক্রম গণনার জন্য নির্বাচিত সূচকগুলো সম্পর্কে কিছু আপত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য সাম্রাজ্যবাদের মতো ঐতিহাসিক বিষয়, মানব অধিকার উলঙ্ঘন, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে সামাজিক ভেদাভেদের মতো সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়, অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধের মতো সামাজিক সমস্যা এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের স্বরূপ (গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক), ক্ষমতায়নের স্তরের মতো রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব হল এমন কিছু বিষয় যা মানব উন্নয়নের প্রকৃতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এবং অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

UNDP দ্বারা নির্বাচিত সূচকগুলো ব্যবহার করে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও ভারতের জন্য মানব উন্নয়নের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিল। এটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে বিশ্লেষণের একক হিসাবে ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীকালে, প্রতিটি রাজ্য সরকারও জেলাগুলোকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে ব্যবহার করে রাজ্য স্তরের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে শুরু করে। যদিও ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত ভারতের মানব উন্নয়নে গৃহীত তিনটি সূচকের মাধ্যমে গণনা করেছে যেমনটা "মানব ভূগোলের মূলতত্ত্ব" নামক বইতে আলোচিত হয়েছে। তথাপি, এই প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক সাফল্য, সামাজিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক বণ্টনসংক্রান্ত বিচার, অভিগম্যতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপের মতো অন্যান্য সূচকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সাফল্যের সূচকসমূহ (Indicators of Economic Attainments)

সমৃদ্ধ সম্পদের ভিত্তি এবং সকল, বিশেষ করে গরীব, নিপীড়িত ও প্রান্তিক শ্রেণির দ্বারা এই সম্পদগুলোর প্রাপ্তি হল উৎপাদকতা, কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের চাবিকাঠি। মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা GNP) এবং এর মাথাপিছু প্রাপ্যতা যে কোনো দেশের সম্পদের প্রাপ্তির উৎস ভিত্তিক মূল্যায়ন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। অর্থনৈতিক সাফল্য ও ব্যক্তির কল্যাণ আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সম্পদ প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে। ভারতে

বছরের পর বছর মাথাপিছু আয় এবং ব্যবহারজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ্রাস ঘটেছে। 2011-12 সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হার গ্রামীণ এলাকায় আনুমানিক 25.7%, পৌর এলাকায় 13.7% এবং সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য 21.9% ধরা হয়েছে।

রাজ্যগুলোর দরিদ্রতার সংখ্যা তথ্য প্রদর্শন করে যে, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, দাদরা ও নগর হাভেলীর মতো রাজ্যের নথিভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা 30 ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। গুজরাট, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, উত্তরাখন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলোতে জনসংখ্যার শতকরা 10 থেকে 20 ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি, গোয়া, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, পাঞ্জাব, সিকিম, পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দমন ও দিউ, লাক্ষাদ্বীপে জনসংখ্যার শতকরা 10 ভাগের নীচে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। দরিদ্রতা হল বঞ্চনার একটি অবস্থা। খাঁটি কথায় এটি একটি মজবুত, স্বাস্থ্যকর এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে উৎপাদনশীল জীবনযাপনের জন্য কিছু মৌলিক চাহিদা মেটাতে একজন ব্যক্তির অক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।

একটি দেশের মোট দেশীয় উৎপাদন (GDP) ওই দেশের জীবনধারার গুণমানকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না। আবাসন, সরকারি পরিবহণ, বায়ু, পানীয় জলের গুণমান ও প্রাপ্যতার মতো অন্যান্য কারণও রয়েছে যা জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। ভারতের দারিদ্র্যতাকে অধিকতর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে চাকুরিহীন আর্থিক বিকাশ এবং অবাধ বেকারত্ব।

সারণি 3.2 : ভারতের দারিদ্র্য (2011-12)

রাজ্য	দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার শতকরা হার
অন্ধ্রপ্রদেশ	9.20
অরুণাচল প্রদেশ	34.67
আসাম	31.98
বিহার	33.74
ছত্তিশগড়	39.93
দিল্লি	9.91
গোয়া	5.09
গুজরাট	16.63
হরিয়ানা	11.16
হিমালচল প্রদেশ	8.06
জম্মু ও কাশ্মীর	10.35
ঝাড়খন্ড	36.96
কর্ণাটক	20.91
কেরালা	7.05
মধ্যপ্রদেশ	31.65
মহারাষ্ট্র	17.35
মণিপুর	36.89
মেঘালয়	11.87
মিজোরাম	20.40
নাগাল্যান্ড	18.88
ওড়িশা	32.59
পাঞ্জাব	8.26
রাজস্থান	14.71
সিকিম	8.19
তামিলনাড়ু	11.28
ত্রিপুরা	14.05
উত্তরাখন্ড	11.26
উত্তরপ্রদেশ	29.43
পশ্চিমবঙ্গ	19.98
পুদুচেরি	9.69
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	1.00
চন্ডীগড়	21.81
দাদরা ও নগর হাভেলি	39.31
দমন ও দিউ	9.86
লাক্ষাদ্বীপ	2.77
সমগ্র ভারত	**21.92**

উৎস: *Press Note on Poverty Estimate, 2011-12, Government of India, Planning Commission, July 2013*

কাজ

ভারতের কোন্ রাজ্যে দ্রারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার অনুপাত সবচেয়ে বেশি?

মানের ঊর্ধ্বক্রমানুসারে দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার শতকরা হারের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলোকে সাজাও।

দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার উচ্চ অনুপাত সম্পন্ন 10টি রাজ্য নির্বাচন করো এবং স্তম্ভ চিত্রের সাহায্যে তাদের সংখ্যাতথ্যকে উপস্থাপন করো।

স্বাস্থ্যকর জীবনের সূচক (Indicators of a Healthy Life)

অসুস্থতা ও রোগ থেকে মুক্ত জীবন এবং যথাযথ দীর্ঘায়ুযুক্ত জীবনকাল সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত দেয়। শিশু মৃত্যু ও প্রসবের পর মায়েদের মৃত্যু হার কমানোর পরিপ্রেক্ষিতে জন্মের আগে ও পরে স্বাস্থ্য সেবাজনিত সুবিধাগুলোর সহজলভ্যতা, বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য পরিসেবা, পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং ব্যক্তির সুরক্ষা হল স্বাস্থ্যকর ও যথাযথ দীর্ঘায়ুযুক্ত জীবনকালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

স্বচ্ছ ভারত মিশন
(Swachh Bharat Mission /SBM)

শিল্প কারখানা ও নগরের নর্দমাগুলোর বিষাক্ত ও অ-জীবাণুবিয়োজ্য আবর্জনা এবং উন্মুক্ত মলত্যাগ ইত্যাদি অনেক স্বাস্থ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকার এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন হল এদের মধ্যে একটি পদক্ষেপ।

একটি সুস্থ্য মন একটি সুস্থ দেহে বাস করে এবং একটি সুস্থ শরীরের জন্য নির্মল পরিবেশ, বিশেষ করে বিশুদ্ধ বায়ু, জল, কোলাহল বিহীন পরিবেশ এবং চারপাশের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ হল প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা।

পৌর বর্জ্য, শিল্প কারখানার বর্জ্য এবং পরিবহণের দ্বারা উৎপাদিত দূষক ইত্যাদি ভারতের নগরাঞ্চলে দূষণের প্রধান উৎস। গ্রামাঞ্চলে এবং নগরের বস্তি অঞ্চলে উন্মুক্ত মলত্যাগ দূষণের একটি প্রধান উৎস। ভারত সরকারের flagship কর্মসূচি স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ হল একটি দূষণ মুক্ত পরিবেশ। এর উদ্দেশ্যগুলো হল ঃ

- ভারতকে উন্মুক্ত মলত্যাগ থেকে মুক্ত করা এবং পৌরসভার কঠিন বর্জ্য পদার্থের 100 শতাংশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা অর্জন করা, স্বতন্ত্র পারিবারিক পায়খানা নির্মাণ, সমাজের জন্য টয়লেট স্থাপন এবং সরকারি টয়লেট স্থাপন;
- গৃহস্থালির দূষণ কমাতে গ্রামীণ ভারতে সকল পরিবারকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তি এলপিজি (LPG) সরবরাহের জন্য বিধান তৈরি করা;
- জলবাহিত রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি পরিবারকে পানযোগ্য পানীয় জল সরবরাহ করা; এবং
- বায়ু ও সৌরশক্তির মতো অ-চিরাচরিত শক্তি সম্পদগুলোর ব্যবহার করার জন্য প্রচার করা।

সারণি 3.3 : 2011 সালে ভারতের স্বাক্ষরতার হার

রাজ্য	মোট স্বাক্ষরতা	মহিলা স্বাক্ষরতা
ভারত	**74.04%**	**65.46%**
জম্মু ও কাশ্মীর	68.74	58.01
হিমাচল প্রদেশ	83.78	76.60
পাঞ্জাব	76.68	71.34
চন্ডিগড়	86.43	81.38
উত্তরাখন্ড	79.63	70.70
হরিয়ানা	76.64	66.77
দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল	86.34	80.93
রাজস্থান	67.06	52.66
উত্তরপ্রদেশ	69.72	59.26
বিহার	63.82	53.33
সিকিম	82.20	76.43
অরুণাচলপ্রদেশ	66.95	59.57
নাগাল্যান্ড	80.11	76.69
মণিপুর	79.85	73.17
মিজোরাম	91.58	89.40
ত্রিপুরা	87.75	83.15
মেঘালয়	75.48	73.78
আসাম	73.18	67.27
পশ্চিমবঙ্গ	77.08	71.16
ঝাড়খন্ড	67.63	56.21
ওড়িশা	73.45	64.36
ছত্তিশগড়	71.04	60.59
মধ্যপ্রদেশ	70.63	60.02
গুজরাট	79.31	70.73
দমন ও দিউ	87.07	79.59
দাদরা ও নগর হাভেলী	77.65	65.93
মহারাষ্ট্র	82.91	75.48
অন্ধ্রপ্রদেশ	67.66	59.74
কর্ণাটক	75.60	68.13
গোয়া	87.40	81.84
লক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ	92.28	88.25
কেরালা	93.91	91.98
তামিলনাড়ু	80.33	73.86
পুদুচেরি	86.55	81.22
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	86.27	81.84

উৎস : *Census of India – 2011* (Provisional)
http://www.censusindia.gov.in

ভারত কিছু কিছু স্বাস্থ্য সূচকের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ভালো কাজ করেছে, যেমন 1951 সালে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 25.1 থেকে হ্রাস পেয়ে 2015 সালে প্রতি হাজারে 6.5 এ এবং একই সময়ে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 148 থেকে হ্রাস পেয়ে 37 এ দাঁড়িয়েছে। একইভাবে 1951 থেকে 2015 পর্যন্ত জন্মের সময় থেকে প্রত্যাশিত জীবনকাল (life expectancy at birth) পুরুষদের ক্ষেত্রে 37.1 বছর থেকে 66.9 বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 36.2 বছর থেকে 70 বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করেছে।। যদিও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, তবু আরও অনেক কিছু করা এখনও বাকি। একইভাবে, অনুরূপ বছরগুলোতে ভারত জন্ম হারকে 40.8 থেকে 20.8 পর্যন্ত নামিয়ে এনে যথাযথভাবে ভালো কাজ করেছে, কিন্তু এই জন্মহার এখনও বহু উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

লিঙ্গা বিশেষ গ্রামীণ ও শহুরে স্বাস্থ্য সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক মনে হয়। ভারতে লিঙ্গানুপাতে স্ত্রী এর সংখ্যায় হ্রাস লক্ষ করা গেছে। ভারতের 2011 সালের জনগণনার ফলাফল 0-6 বছর বয়সের শিশু লিঙ্গা অনুপাতের ক্ষেত্রে খুবই চিন্তাজনক। প্রতিবেদনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল এই যে, যদি কেরালাকে ব্যতিক্রম ধরে নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে সকল রাজ্যে শিশু লিঙ্গোর অনুপাত হ্রাস পেয়েছে এবং এটি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো উন্নত রাজ্যগুলোতে অতিরিক্ত উদ্বেগজনক বিষয় যেখানে অনুপাতটি প্রতি হাজার শিশু পুত্রের তুলনায় কন্যা শিশুর অনুপাত 850 এরও কম। কোন্ কোন্ কারণগুলো এর জন্য দায়ী? এটা কি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা লিঙ্গা নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি?

সামাজিক ক্ষমতায়নের সূচক (Indicators of Social Empowerment)

"উন্নয়নই হল স্বাধীনতা"। ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, দাসত্ব, বন্ধন, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা এবং যে-কোনো ধরনের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতাই হল মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাটি। শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে তখনই পাওয়া সম্ভব যখন মানুষ তার ক্ষমতায়ন এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামর্থ্যের এবং পছন্দের পূর্ণ ব্যবহার করে। সমাজ এবং পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিগম্যতাই হল স্বাধীনতার মৌলিক ভিত্তি। সাক্ষরতা হল পৃথিবীর জ্ঞান ও স্বাধীনতার প্রবেশদ্বার।

কাজ

মানের নিম্নক্রমানুসারে সংখ্যাতথ্য সাজানোর পর স্তম্ভ চিত্রের (bar diagram) সাহায্যে জাতীয় গড়ের তুলনায় অধিক সাক্ষরতা হারযুক্ত রাজ্যগুলোকে প্রদর্শন করো।

কেরালা, মিজোরাম, লাক্ষাদ্বীপ ও গোয়ার মোট সাক্ষরতার হার অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় বেশি কেন?

সাক্ষরতা কি মানব উন্নয়নের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে? বিতর্ক সভা করো।

সারণি 3.3-এ প্রদর্শিত ভারতের সাক্ষরতা শতকরা হারে কিছু মজাদার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে :

- 2011 সাল অনুসারে ভারতে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার প্রায় 74.04 শতাংশ এবং স্ত্রী সাক্ষরতা হার 65.46 শতাংশ।
- দক্ষিণ ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যগুলোতে মোটা সাক্ষরতার হার এবং মহিলা সাক্ষরতার হার উভয়ই জাতীয় গড়ের তুলনায় অধিক।
- ভারতের রাজ্যগুলোতে সাক্ষরতার হারে ব্যাপক আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায়। বিহারের মতো রাজ্যে সাক্ষরতার হার খুবই স্বল্প (63.82 শতাংশ) এবং কেরালা ও মিজোরামের মতো রাজ্যগুলোতে সেটি যথাক্রমে 93.91 এবং 91.58।

স্থানিক বিভিন্নতা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে এবং আমাদের সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি যেমন-মহিলা, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার খুবই কম। এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা যায় যে, যদিও প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে সাক্ষরতার শতাংশ উন্নতি হয়েছে তথাপি বছরের পর বছর ধনী ও প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের মানব উন্নয়নের সূচক (Human Development Index in India)

উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর পটভূমিতে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে গ্রহণ করে মানব উন্নয়নের সূচক গণনা করেছিল।

ভারতকে মধ্যম মানব উন্নয়ন স্বীকৃত দেশগুলোর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের 188টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান কী? সারণি 3.4 অনুসারে 0.790 সংযুক্ত সূচক মান নিয়ে কেরালা শীর্ষস্থান দখল করেছে এবং তারপরে দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া এবং পাঞ্জাবের স্থান। প্রত্যাশা অনুযায়ী বিহার, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলো ভারতের 23 টি বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে নিম্নস্থানে রয়েছে।

One notch up, but India still has miles to go

Has Growth Slowed Down Development?

TIMES INSIGHT GROUP

New Delhi: The Human Development Report (HDR) 2006, released by the United Nations Development Programme (UNDP) on Thursday provides the opponents of globalisation, particularly in India, with useful ammunition. What it shows is that in most countries including India, improvement in the human development index has slowed down in the period 1990 to 2004, compared to the pace in the previous 15 years.

In India's case for instance, the period from 1975 to 1990 saw the HDI score improve by close to 25%. In the next 14 years, that figure has come down to 18.6%. Given the fact that the latter period is more or less the post-reforms period in India, this is bound to be used as a strong argument by those opposed to the reforms. India is by no means an isolated example. The HDR gives index scores for 177 UN member countries. For as many as 79 of these, comparative figures are not available over the two periods we are looking at. This could be because some countries simply did not exist in 1975 — Slovenia, Bosnia or Turkmenistan for instance —

HOW THEY FARE

Share of govt health spending to total health expenditure

Investment in HDI(%)

Rank	Country	1975-90	1990-04
138	Nepal	42	24
134	Pakistan	27	16
93	Sri Lanka	15	7
126	India	25	19
81	China	19	22
137	Bangladesh	22	26

idly since 1990 than they did between 1975 and 1990.

It might seem that this is because countries that had already attained very high levels of human development by the mid-90s would have had little scope for improvement later. That, however, is not the case. In fact, Norway, which tops the latest HDI index, is among the few that have improved more in the later period. Other developed countries in this select list include the UK, Italy, Sweden, Luxembourg, Australia, Ireland, Denmark and New Zealand, all of which are ranked in the top 20. Switzerland's HDI score has improved exactly as much between 1990 and 2004 as it did in the 1975-90 period,

Better healthcare still out of bounds

TIMES INSIGHT GROUP

New Delhi: India may be among the fastest growing economies in the world, but the UNDP's Human Development Report 2006 shows that this growth hasn't translated into better public healthcare for the citizen, at least not as yet.

For instance, there are only seven countries — of the 177 that the HDR looks at — with a lower share of public expenditure in total health expenditure. These seven — Guinea, Congo, Myanmar, Cambodia, Armenia, Tazikistan and Burundi — are not exactly those with whom India would like to be compared, but they are the only ones in which the government accounts for less than a quarter of total health expenditure. For India, the share of public expenditure in the total is exactly one-fourth or 25%.

MEDICAL MALADY

Share of govt health spending to total health expenditure

HDI Rank	Country	%
160	Guinea	16.7
167	Congo	17.5
130	Myanmar	17.9
129	Cambodia	19.3
80	Armenia	20.0
122	Tajikistan	20.5
169	Burundi	22.6
126	India	25.0
97	Georgia	25.0
99	Azerbaijan	25.0

The low share of public health expenditure is not surprising, given the fact that only 13 countries spend a smaller proportion of the gross domestic product (GDP) on the health sector than India's level of 1.2%. Apart from six of the seven mentioned above, these include Pakistan and Bangladesh in our neighbourhood as well as Azerbaijan, Georgia, Ivory Coast, Equatorial Guinea and Indonesia.

One result of this low level of government spending on healthcare is that people have to spend more from their pockets to keep themselves in good health. Thus, India's private spending on healthcare at 3.6% of GDP is higher than most. In fact, only 33 of the remaining 176 countries has a higher level on this count.

However, the high private expenditures are clearly unable to bridge the gap when it comes to things like immunisation, which are typically public programmes in most parts of the globe. Not surprisingly, India's immunisation rate for those who are one-year old against measles is worst in the world, with just 13 countries doing worse. A similar picture emerges if we look at the numbers for full immunisation of one-year olds against tuberculosis. Again, there are a mere 20 of the 176 others who have a lower rate.

What highlights all of this as a glaring failure of our governments is the fact that India's pool of roughly 6.5 lakh physicians is the third biggest in the world after China, which has about twice as many, and the US, which has only a few tens of thousands of doctors more than India, although for a population that's only about one-thirds the size of India's.

'Water distribution in India inequitable'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: On the face of it, India looks like a country with plenty of water with the average use per person per day exceeding 140 litres. However, as the HDR 2006 points out, aggregate figures are often deceptive, because they conceal the disparity in the distribution of water over regions, groups of people, between rich and poor and between the rural and urban population.

Even in the UK, the average use of water per person per day is only 150 litres, not too far above the Indian level, and in

NOT ENOUGH LIFELINE

- In India, spending on military is 3% of GDP and on water and sanitation it is less than 0.5%
- Diarrhoea kills 450,000 in India annually, more than in any other country
- Research in India by Self Employed Women's Association (SEWA) has shown that reducing water collection to one hour a day would enable women to earn upto an additional $100 (Rs 4,500 roughly) a year
- In Delhi, Karachi and Kathmandu, fewer than 10% of households with piped water receive service 24 hours a day. Two or three hours of delivery is the norm
- If the entire population of South Asia had access to basic low-cost water and sanitation technology, it would save the region $34 billion

available for average use per person per day.

distribution of water is and

20 litres of clean water per person per day.

Official data for Mumbai says the city enjoys a safe water coverage of more than 90%. But, as the HDR points out, almost half the city's population lives in slums and these residents do not even figure in municipal data.

Similarly, in Chennai, the average supply is 68 litres a day, but areas relying on tankers use as little as 8 litres.

The HDR also talks about the 'water lords' of Gujarat, land owners who have constructed deep wells depriving neighbouring villages of water, only to sell it back at a high

তোমরা কি উপরোক্ত সমস্যার কারণগুলো খুঁজে বের করতে পারবে?

সারণি 3.4 : ভারত- মানব উন্নয়ন সূচক

রাজ্য	মানব উন্নয়ন সূচক 2007-08	ক্রম 2007-08
কেরালা	0.790	1
দিল্লি	0.750	2
হিমাচল প্রদেশ	0.652	3
গোয়া	0.617	4
পাঞ্জাব	0.605	5
উত্তর পূর্ব (আসামকে বাদ দিয়ে)	0.573	6
মহারাষ্ট্র	0.572	7
তামিলনাড়ু	0.570	8
হরিয়ানা	0.552	9
জম্মু ও কাশ্মীর	0.529	10
গুজরাট	0.527	11
কর্ণাটক	0.519	12
পশ্চিমবঙ্গ	0.492	13
উত্তরাখন্ড	0.490	14
অন্ধ্রপ্রদেশ	0.473	15
আসাম	0.444	16
রাজস্থান	0.434	17
উত্তরপ্রদেশ	0.380	18
ঝাড়খন্ড	0.376	19
মধ্যপ্রদেশ	0.375	20
বিহার	0.367	21
ওড়িশা	0.362	22
ছত্তিশগড়	0.358	23

উৎস: *Planning Commission of India: India National Human Development Report, 2011*

এমন ধরনের পরিস্থিতির জন্য বেশ কয়েকটি সামাজিক-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকে 100 শতাংশের কাছাকাছি সাক্ষরতা অর্জন করার মতো চকমপ্রদ অবদানের কারণে, কেরলা সর্বোচ্চ মান লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য একটি ভিন্ন দৃশ্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোতে অনেক স্বল্প সাক্ষরতা রয়েছে। সর্বোচ্চ মোট সাক্ষরতা হার প্রদর্শিত রাজ্যগুলোতে পুরুষ ও স্ত্রী সাক্ষরতার মধ্যে কম প্রভেদ লক্ষ করা গেছে।

শিক্ষাগত সাফল্য ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরও মানব উন্নয়ন সূচকের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ছত্তিশগড়, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে মানব উন্নয়ন সূচকের মান সর্বোচ্চ রয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলে বিকশিত আঞ্চলিক বিকৃতি এবং সামাজিক বৈষম্য ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারত সরকার পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বণ্টন সংক্রান্ত ন্যায়বিচারকে তার মুখ্য লক্ষ্যের

সাথে সুষম বিকাশকে প্রতিষ্ঠানিককরণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করেছে। এটির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও এখনও এগুলো কাঙ্ক্ষিত স্তরের নীচে রয়েছে।

জনসংখ্যা, পরিবেশ ও উন্নয়ন (Population, Environment and Development)

সাধারণভাবে উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে মানব উন্নয়ন হল সমাজ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি জটিল ধারণা। এটি জটিল, কারণ যুগ যুগ ধরে মনে করা হত যে উন্নয়ন একটি মূল ধারণা এবং একবার যদি এটি অর্জন করা যায় তবে এটি সমাজের সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। যদিও উন্নয়ন একাধিক উপায়ে গুণমানে তৎপর্যপূর্ণ উন্নতি নিয়ে এসেছে, কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যতা, সামাজিক অসমতা, ভেদাভেদ, বঞ্চনা, মানুষের বাস্তুচ্যুতি, মানবাধিকারের অপব্যবহার ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করা এবং পরিবেশগত অবনতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর গুরুত্ব এবং সংবেদনশীলতার কথা বিবেচনা করে, ইউএনডিপি তার 1993 সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে কিছু স্পষ্ট পক্ষপাত এবং কুসংস্কার সংশোধন করার চেষ্টা করে যা উন্নয়নের ধারণার সঙ্গো প্রোথিত ছিল। 1993 সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানুষের অংশগ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তা ছিল মুখ্য বিষয়। এটি মানব উন্নয়নের ন্যূনতম শর্ত হিসাবে প্রগতিশীল গণতন্ত্রিকরণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রতিবেদনটি শান্তি ও মানব উন্নয়ন আনয়নে 'নাগরিক সমাজ' এর বৃহত্তর গঠনমূলক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নাগরিক সমাজের সৈন্যবাহিনীর ব্যয় হ্রাস, সশস্ত্র বাহিনীর অব্যাহতি, প্রতিরক্ষা থেকে সরে এসে মৌলিক পণ্য ও পরিসেবার উৎপাদন ও বিশেষ করে নিরস্ত্রীকরণ এবং উন্নত দেশসমূহের পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের সংখ্যা কমানোর জন্য মতামত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। পারমাণবিক বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ হল মুখ্য বিশ্বব্যাপী চিন্তার বিষয়।

এই পদ্ধতির অন্য চরমসীমায় নিও–মাথশিয়বিদ, পরিবেশবিদ এবং মূলক বাস্তুবিদদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলো রয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একটি সুখকর ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনের জন্য জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্যতা হল একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। এই চিন্তাবিদ্‌দের মতানুসারে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে ব্যবধান অষ্টাদশ শতাব্দীর পরেই বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিনশত বছরে বিশ্বের সম্পদগুলোতে সামান্য প্রসার ঘটলেও মানব জনসংখ্যায় অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়েছে। উন্নয়ন শুধু বিশ্বের সীমিত সম্পদগুলোর বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে, যেখানে এই সম্পদগুলোর চাহিদায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। অতএব, যে-কোনো উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের পূর্বে প্রধান কাজ হল জনসংখ্যা ও সম্পদগুলোর মধ্যে সমতা বজায় রাখা।

স্যার রবার্ট মালথাস এমন এক বিদ্বান ছিলেন যিনি মানব জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের অভাবের বিষয়ে প্রথম চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ রূপে এই বিচারধারাটি যুক্তি সঙ্গাত ও বিশ্বাসজনক মনে হয়, কিন্তু যদি সমালোচনামূলকভাবে দেখা যায় তবে এর মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে যেমন- সম্পদগুলোর কোনোটি নিরপেক্ষ নয়। সম্পদের প্রাপ্যতা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা তার সামাজিক বণ্টন। সর্বত্রই সম্পদের অসম বণ্টন রয়েছে। সমৃদ্ধশালী দেশের মানুষগুলোর সম্পদের বৃহৎ ভান্ডার পর্যন্ত অধিগম্যতা রয়েছে, যেখানে নির্ধনদের সম্পদগুলো সঙ্কুচিত হতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও, শক্তিশালী মানুষের দ্বারা অধিকের চেয়ে অধিকতম সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রন স্থাপনের জন্য অসংখ্য প্রচেষ্টা এবং তাদের নিজেদের শৌর্য প্রদর্শন করার জন্য সেগুলোর ব্যবহারই হল জনসংখ্যা সম্পদ ও উন্নয়নের মধ্যে সংঘর্ষ ও আপাত দ্বন্দ্বের মুখ্য কারণ।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা অনেককাল ধরেই জনসংখ্যা, সম্পদ ও উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোর প্রতি সংবেদনশীলতা থেকেছে। এটা বলা ভুল হবে না যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ মূলত প্রকৃতির উপাদানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিল। সম্প্রতিকালে মহাত্মা গান্ধি উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য ও সম্প্রীতির পুনঃস্থাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি চলমান উন্নয়ন বিশেষ করে শিল্পায়নে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, স্বনির্ভরতা, অহিংসা ও পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরিবেশের অবক্ষয়কে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার মতে, ব্যক্তিগত অনাড়ম্বরতা, সামাজিক সম্পদের ন্যায়রক্ষা এবং অহিংসা কোনো ব্যক্তির পাশাপশি একটি দেশের উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের মূল চাবিকাটি। তাঁর অভিমতগুলো ক্লাব অফ রোমের প্রতিবেদন "লিমিটস টু গ্রোথ" (1972), শুমাক রের বই "স্মল ইজ বিউটিফুল" (1974), ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশনের প্রতিবেদন "আওয়ার কমন ফিউচার" (1987) এবং অবশেষে রিও কনফারেন্সে "এজেন্ডা-21 প্রতিবেদন" (1993)-এ পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো

(i) মানব উন্নয়ন সূচক (2011) অনুযায়ী বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ভারতের ক্রম নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি?

(a) 126 (c) 128

(b) 134 (d) 129

(ii) ভারতের নিম্নলিখিত রাজ্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি মানব উন্নয়ন সূচকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে?

(a) তামিলনাড়ু (c) কেরালা

(b) পাঞ্জাব (d) হরিয়ানা

(iii) ভারতের নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যটিতে মহিলা সাক্ষরতা সর্বনিম্ন?

(a) জম্মু ও কাশ্মীর (c) ঝাড়খন্ড

(b) অরুণাচল প্রদেশ (d) বিহার

(iv) ভারতের নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যটিতে 0 - 6 বছর বয়সের লিঙ্গানুপাতে কন্যা শিশুর হার সর্বনিম্ন?

(a) গুজরাট (c) পাঞ্জাব

(b) হরিয়ানা (d) হিমাচল প্রদেশ

(v) ভারতের নিম্নলিখিত কোন্ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সর্বোচ্চ সাক্ষরতা হার রয়েছে?

(a) লাক্ষাদ্বীপ (c) দমন ও দিউ

(b) চন্ডীগড় (d) আন্দামান ও নিকোবর

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) মানব উন্নয়নের সংজ্ঞা লেখো।

(ii) উত্তর ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যগুলোতে মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরের দুটি কারণ লেখো।

(iii) ভারতে শিশু লিঙ্গানুপাত হ্রাসের দুটি কারণ লেখো।

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) 2011 সালে ভারতে মহিলা সাক্ষরতার স্থানিক ধরনগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং এর জন্য দায়ী কারণগুলো বিশ্লেষণ করো।

(ii) কোন্ কারণগুলো ভারতের রাজ্যগুলোতে মানব উন্নয়নের স্তরে স্থানিক বৈচিত্র্য ঘটায়।

একক II

অধ্যায় 4

মানব বসতি (HUMAN SETTLEMENTS)

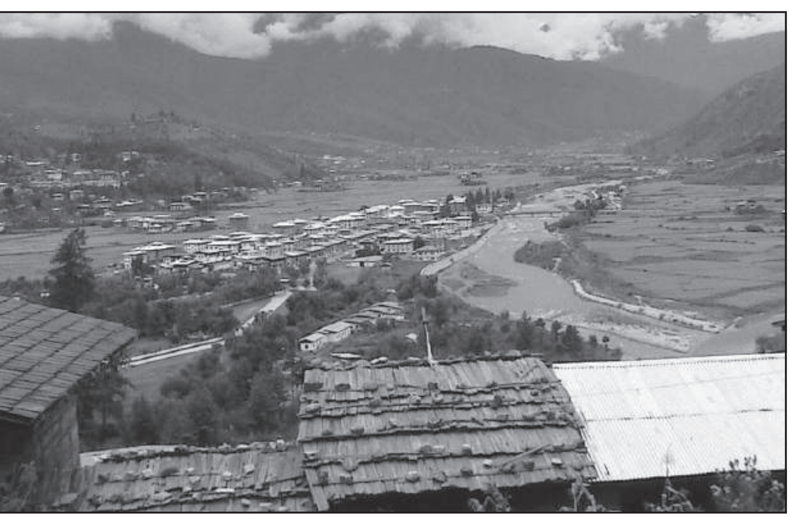

মানব বসতি হল যে কোনো প্রকারের বা আকারের আবাসের গুচ্ছ যেখানে মানুষ বসবাস করে। এই উদ্দেশ্যে, মানুষ বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপত্য তৈরি করে এবং কিছু এলাকার উপর তার আধিপত্য বিস্তার করে, যা তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিরূপে কাজ করে। এইভাবে, বসতির প্রক্রিয়াটি মানুষকে সহজাতভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এবং এলাকাগুলোকে তাদের সম্পদের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়।

জনবসতিতে আকৃতি ও প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তাদের বিস্তার ক্ষুদ্র হ্যামলেট থেকে মহানগর পর্যন্ত হতে পারে। আকারের সাথে সাথে জনবসতির অর্থনৈতিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়, পাশাপাশি বাস্তুসংস্থানগত অবস্থা এবং প্রযুক্তিবিদ্যারও পরিবর্তন ঘটে। জনবসতি ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্ত হতে পারে, আবার বৃহৎ ও সংঘবদ্ধও হতে পারে। বিক্ষিপ্ত রূপে অবস্থিত ক্ষুদ্র বসতিগুলোকে গ্রাম বলা হয়, যা কৃষি ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্যাবলিতে বিশেষজ্ঞ। অপরপক্ষে, অল্প সংখ্যক কিছু বসতি রয়েছে যা আকারে বৃহৎ, যাদের পৌর বসতি বলা হয়। এই বসতিগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের কার্যকলাপে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছে। গ্রামীণ ও পৌর বসতির মধ্যে যে মূল পার্থক্যগুলো রয়েছে তা নিম্নে দেখানো হলো—

- গ্রামীণ বসতিতে জীবনধারণের অবলম্বন বা মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো ভূমি সংক্রান্ত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সংগ্রহ করে। পক্ষান্তরে, পৌর বসতিতে একদিকে যেমন কাঁচামালের প্রক্রিয়াকরণ এবং সম্পূর্ণ পণ্যের উৎপাদন করা হয় তেমনি বিভিন্ন ধরনের সেবার উপরও নির্ভরতা দেখা যায়।
- নগরগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্রন্থি বা নোডরূপে কাজ করে, এগুলো শুধুমাত্র পৌর অঞ্চলের জনগণকেই পণ্য এবং সেবা প্রদান করে না, বরং আশেপাশের পশ্চাদভূমির গ্রামীণ বসতি অঞ্চলের জনগণকেও খাদ্য ও কাঁচামালের পরিবর্তে পণ্য ও সেবা প্রদান করে। গ্রামীণ ও পৌরবসতির মধ্যে এই কার্যভিত্তিক সম্পর্কটি পরিবহণ ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে থাকে।
- গ্রামীণ ও পৌর বসতিতে সামাজিক সম্পর্ক, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামীণ জনগণ কম সচল এবং এই কারণেই তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অপরদিকে, পৌর অঞ্চলে জীবনযাত্রার ধরন জটিল এবং দ্রুত, যার ফলে সামাজিক সম্পর্কগুলো বাহ্যিক।

গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ (Types of Rural Settlement)

নির্মাণাধীন এলাকার বিস্তার এবং ঘরগুলোর মধ্যকার দূরত্বের উপর ভিত্তি করে জনবসতির শ্রেণিবিভাগ নির্ধারিত হয়। ভারতে শ'খানেক

ঘর নিয়ে গড়ে উঠা গোষ্ঠীবন্ধ বা গুচ্ছবন্ধ গ্রাম বা বিশেষত উত্তরের সমভূমির একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। যদিও, এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে গ্রামীণ বসতির অন্যান্য গঠনও লক্ষ করা যায়। ভারতে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠার পেছনে বিভিন্ন কারণ এবং পরিস্থিতি দায়ী রয়েছে। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত — (i) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য– ভূখণ্ডের প্রকৃতি, উচ্চতা, জলবায়ু এবং জলের প্রাপ্যতা। (ii) সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত কারণ-- সামাজিক গঠন, জাতি এবং ধর্ম। (iii) নিরাপত্তাজনিত কারণ– চুরি ও ডাকাতি থেকে প্রতিরক্ষা। ভারতের গ্রামীণ বসতিকে বিস্তৃতভাবে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।-

- গোষ্ঠীবন্ধ, পুঞ্জীভবন, বা পিণ্ডাকৃতি,
- অর্ধ-গোষ্ঠীবন্ধ বা খণ্ডাকৃতি
- হ্যামলেটাকৃতি
- বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন

গোষ্ঠীবন্ধ বসতি (Clustered Settlements)

গোষ্ঠীবন্ধ গ্রামীণ বসতি হল গুচ্ছবন্ধ বা নিবিড়ভাবে গড়ে উঠা বাড়িঘর। এই ধরনের গ্রামীণ বসতিগুলো সাধারণ বসবাস করার এলাকাটি স্বতন্ত্র এবং আশেপাশের খামার, শস্যাগার এবং চারণভূমি থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করে। নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠা এলাকা এবং এর মধ্যবর্তী রাস্তাগুলো কিছু পরিচয়যোগ্য কিছু প্যাটার্ন বা

চিত্র 4.1 : উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলোর গুচ্ছবন্ধ বসতি

জ্যামিতিক আকৃতি যেমন- আয়তাকার, কেন্দ্রবিমুখ, রৈখিক প্রভৃতি। এ ধরনের বসতি উর্বর পলিযুক্ত সমভূমি এবং উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে, মানুষ গোষ্ঠীবন্ধ গ্রামে নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষাজনিত কারণে বসবাস করে, যেমন— মধ্য ভারতের বুন্দেলখন্দ অঞ্চল এবং নাগাল্যান্ড। রাজস্থানে জলের অভাবের কারণে গোষ্ঠীবন্ধ বসতি গড়ে উঠে যাতে যেটুকু জল সম্পদ রয়েছে তার সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়।

অর্ধ-গোষ্ঠীবন্ধ বসতি (Semi-Clustered Settlements)

বিক্ষিপ্ত বসতির সীমিত ক্ষেত্রগুলোতে যখন বসতির গোষ্ঠীবন্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তখন অর্ধ গোষ্ঠীবন্ধ জনবসতি গড়ে উঠে। বেশিরভাগ সময়ই এই ধরনের বসতির গড়ন বৃহৎ গোষ্ঠীবন্ধ গ্রামের পৃথকীকরণের ফলে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের এক বা একাধিক অংশের লোকজনকে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক মূল গ্রামীণ অংশ বা গোষ্ঠীবন্ধ বসতি থেকে কিছুটা দূরে বসবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে, সাধারণত, জমিদার এবং প্রভাবশালী সম্প্রদায় মূল গ্রামীণ এলাকায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি দখল করে। অপরদিকে, সমাজের নিম্নস্তরের এবং ভৃত্য শ্রেণির লোকেরা গ্রামের বাইরের অংশে বসবাস করে। এ ধরনের বসতি গুজরাট সমভূমি অঞ্চলে এবং রাজস্থানের কিছু অংশে বিস্তৃত রয়েছে।

চিত্র 4.2 : অর্ধ-গোষ্ঠীবন্ধ বসতি

ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবন্ধ বসতি (Hamleted Settlements)

মাঝে মাঝে বসতিগুলো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একই নাম বহন করে ভৌতিকভাবে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই এককগুলো স্থানীয়ভাবে পান্না, পাড়া, পল্লি, নাগলা, ধানি প্রভৃতি নামে দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই ধরনের বৃহৎ গ্রামের খণ্ডিকরণ প্রায়ই সামাজিক ও জাতিগত কারণ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ধরনের গ্রামগুলো মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি, ছত্তিশগড় এবং হিমালয়ের নিম্ন উপত্যকাগুলোতে ঘন ঘন দেখা যায়।

বিক্ষিপ্ত বসতি (Dispersed Settlements)

ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন কুড়ে ঘর বা সুদূর জঙ্গালের কিছু সংখ্যক কুড়ে ঘরের পল্লি বা হ্যামলেটে বা খামার সহ ছোট পাহাড় বা পাহাড়ের ঢালের তৃণভূমিতে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন বসতি দেখা যায়। বসতির চরম

চিত্র 4.3 : নাগাল্যান্ডের বিক্ষিপ্ত বসতি

বিক্ষেপন প্রায়ই ভূখণ্ডের চরম খণ্ডিকরণের ফলে এবং বসবাসযোগ্য এলাকার ভূমি সম্পদের ভিত্তিতে ঘটে থাকে। মেঘালয়, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং কেরালার অনেক এলাকায় এই ধরনের বসতি দেখা যায়।

পৌর বসতি (Urban Settlements)

গ্রামীণ বসতির অসদৃশ, পৌর বসতি সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধ এবং আকারের দিক থেকে বৃহৎ। এখানকার অধিবাসীরা কৃষিজ, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলিতে নিযুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহরগুলো কার্যগতভাবে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং, পণ্য সামগ্রীর এবং সেবার আদান প্রদান কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে বাজার কেন্দ্রিক শহর ও নগরগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং, নগরগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গ্রাম এবং শহরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা 'মানবীয় ভূগোলের মূলতত্ত্ব' বইয়ের দশম অধ্যায়ে শহরের সংজ্ঞা দেখে নিতে পারো।

ভারতীয় শহরসমূহের বিবর্তন (Evolution of Towns in India)

ভারতে শহরের উত্থান প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হয়ে আসছে। এমন কী সিন্ধু সভ্যতার যুগেও হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মত শহরের অস্তিত্ব ছিল। এর পরবর্তী সময় নগর বিকাশের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এই শহরের বিবর্তন, অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সাময়িক উত্থান ও পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন যুগে বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, ভারতীয় শহরসমূহকে বিভক্ত করা যায় :

• প্রাচীন শহর, • মধ্যযুগীয় শহর এবং • আধুনিক শহর।

প্রাচীন শহর (Ancient Towns)

ভারতে 2000 এর বেশি বছর ধরে ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অনেক শহর রয়েছে। এদের বেশির ভাগই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ররূপে বিকাশ লাভ করেছে। বারাণসী এধরনের শহরের মধ্যে অন্যতম। প্রয়াগ (এলাহাবাদ), পাটলীপুত্র (পাটনা), মাদুরাই হল দেশের অন্যান্য প্রাচীন শহরের উদাহরণ।

মধ্যযুগীয় শহর (Medieval Towns)

বর্তমানে প্রায় 100 টিরও বেশি শহরের মূল ইতিহাস মধ্যযুগে রয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই রাজ্যের রাজধানী এবং ক্ষুদ্র নৃপতির শাসনকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। এগুলো দুর্গ শহর রূপে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ-এর ওপর গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল— দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, লখনউ, আগ্রা এবং নাগপুর।

আধুনিক শহর (Modern Towns)

ব্রিটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা ভারতে অনেকগুলো শহরের পত্তন করেন। সামুদ্রিক স্থানগুলোতে তাদের জমি তৈরি করার শুরুর দিকে প্রথম কিছু বাণিজ্যিক বন্দর গড়ে তুলেছেন যেমন- সুরাট, দমন, গোয়া, পুদুচেরী প্রভৃতি। ব্রিটিশরা তিনটি প্রধান সংযোগস্থলকে কেন্দ্র করে মুম্বাই (বোম্বে), চেন্নাই (মাদ্রাজ) এবং কলকাতা (ক্যালকাটা)—

চিত্র 4.4 : আধুনিক নগরের একটি দৃশ্য

এদের নির্মাণ, ব্রিটিশ শৈলীকে দৃঢ় করেছে। ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্য প্রত্যক্ষরূপে বা প্রাদেশিক রাজ্যগুলোর মাধ্যমে বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো স্থাপন করেছে, শৈল শহরগুলোকে

সারণি 4.1 : ভারত-নগরায়নের গতি প্রকৃতি 1901-2011

বছর	শহরের জনসংখ্যা /পৌরপিণ্ড	পৌর জনসংখ্যা (হাজারে)	মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	পরপর দশকের বৃদ্ধি (%)
1901	1,827	25,851.9	10.84	—-
1911	1,815	25,941.6	10.29	0.35
1921	1,949	28,086.2	11.18	8.27
1931	2,072	33,456.0	11.99	19.12
1941	2,250	44,153.3	13.86	31.97
1951	2,843	62,443.7	17.29	41.42
1961	2,365	78,936.6	17.97	26.41
1971	2,590	1,09,114	19.91	38.23
1981	3,378	1,59,463	23.34	46.14
1991	4,689	2,17,611	25.71	36.47
2001	5,161	2,85,355	27.78	31.13
2011*	6,171	3,77,000	31.16	31.08

** উৎস : ভারতীয় জনগণনা : 2011 http.//www.censusindia.gov.in (Provisional)*

গ্রীষ্মকালীন রিসর্ট রূপে এবং নতুন নতুন অসামরিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক এলাকা যুক্ত করে। আধুনিক শিল্প শহরগুলোর 1850 সালের পর উৎপত্তি হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে জামসেদপুরের নাম উল্লেখ করা যায়।

স্বাধীনতার পর বিশাল সংখ্যক শহর প্রশাসনিক সদর দপ্তর রূপে বিকাশ লাভ করে। যেমন—চণ্ডিগড়, ভুবনেশ্বর, গান্ধিনগর, দিসপুর প্রভৃতি এবং শিল্প কেন্দ্র হিসাবে দুর্গাপুর, ভিলাই, সিন্দ্রি, বারাউনি প্রভৃতি গড়ে উঠে। কিছু পুরাতন শহরও মহানগরগুলোর উপনগর হিসাবে গড়ে উঠেছে, যেমন– দিল্লির আশেপাশে গাজিয়াবাদ, রোহটক্, গুরুগ্রাম প্রভৃতি। সমগ্র ভারতে গ্রামীণ অঞ্চলে বিনিয়োগের বৃদ্ধির ফলে বিশাল সংখ্যক মাঝারী ও ক্ষুদ্র শহরের বিকাশ ঘটেছে।

ভারতে নগরায়ণ (Urbanisation in India)

মোট জনসংখ্যার নিরিখে পৌর জনসংখ্যার শতকরা হিসাব থেকে নগরায়ণের স্তর পরিমাপ করা হয়। ভারতের নগরায়ণের স্তর 2011 সালে ছিল 31.16 শতাংশ, যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেকটা কম। বিংশ শতাব্দীতে মোট পৌর জনসংখ্যা এগারো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের নগরায়ণ ও পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে পৌর কেন্দ্রগুলোর বর্ধিতকরণ এবং নতুন নতুন শহরের উৎপত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (সারণি-4.1)। কিন্তু গত দুই দশকে নগরায়ণের এই বৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

জনসংখ্যার আয়তন অনুসারে শহরের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Towns on the basis of Population Size)

সারণি 4.2 তে ভারতীয় জনগণনা পর্ষদের দ্বারা পৌর কেন্দ্রের যে ছয়টি শ্রেণি রয়েছে তা দেখানো হল। পৌর কেন্দ্রের জনসংখ্যা যখন এক লক্ষের বেশি হয় তখন তাকে নগর বা প্রথম শ্রেণির শহর বলে। যেসব নগরে জনসংখ্যার আয়তন এক থেকে পাঁচ মিলিয়ন এর মধ্যে হয় তাকে মহানগর বলে এবং পাঁচ মিলিয়নের বেশি হলে তাকে মেগাসিটি বলে। বেশিরভাগ মহানগর এবং মেগাসিটিগুলো হল পৌরপিণ্ড। একটি পৌরপিণ্ড নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থার যে কোন

চিত্র 4.6 : ভারত : পৌর জনসংখ্যার বন্টন (%) পৌর কেন্দ্রের আকার অনুযায়ী — 2011

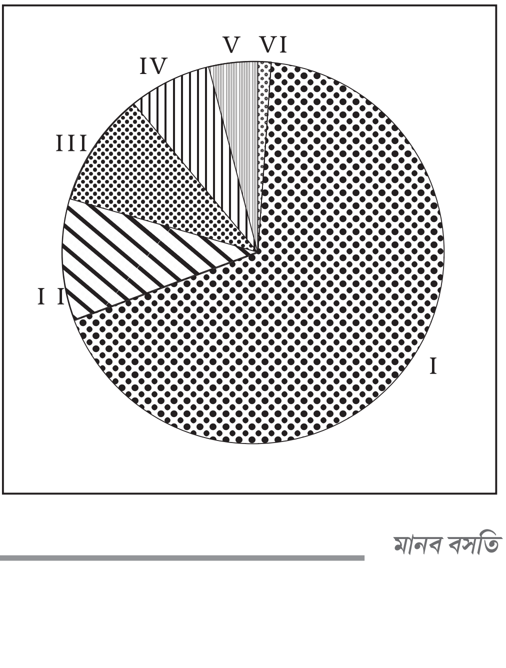

সারণি 4.2 : ভারত— শ্রেণিগতভাবে শহর ও নগর এবং তাদের জনসংখ্যা, 2011

শ্রেণি	জনসংখ্যার আকার	নগরের সংখ্যা	মোট পৌর জনসংখ্যা	শতকরা মোট পৌর জনসংখ্যা
I	**1,00,000 and more**	468	2,27,899	60.45
II	**50,000 – 99,999**	474	41,328	10.96
III	**20,000 – 49,999**	1,373	58,174	15.43
IV	**10,000 – 19,999**	1,683	31,866	8.45
V	**5,000 – 9,999**	1,749	15,883	4.21
VI	**Less than 5,000**	424	1,956	0.51

** উৎস : ভারতীয় জনগণনা পর্ষদ— 2011 এবং ভারত, 2017, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার।*

একটি হতে পারে— (i) একটি শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী বহির্বিকাশ (outgrowths), (ii) দুই বা ততোধিক পার্শ্ববর্তী শহর যা পৌর বহির্বিকাশ যুক্ত বা পৌর বহির্বিকাশহীন এবং (iii) একটি নগর ও এক বা একাধিক পার্শ্ববর্তী শহর এবং তাদের বহির্বিকাশ যা একত্রে সংলগ্ন অঞ্চলরূপে গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ, রেলওয়ে কলোনী, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বন্দর অঞ্চল, সেনাবাহিনী এলাকা বা ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি অঞ্চল পৌর বহির্বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে গ্রাম বা গ্রামীণ বহির্বিকাশের অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

সারণি 4.2 থেকে এটি প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ভারতের 60 শতাংশ পৌর জনসংখ্যা প্রথম শ্রেণির শহরে বসবাস করে। ভারতের 468টি নগরের মধ্যে, 53টি নগর/পৌরপিণ্ড হল মহানগর। এদের মধ্যে ছয়টি নগর মেগাসিটি, যার প্রত্যেকটির জনসংখ্যা 5 মিলিয়নে বেশি। পৌর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ (21%) এইসব মেগাসিটিতে বসবাস করে।

এদের মধ্যে বৃহত্তর মুম্বাই-এ সর্ববৃহৎ পৌরপিণ্ডটি রয়েছে যেখানে 18.4 মিলিয়ন লোক বসবাস করে। দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদ হল দেশের অন্যান্য মেগাসিটি।

শহরগুলোর কর্মভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Functional Classification of Towns)

কেন্দ্রীয় বা সংযোগ স্থল হিসাবে ভূমিকা থাকা ছাড়াও অধিকাংশ শহর ও নগরগুলো কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। কিছু কিছু শহর বা নগর কিছু বিশেষ বিশেষ সেবা বা উৎপাদন অথবা কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। বিশেষ কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে অথবা প্রধান কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে শহর ও নগরগুলোকে বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

প্রশাসনিক শহর ও নগরসমূহ (Administrative towns and cities)

যে সকল শহর উচ্চ স্তরের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে নির্ভর করে গড়ে উঠে, তাদের প্রশাসনিক শহর বলে। যেমন—চণ্ডিগড়, দিল্লি, ভুপাল, শিলং, গুয়াহাটি, ইম্ফল, শ্রীনগর, গান্ধিনগর, জয়পুর, চেন্নাই প্রভৃতি।

শিল্প শহরসমূহ (Industrial towns)

এইসব শহরসমূহের গড়ে ওঠার প্রধান সঞ্চালক শক্তি হল শিল্প। যেমন—মুম্বাই, সালেম, কোয়েম্বাটুর, মোদিনগর, জামসেদপুর, হুগলী, ভিলাই প্রভৃতি।

পরিবহণ শহরসমূহ (Transport Cities)

এই শহরগুলো প্রাথমিকভাবে আমদানি ও রপ্তানি বন্দররূপে কাজ করত যেমন— কান্ডালা, কোচি, কোঝিকোড, বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি।

বাণিজ্যিক শহরসমূহ (Commercial towns)

এই শ্রেণিতে সেইসব শহর ও নগর রয়েছে যেগুলো ব্যবসা এবং বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ। কলকাতা, সাহারানপুর, সাতনা প্রভৃতি কিছু উদাহরণ।

খনি শহরসমূহ (Mining towns)

এই শহরগুলো খনিজ সম্বৃদ্ধ এলাকায় গড়ে উঠেছে যেমন রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ডিগবয়, আংকেলেশ্বর, সিংরাউলি প্রভৃতি কিছু উদাহরণ।

গ্যারিসন (সেনানিবাস) শহরসমূহ (Garrisson Cantonment towns)

এই শহরগুলো গ্যারিসন শহর হিসাবে গড়ে উঠে। যেমন— আম্বালা, জলন্ধর, মহু, ববিনা, উধমপুর প্রভৃতি।

সারণি 4.3 ভারত: মিলিয়ন প্লাস সিটি/পৌরপিণ্ডের জনসংখ্যা, 2011

ক্রমিক নং	পৌরপিণ্ডের নাম	জনসংখ্যা
1.	শ্রীনগর	1,273,312
2.	লুধিয়ানা (পৌর পরিষদ)	1,613,878
3.	অমৃতসর	1,183,705
4.	চন্ডীগড়	1,025,682
5.	ফরিদাবাদ (পৌর পরিষদ)	1,404,653
6.	দিল্লি	16,314,838
7.	জয়পুর (পৌর পরিষদ)	3,073,350
8.	যোধপুর	1,137,815
9.	কোটা (পৌর পরিষদ)	1,001,365
10.	কানপুর	2,920,067
11.	লখনউ	2,901,474
12.	গাজিয়াবাদ	2,358,525
13.	আগ্রা	1,746,467
14.	বেনারস	1,435,113
15.	মিরাট	1,424,908
16.	এলাহাবাদ	1,216,719
17.	পাটনা	2,046,652
18.	কলকাতা	14,112,536
19.	আসানসোল	1,243,008
20.	জামসেদপুর	1,337,131
21.	ধানবাদ	1,195,298
22.	রাঁচি	1,126,741
23.	রায়পুর	1,122,555
24.	দূর্গ-ভিলাইনগর	1,064,007
25.	ইন্দোর	2,167,447
26.	ভুপাল	1,883,381
27.	জব্বলপুর	1,267,564
28.	গোয়ালিয়র	1,101,981
29.	আহমেদাবাদ	6,352,254
30.	সুরাট	4,585,367
31.	ভাদোদরা	1,817,191
32.	রাজকোট	1,390,933
33.	বৃহত্তর মুম্বাই	18,414,288
34.	পুনে	5,049,968
35.	নাগপুর	2,497,777
36.	নাসিক	1,562,769
37.	বিশাল বিরারনগর (পৌর পরিষদ)	1,221,233
38.	ঔরঙ্গাবাদ	1,189,376
39.	হায়দ্রাবাদ	7,749,334
40.	জি.ভি.এম.সি (পৌরসভা)	1,730,320
41.	বিজয়ওয়াড়া	1,491,202
42.	ব্যাঙ্গালুরু	8,499,399
43.	কোচি	2,117,990
44.	কোজিকোড	2,030,519
45.	থ্রিসুর	1,854,783
46.	মল্লাপুরম	1,698,645
47.	থিরুবনন্তপুরম	1,687,406
48.	কান্নুর	1,642,892
49.	কোল্লাম	1,110,005
50.	চেন্নাই	8,696,010
51.	কোয়েম্বাটুর	2,151,466
52.	মাদুরাই	1,462,420
53.	তিরুচিরাপল্লি	1,021,717

উৎস : ভারতীয় জনগণনা পর্ষদ— 2011, শর্তাধীন (ওয়েব সাইট http://www.censusindia.gov.in)

স্মার্ট সিটি মিশন

স্মার্ট সিটি মিশনের উদ্দেশ্য হল নগরগুলোকে সেভাবেই উন্নীত করা যা কেন্দ্রীয় পরিকাঠামো দান করবে, একটি স্বচ্ছ এবং স্থিতিশীল পরিবেশ এবং নাগরিকদের গুণগত মানের জীবনযাত্রা প্রদান করবে। স্মার্ট সিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিকাঠামোগুলোর ও সেবাসমূহে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা যাতে এগুলো আরও ভালো হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অঞ্চলগুলোকে বিপর্যয় থেকে কম বিপন্ন করা, কম সম্পদ ব্যবহার করে সস্তা পরিসেবা প্রদান। মূল কেন্দ্রবিন্দুটি হল স্থিতিশীল ও ব্যাপক উন্নয়ন এবং ধারণাটি হল গোষ্ঠীবদ্ধ এলাকাগুলোকে দেখাশোনা করা, একটি অনুকৃতিযোগ্য মডেল তৈরি করা, যা অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী নগরগুলোর জন্য আলোকস্তম্ভরূপে কাজ করবে।

নগরগুলোর রাজ্যভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করো এবং রাজ্যভিত্তিক বিভাগগুলোতে জনসংখ্যা অনুযায়ী দেখো।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় শহরসমূহ (Educational towns)

শিক্ষা ক্ষেত্রের কেন্দ্র হিসাবে শুরু হওয়ার পর, কিছু কিছু শহর বিশাল কলেজ চত্বরের শহর (Campus towns) হিসাবে গড়ে উঠে, যেমন— রুরকি, বেনারস, আলিগড়, পিলানি, এলাহাবাদ প্রভৃতি।

ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক শহরসমূহ (Religious and cultural towns)

ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কারণে বেনারস, মথুরা, অমৃতসর, মাদুরাই, পুরি, আজমের, পুষ্কর, তিরুপতি, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, উজ্জয়নী বিশিষ্ট শহরে পরিণত হয়েছে।

পর্যটন শহরসমূহ (Tourist towns)

নৈনিতাল, মুসৌরি, সিমলা, পাঁচমারী, যোধপুর, জয়সলমীর, উদাগমন্ডলম (ওটি), মাউন্ট আবু হল কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র।

নগরগুলো তাদের কার্যকলাপে স্থিতিশীল নয়। তাদের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের কার্যকলাপ পরিবর্তন করে।

এমনকি বিশেষজ্ঞ নগরসমূহ, যখন এগুলো মহানগরে পরিণত হয়, সেগুলো বহুবিধ কার্যকলাপে যুক্ত হয় যেখানে শিল্প, ব্যবসা, প্রশাসনিক, পরিবহণ প্রভৃতি প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। কার্যকলাপগুলো সেখানে এতই বিজড়িত যে সেই নগরগুলোকে আলাদাভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট কার্যকলাপের শহরের শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় না।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

(i) কোন্ শহরটি নদীর তীরে অবস্থিত নয়?

(a) আগ্রা (c) পাটনা

(b) ভুপাল (d) কলকাতা

(ii) ভারতীয় আদমশুমারী পর্ষদ অনুযায়ী নিম্নের কোন্‌টি শহরের সংজ্ঞার অংশ নয়—

(a) জনঘনত্ব 400 জন প্রতি বর্গ কিমি।

(b) পৌরসভা, নিগমের উপস্থিতি প্রভৃতি।

(c) জনসংখ্যার 75 শতাংশের বেশি প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকা।

(d) জনসংখ্যার আয়তন, 5,000 জনের বেশি।

(iii) নিম্নলিখিত কোন্ পরিবেশে বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়?

  (a) গঙ্গার পলি গঠিত সমভূমি।

  (b) রাজস্থানের শুষ্ক ও মরু-প্রায় অঞ্চলসমূহ।

  (c) হিমালয়ের নিম্ন উপত্যকাসমূহ।

  (d) উত্তর-পূর্বের অরণ্য ও পাহাড় সমূহ।

(iv) নিম্নলিখিত কোন্ নগরের শ্রেণিতে তাদের আয়তন ক্রম যেমন 1, 2, 3 এবং 4 -এ সাজানো হয়েছে?

  (a) বৃহত্তর মুম্বাই, ব্যাঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই

  (b) দিল্লি, বৃহত্তর মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা।

  (c) কলকাতা, বৃহত্তর মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা।

  (d) বৃহত্তর মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই।

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

  (i) গ্যারিসন (সেনানিবাস) শহর কী? তাদের কার্যাবলি কী?

  (ii) একটি পৌরপিণ্ডকে কীভাবে শনাক্ত করা যায়?

  (iii) মরুভূমি অঞ্চলে গ্রামের অবস্থিতির প্রধান কারণগুলো কী কী?

  (iv) মহানগর কী? এগুলো কীভাবে পৌরপিণ্ড থেকে আলাদা?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

  (i) বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের বসতির ধরন বা প্যাটার্ন এর জন্য দায়ী কারণগুলো কী কী?

  (ii) একটি কার্যভিত্তিক শহরের উপস্থিতি কি কল্পনা করা যেতে পারে? নগরগুলো কেন বহুবিধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়?

একক III
অধ্যায় 5

ভূ-সম্পদ ও কৃষি
(LAND RESOURCES AND AGRICULTURE)

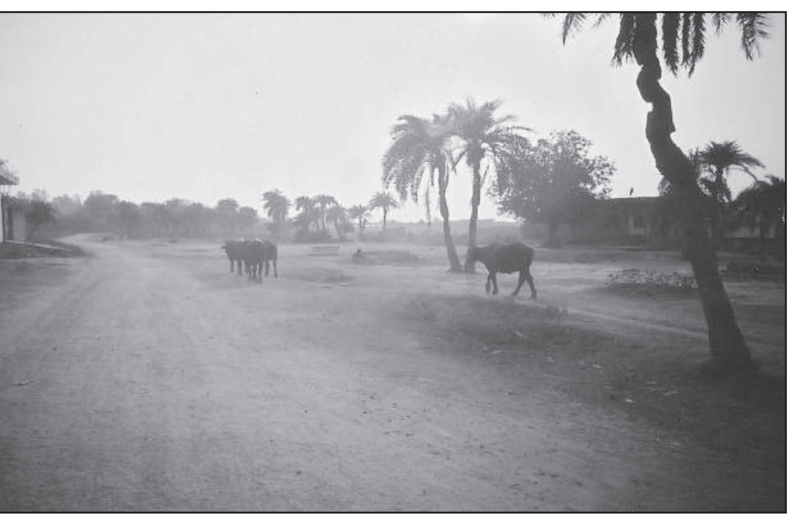

তোমরা অবশ্যই লক্ষ করেছ যে, তোমাদের চারপাশের ভূমি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এর কিছু অংশে নদী, কিছু অংশে বৃক্ষ এবং কিছু অংশে রাস্তা ও দালান নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ভূমি বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। মানুষ এইভাবে ভূমিকে উৎপাদনের পাশাপাশি আবাসস্থল ও বিনোদনের জন্যও সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং, তোমাদের বিদ্যালয় ভবন, রাস্তা যেগুলো দিয়ে তোমরা যাতায়াত কর, উদ্যান যেখানে তোমরা খেলাধুলা কর, খেত যেখানে ফসল ফলানো হয় এবং চারণভূমি যেখানে পশু চারণ করে প্রভৃতি ভূমির বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারকেই প্রদর্শিত করে।

ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ (Land Use Categories)

ভূমি ব্যবহারের নথিগুলো রাজস্ব বিভাগ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদগুলো প্রতিবেদনের ক্ষেত্রকে যুক্ত করে, যা ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে কিছুটা আলাদা। ভারতের প্রশাসনিক এককগুলোর ভৌগোলিক ক্ষেত্র সম্পর্কীত পরিমাপের জন্য ভারতীয় জরিপ বিভাগ (Survey of India) দায়বদ্ধ। তোমরা কি কখনও ভারতীয় জরিপ বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্র ব্যবহার করেছ? ভূমি রাজস্ব ও জরিপ বিভাগ এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য হল ভূমি রাজস্ব নথির হিসাব পূর্বের পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে কিছুটা হলেও পরিবর্তীত হয়, অন্যটি ভারতীয় জরিপ বিভাগের দ্বারা করা হয়ে থাকে, পরিবর্তীত হয় না এবং জরিপ বিভাগের পরিমাপ অনুসারে স্থির থাকে। ভূমি ব্যবহারের শ্রেণিবিভাগ এর সাথে তোমরা পরিচিত কারণ এগুলো তোমাদের দশম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্য বই-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভূমি রাজস্ব বিভাগকৃত ভূমি ব্যবহারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) ***বনভূমি (Forests) :*** এটি জেনে রাখা প্রয়োজন যে বনভূমি রূপে শ্রেণিবিভাগ করা অঞ্চল এবং বনভূমির অন্তর্গত বাস্তবিক অঞ্চল দুটি পৃথক। সরকার বনভূমির বৃদ্ধির জন্য বনভূমি রূপে শ্রেণিবিভক্ত অঞ্চলের শনাক্তকরণ ও সীমানা নির্ণয় করেছে। ভূমি রাজস্ব নথিতে এই সংজ্ঞাটিকে সর্বদা মানা হয়। তাই প্রকৃত বনভূমির অধীন অঞ্চলে কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই এই বিভাগে বৃদ্ধি হতে পারে।

(ii) ***অনুর্বর ও পরিত্যক্ত জমি (Barren and Wastelands) :*** এই ধরনের ভূমিতে প্রচলিত প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়েও কৃষিযোগ্য করা যায় না যেমন- পার্বত্য ভূখন্ড, মরুস্থল, খাত ক্ষয় (Revine) প্রভৃতিকে কৃষি অযোগ্য পরিত্যক্ত জমি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

(iii) *অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি* (Land put to Non-agricultural Uses): বসতির অন্তর্গত ভূমি (গ্রামীণ ও শহুরে), পরিকাঠামো (সড়ক, খাল ইত্যাদি), শিল্প, দোকান ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধিতে এই শ্রেণিবিভাগের ভূমির ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটে।

(iv) *স্থায়ী তৃণভূমি ও চারণভূমির অন্তর্গত অঞ্চল* (Area under Permanent Pastures and Grazing Lands) : এই প্রকারের অধিকাংশ ভূমি গ্রাম পঞ্চায়েত বা সরকারের মালিকানাধীন থাকে। এই ভূমির শুধুমাত্র ছোটো অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত এর মালিকানাধীন জমি সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান (Common Property Resources) এর অন্তর্ভুক্ত।

(v) *বিবিধ খামার ফসল ও কুঞ্জবন হিসাবে ব্যবহৃত ভূমি (মোট কৃষিজ ভূমি অন্তর্ভুক্ত নয়)* Area under Miscellaneous Tree Crops and Groves (Not included in Net sown Area) : এই শ্রেণিবিভাগে ফলবাগিচা ও ফলের গাছ দেখা যায়। এই ধরনের ভূমির অধিকতর অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

(vi) *চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমি* (Culturable Wasteland) : কোনো ভূমি যদি বিগত পাঁচ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পতিত ((অকর্ষিত) অবস্থায় থাকে তবে এটি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। ভূমি পুনরুদ্ধার পদ্ধতি প্রয়োগ করে একে চাষযোগ্য করা যেতে পারে।

(vii) *আপাতত পতিত ভূমি* (Current Fallow) : এই ধরনের ভূমি যেখানে একটি কৃষি বছর বা তার কম সময় ধরে চাষহীনভাবে পড়ে থাকে। ভূমির গুণমান বজায় রাখার জন্য ভূমিকে পতিত অবস্থায় রাখা হল একটি সাংস্কৃতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে জমি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় হারানো উর্বরতা ফিরে পায়।

(viii) *আপাতত পতিত ভূমি ব্যতীত অন্য পতিত ভূমি* (Fallow other than Current Fallow): এটি একটি চাষযোগ্য ভূমি যেটি এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময় ধরে অকর্ষিত অবস্থায় থাকে। যদি কোনো ভূমি পাঁচ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চাষহীন থাকে তবে একে চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমির শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

(ix) *মোট কৃষিজ ভূমি* (Net Area Sown): যে ভূমিতে ফসল বপন ও ফসল কাটা হয় তার প্রাকৃতিক পরিসরকে মোট কৃষিজ ভূমি বলা হয়।

ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন (Land-use Changes in India)

কোনো অঞ্চলের ভূমির ব্যবহার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে, সময়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলো পরিবর্তিত হওয়ায়, অন্যান্য অনেক প্রাকৃতিক সম্পদের মতো ভূমিকেও তার অঞ্চলের দিক দিয়ে স্থির করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, অর্থনীতির সেই তিনটি পরিবর্তনকে বুঝতে হবে যা ভূমির ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। এগুলো হল—

(i) **অর্থনীতির আয়তন (Size of the economy)** যেখানে উৎপাদিত দ্রব্য এবং অর্থনীতিতে প্রচলিত সকল পরিসেবার মূল্যকে পরিমাপ করা হয়) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার, আয় স্তরের পরিবর্তন, সহজলভ্য প্রযুক্তি এবং প্রভাব বিস্তারকারি কারণসমূহের জন্য অর্থনীতির আয়তন সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ সময়ের সাথে সাথে জমির উপর চাপ বাড়বে এবং প্রান্তিক জমিও ব্যবহারের আওতায় আসবে।

(ii) **অর্থনৈতিক পরিমাঠামো (The composition of the economy)** দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্য কথায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ সাধারণত প্রাথমিক স্তরের তুলনায় বিশেষত কৃষিক্ষেত্রের চেয়ে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের পরিবর্তন ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচলিত। এই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি অ-কৃষিকাজে ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হবে। তোমরা লক্ষ করলে দেখবে যে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো বৃহত্তর পৌর অঞ্চলে তীব্র। কৃষি জমিকে দালান নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

(iii) তৃতীয়ত, সময়ের সাথে সাথে কৃষি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সমূহের অবদান হ্রাস পেলেও, কৃষিকাজের জন্য জমির উপর চাপ হ্রাস পায় না। কৃষি জমির উপর ক্রমাগত চাপের কারণগুলো হল :

(a) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট দেশীয় উৎপাদন (GDP) এর তুলনায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হ্রাস পায়।

(b) কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

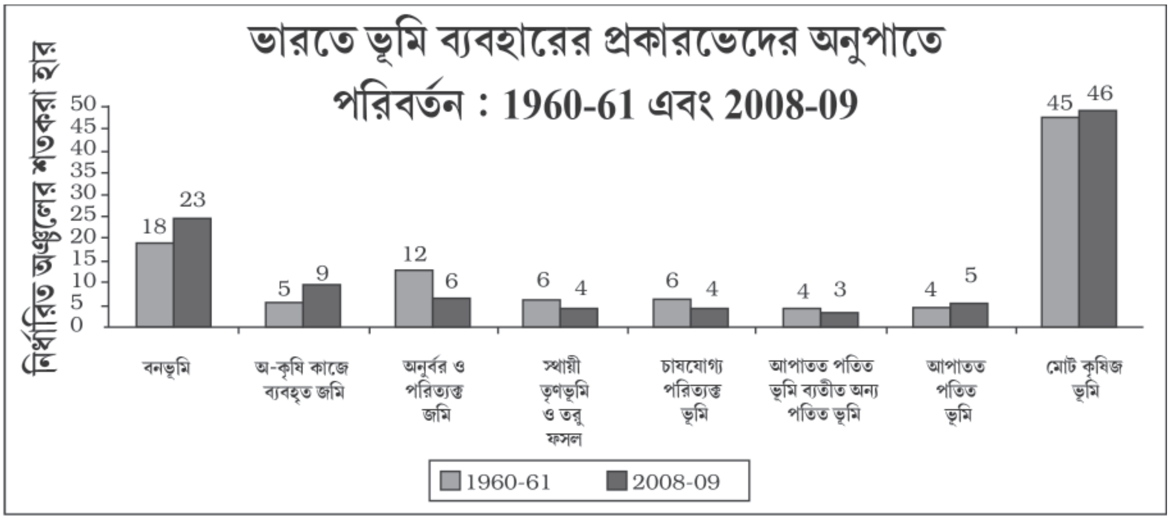

নোট : উপরে প্রদর্শিত লেখচিত্রে (iv) এবং (v) ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদকে যথোপযুক্তভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র 5.1

কাজ

পরিশিষ্ট (vii) এর সারণি 1 এবং 2-এ প্রদর্শিত 1960-61 এবং 1999-2000 সালের মোট দেশীয় উৎপাদনের প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের পরিবর্তিত অনুপাতের সাথে 1960-61 সাল ও 2008-09 সালের পরিবর্তিত ভূমি ব্যবহারের তথ্যের সাথে তুলনা করো।

বিগত চার বা পাঁচ দশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে বড়ো পরিবর্তন এসেছে এবং এটি দেশের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনগুলোকে প্রভাবিত করেছে। 1960-61 এবং 2008-09 সালের মধ্যেকার পরিবর্তনগুলো চিত্র 5.1-এ দেখানো হয়েছে। এই চিত্রটিকে বোঝার আগে দুটি দিকেই লক্ষ রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, চিত্রে প্রদর্শিত শতাংশ হার নির্ধারিত অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, যেহেতু নির্ধারিত অঞ্চলটি বছরের পর বছর ধরে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী ছিল, তাই এক বিভাগের হ্রাস সাধারণত অন্য কিছু বিভাগের বৃদ্ধিকে পরিচালিত করে।

চিত্রে চারটি বিভাগের সংখ্যা বেড়েছে, যেখানে চারটি বিভাগের সংখ্যা কমতে দেখা গিয়েছে। বনভূমির অন্তর্ভুক্ত ভূমি, অকৃষি কাজে ব্যবহৃত ভূমি, আপাতত পতিত ভূমি এবং মোট কৃষিজ ভূমির অনুপাতে বৃদ্ধি প্রদর্শিত করছে। নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলো এই বৃদ্ধির কারণ হতে পারে :

(i) অ-কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমিতে বৃদ্ধির হার সর্বাধিক হয় এর কারণ ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামো যার নির্ভরতা শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রসমূহ এবং পরিকাঠামোগত সুবিধার ব্যাপ্তির ওপর দিন দিন বেড়ে চলেছে। এছাড়া, গ্রাম ও শহুরে বসতির অন্তর্গত অঞ্চলের বিস্তারের ফলেও এতে বৃদ্ধি হয়েছে। এভাবে, অ-কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির প্রসার পরিত্যক্ত জমি ও কৃষি জমির হ্রাসের জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ii) পূর্বে বর্ণিত বনভূমির অধীন অঞ্চলের বৃদ্ধি, দেশের বিস্তৃত বনভূমির প্রকৃত বৃদ্ধির তুলনায় বরং নির্ধারিত বনভূমি অঞ্চলের বৃদ্ধি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

(iii) শুধুমাত্র দু'টি কারণের ওপর ভিত্তি করে আপাতত পতিত জমির বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বৃষ্টিপাত এবং শস্যাবর্তনের পরিবর্তনশীলতার ওপর ভিত্তি করে আপাতত পতিত ভূমির প্রবণতা বছরের পর বছর বিরাট মাত্রায় ওঠা নামা করে।

(iv) কৃষির উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমির ব্যবহারের ফলে মোট কৃষিজ ভূমির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের বৃদ্ধি একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এর আগে এই ক্ষেত্রে ধীর হ্রাস নথিভুক্ত করা হয়েছিল। অ-কৃষি কাজে ভূমির ব্যবহারের আওতাধীন অঞ্চল বৃদ্ধির কারণে বেশিরভাগ হ্রাস ঘটার ইঙ্গিত রয়েছে। (নোট : তোমাদের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের কৃষি জমির উপর নির্মাণ কার্যের সম্প্রসারণের ফলে)।

ভূমি ব্যবহারের যে চারটি বিভাগে হ্রাস নথিভুক্ত করা হয়েছে তা হল অনুর্বর ও পরিত্যক্ত জমি, চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমি, তৃণভূমি ও তরু ফসলের (tree crops) অন্তর্গত অঞ্চল এবং পতিত ভূমি।

এদের হ্রাসের প্রবণতার ব্যাখ্যা নিম্নের কারণগুলোর সাহায্যে করা যেতে পারে :

(i) সময়ের সাথে সাথে যেমন কৃষি ও অ-কৃষি উভয় ক্ষেত্রের কাজকর্মের জন্য জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায় তেমনই পরিত্যক্ত জমি এবং চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমির পরিমাণ সময়ানুসারে হ্রাসও এর সাক্ষ্য বহন করে।

(ii) কৃষি জমির উপর চাপ বৃদ্ধির কারণে তৃণভূমি ও চারণভূমির অন্তর্গত অঞ্চল হ্রাস পেয়েছে। চারণভূমিগুলোতে চাষাবাদ সম্প্রসারণের জন্য অবৈধ দখল মূলত এই হ্রাসের জন্য দায়ী।

কাজ

প্রকৃত বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি হারের মধ্যে পার্থক্য কী? পরিশিষ্ট (vii) (সারণি 1)-এ প্রদত্ত 1960-61 এবং 2008-09 সালে ভূমি ব্যবহারের সকল বিভাগের প্রকৃত বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি হারের ওপর কাজ করো, ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে

প্রকৃত বৃদ্ধির গণনার জন্য, দু'টি সময়কালের ভূমি ব্যবহারের বিভাগগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

বৃদ্ধি হারের গণনার জন্য, সাধারণ বৃদ্ধি হার অর্থাৎ দুটি সময় বিন্দুর সংখ্যার মধ্যেকার অন্তর যেমন প্রান্তিক বছরের সংখ্যা থেকে ভিত্তি বছর অর্থাৎ 1960-61 সালের সংখ্যাকে বিয়োগ করে, ভিত্তি বছরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করো। যেমন—

$$\frac{\text{2008-09 সালের মোট কৃষিজ ভূমি} - \text{1960-61 সালের মোট কৃষিজ ভূমি}}{\text{1960-61 সালের মোট কৃষিজ ভূমি}} \times 100$$

সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান (Common Property Resources)

ভূমিকে, মালিকানা অনুসারে বিশদভাবে দু'টি বৃহৎ অংশে শ্রেণিবিভক্ত করা যেতে পারে- ব্যক্তিগত জমি এবং সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান (common property resources/CPRs বা সি.পি.আর.এস)। যেখানে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জমি হল কোনো একজন ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর মালিকানাধীন, তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে ভূমিগুলো সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজ্য মালিকানাধীন হয়ে থাকে। সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান পশুদের জন্য খাদ্য, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য জ্বালানির পাশাপাশি অন্যান্য বনজ দ্রব্য যেমন ফলমূল, বাদাম, তন্তু, ঔষধি গাছ প্রভৃতি সরবরাহ করে। গ্রামীণ অঞ্চলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির ব্যক্তির জীবনযাপনে এই ভূমির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেহেতু তাদের বেশিরভাগেরই সীমিত জমি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে পশুপালন থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। মহিলাদের জন্যও সি.পি.আর.এস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রামীণ অঞ্চলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই পশুখাদ্য এবং জ্বালানি সংগ্রহ করে। সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থানের অভাবপূর্ণ অঞ্চলে জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়।

সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান (CPRs) কে সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যেক সদস্যের এটি উপভোগ করার অধিকার থাকে, তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির অধিকার না থাকলেও প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সহ ব্যবহারের অধিকার থাকে। সামাজিক বনায়ন, তৃণভূমি, গ্রামের জলাশয় এবং অন্যান্য সরকারী জায়গাগুলো সি.পি.আর.এসের উদাহরণ যেখানে পরিবার বা পরিবার এককের চেয়ে বড়ো একটি শ্রেণি ব্যবহারের অধিকার প্রয়োগ করে এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

ভারতে কৃষি ভূমির ব্যবহার (Agricultural Land Use in India)

ভূ-সম্পদের গুরুত্ব তাদের কাছে খুবই বেশি যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল :

(i) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপের তুলনায় কৃষি সম্পূর্ণরূপে একটি ভূমি নির্ভর ক্রিয়াকলাপ। অন্য কথায় বলা যায়, কৃষি উৎপাদনে ভূমির অবদান অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনে ভূমির অবদানের চেয়ে বেশি। সুতরাং গ্রামীণ অঞ্চলে ভূমিহীনতা দরিদ্রতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

(ii) ভূমির গুণগতমান কৃষির উৎপাদনশীলতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, যা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে হয় না।

(iii) গ্রামীণ অঞ্চলে ভূ-সম্পদের আর্থিক মূল্য ছাড়াও সামাজিক মূল্য রয়েছে, প্রাকৃতিক ঝুঁকি বা জীবন বিপত্তির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদাও বৃদ্ধি করে।

মোট কৃষিজ ভূ-সম্পদ (অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমি) এর সম্ভার সম্পর্কে অনুমান, মোট কৃষিজ ভূমি, সকল পতিত ভূমি এবং চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমিকে যোগ করে করা যেতে পারে। সারণি 5.1 থেকে এটি দেখা যায় যে বিগত বছরগুলোতে নির্ধারিত অঞ্চলের মধ্যে কৃষি ভূমির শতকরা হার কমেছে। চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কর্ষিত জমির পরিমাণ অধিক হ্রাস পেয়েছে।

সারণি 5.1 : মোট চাষযোগ্য ভূমির গঠন

কৃষি ভূমির ব্যবহার প্রকারভেদ	*নির্ধারিত অঞ্চলের শতকরা হার*		*মোট চাষযোগ্য ভূমির শতকরা হার*	
	1960-61	**2008-09**	**1960-61**	**2008-09**
চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমি	6.23	4.17	10.61	7.14
আপাতত পতিত ভূমি ব্যতীত অন্যান্য পতিত ভূমি	3.5	3.37	5.96	5.75
আপাতত পতিত ভূমি	3.73	4.76	6.35	8.13
মোট কৃষিজ ভূমি	45.26	46.24	77.08	78.98
মোট চাষযোগ্য ভূমি	***58.72***	***58.54***	***100.00***	***100.00***

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পস্ট যে ভারতে মোট কৃষিজ ভূমির অধীনে অতিরিক্ত ভূমি অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সীমিত। তাই ভূমি সংরক্ষণ প্রযুক্তি অবলম্বন ও গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এ ধরনের প্রযুক্তিগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— যেগুলো ভূমির একক প্রতি বিশেষ কোনো ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে এবং যেগুলো একটি কৃষি বর্ষে ভূমির ব্যবহারের নিবিড়তা বাড়িয়ে সকল ফসলের একক প্রতি মোট উৎপাদনকে বাড়ায়। দ্বিতীয় প্রযুক্তিটির সুবিধা হল সীমিত জমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকের চাহিদাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। ভারতের মতো ভূমির অভাবযুক্ত কিন্তু শ্রম সমৃদ্ধ দেশের জন্য উচ্চ শস্য প্রগাঢ়তা (cropping intensity) কেবলমাত্র ভূ-সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেকারত্ব হ্রাস করার জন্যও প্রয়োজনীয়।

নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে শস্য প্রগাঢ়তা (CI) নিরূপণ করা যায়।

$$\text{শস্য প্রগাঢ়তার শতকরা হার} = \frac{\text{মোট কৃষি জমি (GCA)}}{\text{প্রকৃত কৃষি জমি (NSA)}} \times 100$$

ভারতের শস্য ঋতুসমূহ (Cropping Seasons in India)

দেশের উত্তরাঞ্চল এবং অভ্যন্তরীণ ভাগে খারিফ, রবি এবং জ্যায়েদ নামে তিনটি সুস্পষ্ট শস্য ঋতু দেখা যায়। খারিফ শস্য মূলত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী ঋতুতে বপন করা হয়। যার মধ্যে ক্রান্তীয় ফসল যেমন- ধান, কার্পাস, পাট, জোয়ার, বাজরা এবং অড়হর ডাল ইত্যাদি চাষ করা হয়ে থাকে। রবি ঋতু অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতের আগমনে শুরু হয়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে শেষ হয়। এই ঋতুতে নিম্ন তাপমাত্রা গম, ছোলা এবং সরিষার মতো নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় ফসলের চাষকে সহজতর করে। জ্যায়েইদ হল স্বল্প সময়ের গ্রীষ্মকালীন শস্য ঋতু, যেটি রবি শস্য তোলার পর শুরু করা হয়। এই ঋতুতে তরমুজ, শসা, শাকসবজি এবং গবাদি পশুর জন্য চারণ ফসলের চাষ সেচ যুক্ত জমিতে করা হয়। তবে এই প্রকার সুস্পষ্ট শস্য ঋতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দেখা যায় না। এখানে, বছরের যে কোন সময়ে তাপমাত্রা ক্রান্তীয় ফসল ফলানোর জন্য আদর্শ, তবে মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য দক্ষিণ ভাগে যে সব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্তিকায় আর্দ্রতা রয়েছে সেখানে একটি কৃষি বর্ষে একই ফসলের চাষ তিনবার করা যায়।

কৃষির প্রকারভেদ (Types of Farming)

ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার প্রধান উৎসের ভিত্তিতে, কৃষিকে সেচযুক্ত (***irrigated***) এবং বর্ষা নির্ভর (***Rainfed***) (বারানী) এই দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। জলসেচের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সেচযুক্ত কৃষির প্রকৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যেমন- সংরক্ষণশীল সেচযুক্ত কৃষি অথবা উৎপাদনশীল সেচযুক্ত কৃষি। সংরক্ষণশীল জলসেচের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মৃত্তিকায় আর্দ্রতার অভাবের ফলে ফসলকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা, এর অর্থ এই যে জলসেচ হল জলের সহায়ক উৎস যার মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য কারণে হওয়া জলের অভাবকে পূরণ করা যায়। এই প্রকার সেচের

সারণি 5.2 : ভারতের শস্য ঋতুসমূহ

শস্য ঋতু	*মুখ্য চাষযোগ্য ফসল*	
	উত্তর ভারতীয় রাজ্য	*দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য*
খারিফ জুন-সেপ্টেম্বর	*ধান, কার্পাস, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, অড়হর*	*ধান, ভুট্টা, রাগী, জোয়ার, চীনাবাদাম*
রবি অক্টোবর-মার্চ	*গম, ছোলা, র‍্যাপ বীজ ও সরিষা, বার্লি*	*ধান, ভুট্টা, রাগী চীনাবাদাম, জোয়ার*
জ্যায়েইদ এপ্রিল-জুন	*শাকসবজি, ফলমূল পশু খাদ্য*	*ধান, শাকসবজি, পশু খাদ্য*

উদ্দেশ্য হল অধিকাংশ সম্ভাব্য এলাকায় মৃত্তিকার আর্দ্রতা সরবরাহ করা। উৎপাদনশীল সেচ বলতে বোঝায় যে শস্যের মরশুমে পর্যাপ্ত মৃত্তিকা আর্দ্রতা সরবরাহ করে উচ্চ ফলন প্রাপ্ত করা। এই প্রকার সেচ ব্যবস্থায় কর্ষিত জমির প্রতি একক এলাকায় জলের যোগান সংরক্ষণমূলক সেচের তুলনায় বেশি হয়। বর্ষানির্ভর কৃষিকে শস্যের মরশুমে মৃত্তিকা আর্দ্রতার প্রাচুর্যতার ভিত্তিতেও শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, যথা- শুষ্কভূমি কৃষি এবং আর্দ্রভূমি কৃষি। ভারতে, **শুষ্কভূমি কৃষি** মূলত যে সকল অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 75 সেমির কম সে সকল অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই সকল অঞ্চলে কষ্টসহিষ্ণু ও খরা সহ্যকারী শস্য উৎপাদন করা হয় যেমন- রাগী, বাজরা, মুগ, ছোলা এবং গুয়ার (পশু খাদ্যশস্য) এবং এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও বৃষ্টির জল ব্যবহারের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। আর্দ্রভূমি কৃষিতে বর্ষা ঋতুর সময় উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় মৃত্তিকা আর্দ্রতার অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই প্রকার অঞ্চলগুলো বন্যা এবং মৃত্তিকা ক্ষয়ের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এসকল অঞ্চলে জলনিবিড় অর্থাৎ যে সকল শস্য উৎপাদনে অধিক জলের প্রয়োজন হয় সে সকল বিভিন্ন প্রকার শস্য চাষ করা হয়। যথা– ধান, পাট ও আখ এবং স্বাদু জলের জলাশয়ে জলজ কৃষি (aquaculture) করা হয়।

খাদ্যশস্য সমূহ (Foodgrains)

ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে খাদ্যশস্যের গুরুত্ব থেকে বোঝা যায় যে, এই শস্যগুলো দেশের মোট শস্য ক্ষেত্রের প্রায় দুই—তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে। দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যই হল প্রধান শস্য তা জীবিকাস্বত্ত্বাভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিই হোক অথবা বাণিজ্যিক কৃষি অর্থনীতিই হোক। শস্যের গঠনের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যগুলোকে দানাশস্য এবং ডাল হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে।

দানাশস্য (Cereals)

ভারতে মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা প্রায় 54 ভাগে দানাশস্য (cereals) চাষ করা হয়। ভারত বিশ্বের শতকরা প্রায় 11 ভাগ দানাশস্য উৎপাদন করে এবং চিন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভারত বিভিন্ন প্রকারের দানাশস্য উৎপাদন করে যেগুলোকে সূক্ষ্ম দানাশস্য (ধান, গম) এবং মোট দানাশস্য (জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, রাগী) ইত্যাদি ভাগে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ দানাশস্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

ধান বা চাল (Rice)

ভারতের অধিকতর জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য হল চাল। যদিও একে আর্দ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হিসাবে গণ্য করা হয়, তথাপি প্রায় 3,000 -এর মতো বিভিন্ন ধরনের ধান পাওয়া যায় যা ভিন্ন ভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে চাষ করা হয়। এগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2000 মিটার উচ্চতায় এবং পূর্ব ভারতের আর্দ্র অঞ্চল থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম ভাগ ও উত্তর রাজস্থানের শুষ্ক অথচ সেচযুক্ত অঞ্চলে সফলভাবে উৎপাদন করা হয়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গ অনুকূল জলবায়ুর কারণে একটি কৃষি বছরে দু' বা তিন প্রকার ধান চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ কৃষকরা তিন প্রকার ধান চাষ করে যথা— 'আউশ (*aus*), 'আমন' (*aman*) এবং 'বোরো' (*boro*)। কিন্তু হিমালয় ও দেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে এটিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি ঋতুর সময় খারিফ শস্য রূপে চাষ করা হয়। ভারত বিশ্বের ধান উৎপাদনের শতকরা 21.2 ভাগ উৎপাদন করে এবং 2014 সালে চিনের পর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল। দেশের মোট শস্যক্ষেত্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জমি ধান চাষের অধীন। 2015-16 সালে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব ধান উৎপাদনে দেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেলারায় ধানের ফলন বেশি। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম চারটিতে ধান চাষের অন্তর্গত প্রায় সমগ্র জমিতেই জলসেচ দ্বারা চাষ করা হয়, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা

চিত্র 5.2 : ভারতের দক্ষিণ ভাগে ধানের চারা রোপণ।

চিরাচরিত ধান উৎপাদক অঞ্চল নয়। 1970 দশকে সবুজ বিপ্লবের পর, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার সেচযুক্ত অঞ্চলগুলোতে ধান চাষের সূচনা হয়েছিল। জিনগত ভাবে উন্নত প্রজাতির বীজ, তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং শুষ্ক জলবায়ুর

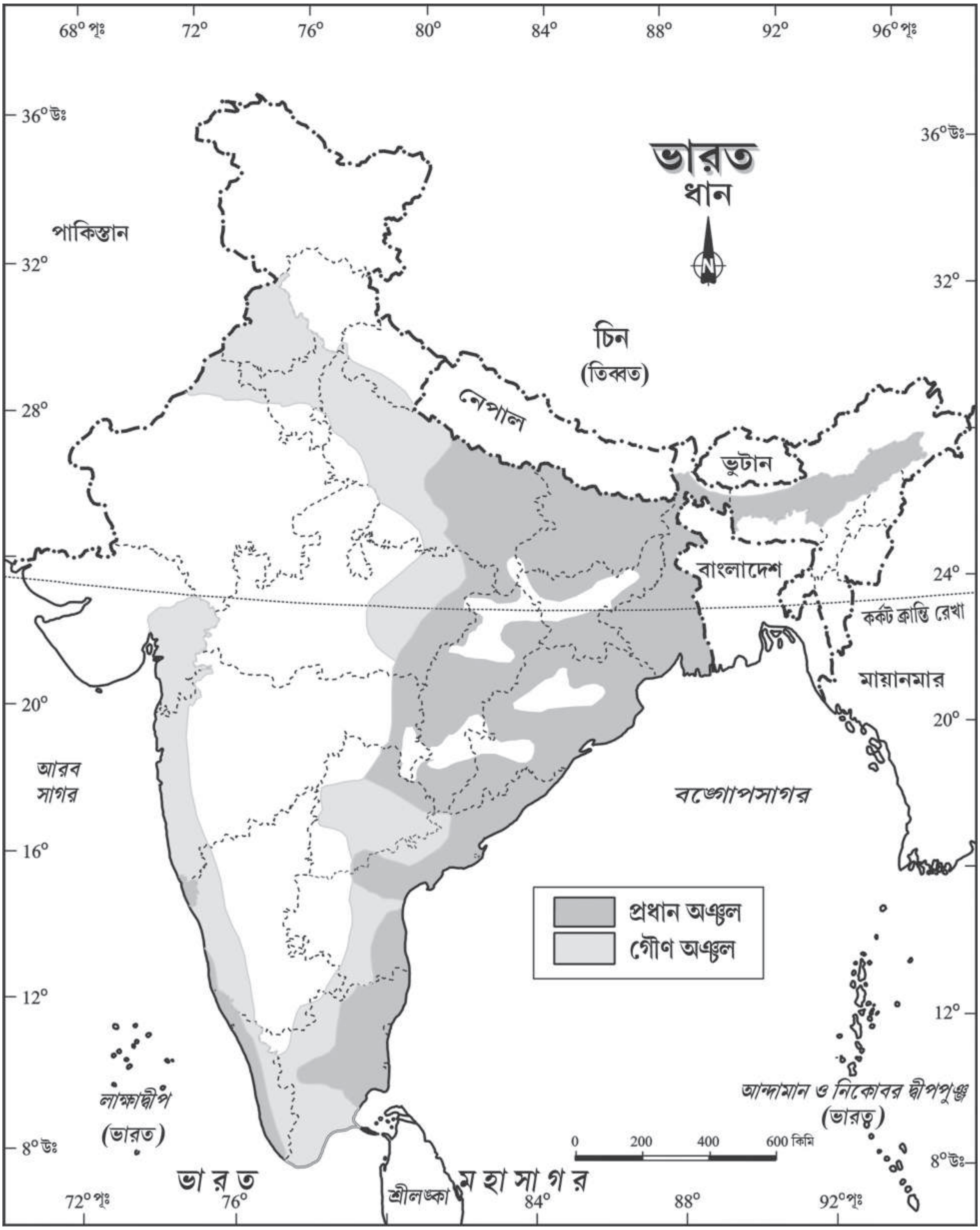

চিত্র 5.3 : ভারত—ধানের বণ্টন

কারণে পোকামাকড়ের ফসলের প্রতি নিম্ন সংবেদনশীলতা ইত্যাদি এই অঞ্চলে ধানের উচ্চ ফলনের জন্য দায়ী। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলগুলোতে এই শস্যের ফলন খুবই কম।

গম (Wheat)

ভারতে ধানের পর গম হল দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দানাশস্য। বিশ্বের মোট গম উৎপাদানের শতকরা প্রায় 13.1 ভাগ ভারত উৎপাদন করে (2014)। এটি প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য। একারণে, ভারতে এর চাষ শীতকালে অর্থাৎ রবি মরশুমে করা হয়। এই শস্যের অন্তর্গত মোট জমির শতকরা প্রায় 85 ভাগ দেশের উত্তর ও মধ্যভাগে অর্থাৎ ভারত গাঙ্গোঁয় সমভূমি, মালব মালভূমি এবং হিমালয়ের 2,700 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অঞ্চলে কেন্দ্রিভুত হয়েছে। রবি ফসল হওয়ায়, গমকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে করা হয়। কিন্তু হিমালয়ের উচ্চভুমি এবং মধ্যপ্রদেশের মালব মালভূমির অংশবিশেষে এটি বৃষ্টি নির্ভর শস্য। দেশের মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা প্রায় 14 ভাগ গম চাষের আওতাধীন। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান হল প্রধান গম উৎপাদক রাজ্য সমূহ। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় গমের ফলন খুব বেশি (4000 কেজি/হেক্টরের অধিক), যেখানে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং বিহারে ফলন মাঝারি প্রকৃতির। মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলোতে গম চাষ বৃষ্টি নির্ভর তথা ফলনও কম হয়।

জোয়ার (Jowar)

দেশের মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা প্রায় 16.50 ভাগ একত্রে মোটা দানাশস্য দখল করে আছে। এগুলোর মধ্যে জোয়ার বা সরঘুম (*sorghum*) প্রধান যা মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা প্রায় 5.3 ভাগ জমিতে চাষ করা হয়। এটি মধ্য ভারতের প্রায় শুষ্ক অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতে প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের মোট জোয়ার উৎপাদনের অর্ধেকের চেয়ে বেশি মহারাস্ট্র উৎপাদন করে। জোয়ার উৎপাদক অন্যান্য রাজ্যসমূহ হল কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা। দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলোতে এটিকে খারিফ ও রবি উভয় কৃষি মরশুমেই রোপন করা হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে এটি হল খারিফ শস্য যেখানে জোয়ারকে মূলত পশুখাদ্য রূপে চাষ করা হয়। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে এটি বৃষ্টি নির্ভর শস্য এবং এই অঞ্চলে এর ফলনের হার কম।

বাজরা (Bajra)

দেশের উত্তরপশ্চিমাংশ এবং পশ্চিম ভাগের উষ্ণ এবং শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে বাজরা চাষ করা হয়। এটি একটি কষ্টসহিষ্ণু শস্য যা এই অঞ্চলের ঘন ঘন শুষ্ক ঋতু ও খরা সহ্য করে। এটি এককভাবে তথা মিশ্র ফসলের অংশ হিসাবেও চাষ করা হয়। এই মোটা দানাশস্য দেশের মোট কৃষিজ জমির শতকরা প্রায় 5.2 ভাগে ব্যাপ্ত। মুখ্য বাজরা উৎপাদক রাজ্যসমূহ হল মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা। বৃষ্টিনির্ভর শস্য হওয়ায় রাজস্থানে এই শস্যের ফলন কম এবং বছর বছর পরিবর্তন হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হরিয়ানা এবং গুজরাট খরা প্রতিরোধী বীজ এবং জলসেচের বিস্তারের কারণে এই শস্যের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুট্টা (Maize)

ভুট্টা একটি খাদ্যশস্যের পাশাপাশি পশুখাদ্য রূপেও প্রায় শুস্ক জলবায়ু অঞ্চলে এবং নিকৃষ্টমানের মৃত্তিকায় চাষ করা হয়। এই শস্যটি মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা মাত্র 3.6 ভাগ দখল করে। ভুট্টা চাষ কোনো বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত নয়। পাঞ্জাব, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এটিকে চাষ করা হয়। ভুট্টা উৎপাদক মুখ্য রাজ্যগুলো হল কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ। ভুট্টার উৎপাদন অন্যান্য মোটা দানাসমূহের তুলনায় অধিক হয়। এর ফলন দক্ষিণ ভাগের রাজ্যসমূহে বেশি এবং মধ্য ভারতের দিকে হ্রাস পায়।

ডাল (Pulses)

ডাল, নিরামিষ খাবারগুলোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এগুলো প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। এগুলো শিম্বি গোত্রীয় ফসল যা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের মাধ্যমে মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভারত বিশ্বের ডাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। দেশে ডালের চাষ মূলত দক্ষিণাত্যের শুষ্কভূমি ও মধ্যভাগের মালভূমি এবং দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রিভূত। ডাল দেশের মোট শস্যক্ষেত্রের প্রায় 11 শতাংশ দখল করে আছে। শুষ্ক জমির বর্ষা নির্ভর ফসল হওয়ায়, ডালের ফলন কম হয় এবং বছর বছর এর ফলন ওঠানামা করতে থাকে। ভারতে চাষ করা ডালশস্যের মধ্যে ছোলা ও অড়হর প্রধান।

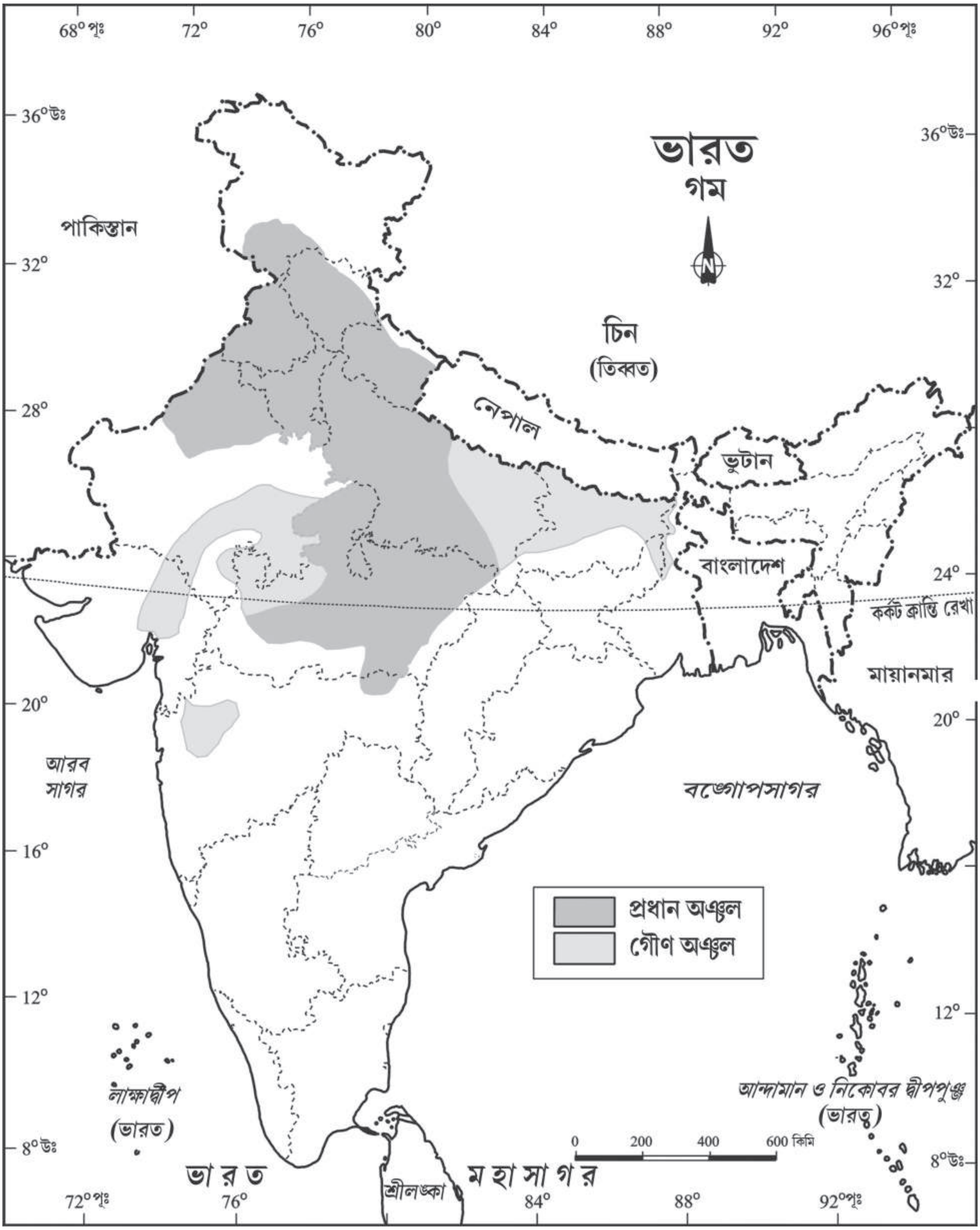

চিত্র 5.4 : ভারত—গমের বণ্টন

ছোলা (Gram)

উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে ছোলা চাষ করা হয়। এটি মূলত বর্ষা নির্ভর ফসল যা রবি মরশুমে দেশের মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চাষ করা হয়। এই ফসলটিকে সফলভাবে ফলানোর জন্য এক বা দুই বার হালকা বৃষ্টির বা সেচের প্রয়োজন। সবুজ বিপ্লবের পরে হরিয়ানা পাঞ্জাব এবং উত্তর রাজস্থানে ফসল চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে যার ফলে ছোলার পরিবর্তে গম চাষ করা হয়। বর্তমানে ছোলা দেশের মোট কৃষিজ ভূমির প্রায় 2.8 শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এই ডাল জাতীয় শস্যের প্রধান উৎপাদক হল মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং রাজস্থান। সেচসেবিত অঞ্চলগুলোতেও এই ফসলের ফলন কমতে থাকে এবং বছর বছর ফলন ওঠানামা করতে থাকে।

অড়হর (Tur) (Arhar)

অড়হর দেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ডাল জাতীয় শস্য। এটি লাল অড়হর বা পিজন পী. (*pigeon pea*) নামেও পরিচিতি। এটি দেশের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগের শুষ্ক অঞ্চলে প্রান্তিক জমিতে এবং বর্ষা নির্ভর পরিস্থিতিতে চাষ করা হয়। এটি দেশের মোট কৃষিজ জমির মাত্র 2 শতাংশ দখল করেছে। অড়হর ডালের মোট উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র থেকেই আসে। অন্যান্য মুখ্য উৎপাদক রাজ্যগুলো হল উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ। এই ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম ও অনিয়মিত।

কাজ

বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। বিভিন্ন ধরনের শস্য মিশ্রিত করো এবং ডাল থেকে দানাশস্য কে আলাদা করো। এছাড়াও মোটা দানা শস্য থেকে মিহি দানাশস্যকে পৃথক করো।

তৈলবীজ (Oilseeds)

তৈলবীজগুলো ভোজ্যতেল নিষ্কাশনের জন্য উৎপাদিত হয়। ভারতের তৈলবীজ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো হল- মালব মালভূমির শুষ্ক অঞ্চল, মারাটওয়াড়া, গুজরাট, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশের রয়েলসীমা ও কর্ণাটক মালভূমি। এই ফসলগুলো দেশের মোট কৃষিজ জমির প্রায় 14 শতাংশ দখল করেছে। ভারতে উৎপন্ন প্রধান তৈলবীজ ফসলগুলো হল- চিনাবাদাম, র‍্যাপসীড ও সরিষা, সোয়াবিন ও সূর্যমুখী।

চিনাবাদাম (Groundnut)

বিশ্বের মোট চিনাবাদাম উৎপাদনের প্রায় 14.9 শতাংশ ভারত উৎপাদন করে (2014)। এটি মূলত শুষ্ক জমির বর্ষানির্ভর খারিফ (*kharif*) ফসল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এর চাষ রবি (rabi) মরশুমেও হয়। এটি দেশের মোট কৃষিজ জমির 3.6 শতাংশ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র হল প্রধান উৎপাদক রাজ্য। তামিলনাড়ুতে যেসকল স্থানে আংশিক সেচ পদ্ধতি রয়েছে সেখানে তুলনামূলকভাবে চিনাবাদামের ফলন বেশি। তবে এর ফলন তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে কম।

র‍্যাপসিড ও সরিষা (Rapeseed and Mustard)

র‍্যাপসিড ও সরিষার মধ্যে বিভিন্ন তৈলবীজ রয়েছে যেমন, রাই, সরিষা, তোরিয়া এবং তারামীরা। এগুলো উপক্রান্তীয় ফসল যা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভাগে রবি মরশুমে চাষ করা হয়। এগুলো তুষার সহিষ্ণু ফসল এবং বছর বছর তাদের ফলনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তবে সেচ সম্প্রসারণ এবং বীজ প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে তাদের ফলন কিছুটা উন্নত ও স্থিতিশীল হয়েছে। এই শস্যগুলোর অধীন চাষযোগ্য জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেচযুক্ত হয়। এই তৈলবীজগুলো একসাথে দেশের মোট কৃষিজ জমির 2.5 শতাংশ দখল করেছে। রাজস্থান একাই এই উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে এবং অন্যান্য প্রধান উৎপাদক রাজ্যগুলো হল হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশ। এই ফসলগুলোর ফলন তুলনামূলকভাবে হরিয়ানা ও রাজস্থানে বেশি।

অন্যান্য তৈলবীজ (Other Oilseeds)

সয়াবিন ও সূর্যমুখী হল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ যা ভারতে উৎপাদন করা হয়। অধিকাংশ সয়াবিন মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে উৎপাদন করা হয়।এই দুটি রাজ্য একত্রে দেশের মোট সয়াবিন উৎপাদনের

চিত্র 5.5 : মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে কৃষকরা সয়াবিন বীজ বপন করছে।

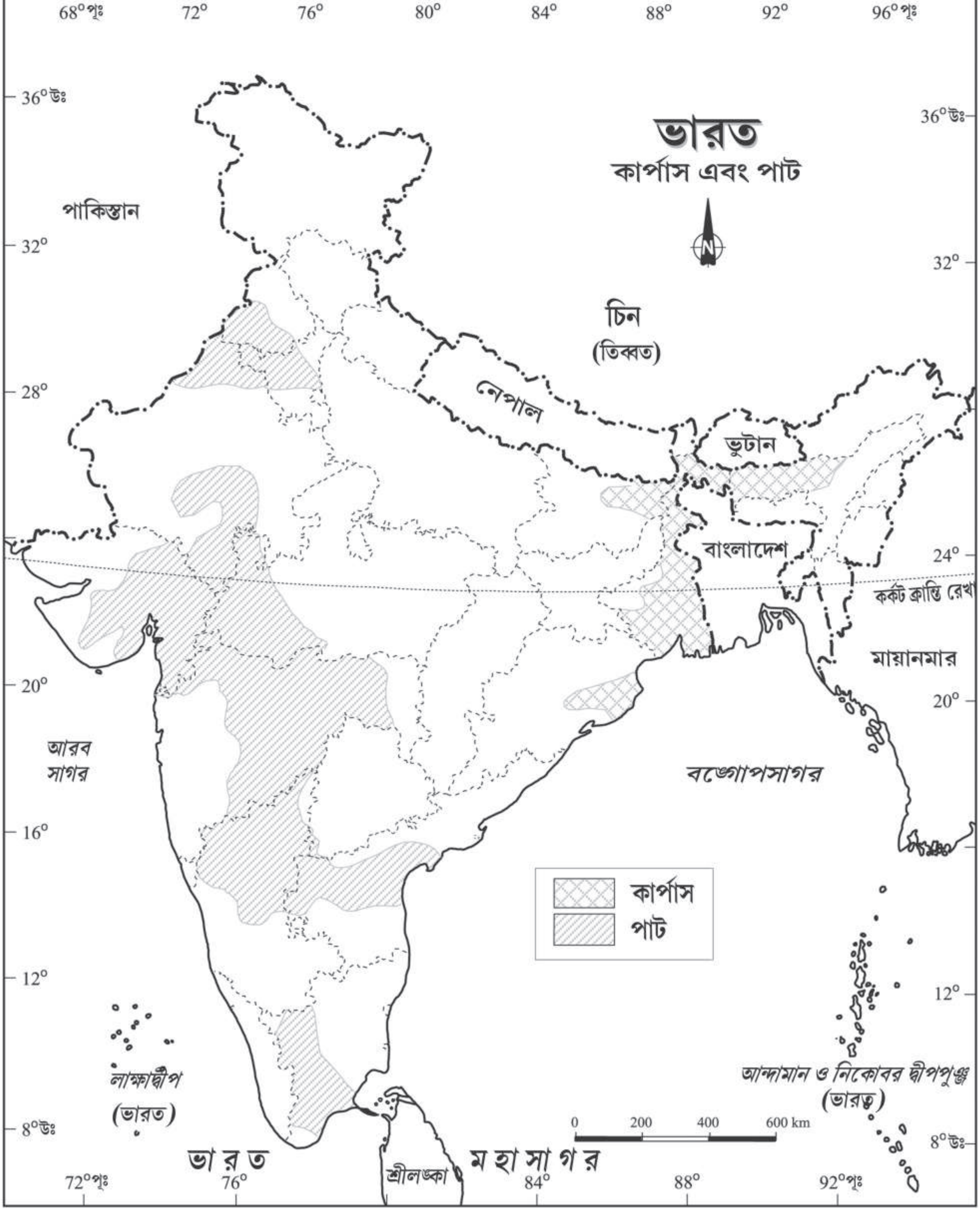

চিত্র 5.6 : ভারত—কার্পাস ও পাটের বণ্টন

90 শতাংশ উৎপাদন করে। সূর্যমুখীর চাষ কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ। দেশের উত্তরাংশে এটি গৌণ শস্য, কিন্তু জলসেচ ব্যবস্থার জন্য এটির উৎপাদন বেশি হয়।

তন্তু (Fibre Crops)

এই শস্যগুলো আমাদের কাপড়, থলি, বস্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরির জন্য তন্তু প্রদান করে। ভারতে উৎপাদিত দুটি প্রধান তন্তু শস্য হল তুলা ও পাট।

কার্পাস (Cotton)

কার্পাস বা তুলা একটি ক্রান্তীয় শস্য যা খারিফ মরশুমে দেশের নাতিশুষ্ক অঞ্চলে চাষ করা হয়। দেশ বিভাগের সময় বিশাল তুলা উৎপাদক অঞ্চল পাকিস্তানের অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও এর মোট জমির পরিমাণ গত পঞ্চাশ বছরে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত (ভারতীয়) কাপার্সের পাশাপাশি দীর্ঘ আঁশযুক্ত (আমেরিকান) যা দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে 'নারমা' নামে পরিচিত উভয় প্রকার কার্পাসই ভারতে চাষ করা হয়। কার্পাসের ফুল ফোটার সময় মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ প্রয়োজন।

চিত্র 5.7 : কার্পাস চাষ

ভারতে কার্পাস চাষের ক্ষেত্রে চিনের পরেই বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং বিশ্বের মোট উৎপাদিত কাপার্সের 23.7 শতাংশ ভারতে চাষ করা হয় (2014)। কাপার্স ভারতের মোট চাষযোগ্য জমির 4.7 শতাংশ জমিতে চাষ করা হয়। দেশে তুলা চাষের তিনটি অঞ্চল রয়েছে, যথা- উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, হরিয়ানার কিছু অংশ ও রাজস্থানের উত্তরাংশ, পশ্চিমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের মালভূমি, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু অবস্থিত। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং তেলেঙ্গানা হল এই শস্যের প্রধান উৎপাদক রাজ্য। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন সেচ ব্যবস্থার কারণে বেশি হয়। এর উৎপাদন মহারাষ্ট্রে খুব কম, যেখানে এটি বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে চাষ করা হয়।

পাট (Jute)

পাট মোটা কাপড়, থলি, বস্তা এবং সাজসজ্জার বস্তু তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশের পূর্বাংশের অঞ্চলগুলোতে অর্থকরী ফসল। দেশ বিভাগের সময় ভারতের একটি বিরাট পাট উৎপাদক অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) দখলে চলে যায়। বর্তমানে ভারত পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের তিন-পঞ্চমাংশ উৎপাদন করে। পশ্চিমবঙ্গে দেশের মোট উৎপাদিত পাটের তিন-চতুর্থাংশ উৎপাদিত হয়। বিহার ও আসাম হল অন্যান্য পাট উৎপাদক অঞ্চল। দেশের মোট শস্যযোগ্য এলাকার মাত্র 0.5 শতাংশ জমিতে পাট চাষ করা হয় কারণ এটি শুধুমাত্র কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ।

অন্যান্য ফসল (Other Crops)

আখ, চা এবং কফি হল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল যা ভারতে চাষ করা হয়।

আখ (Sugarcane)

আখ ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায়, এটি নাতি-আর্দ্র ও আর্দ্র জলবায়ুতে চাষ করা হয়। কিন্তু ভারতে এই ফসলটি মূলত জলসেচ সেবিত ফসল। ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমিতে, আখের চাষ প্রধানত উত্তরপ্রদেশেই কেন্দ্রিভূত। পশ্চিম ভারতের আখ উৎপাদন অঞ্চলগুলো সমগ্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ছড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এটি কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জলসেচ

চিত্র 5.8 : আখ চাষ

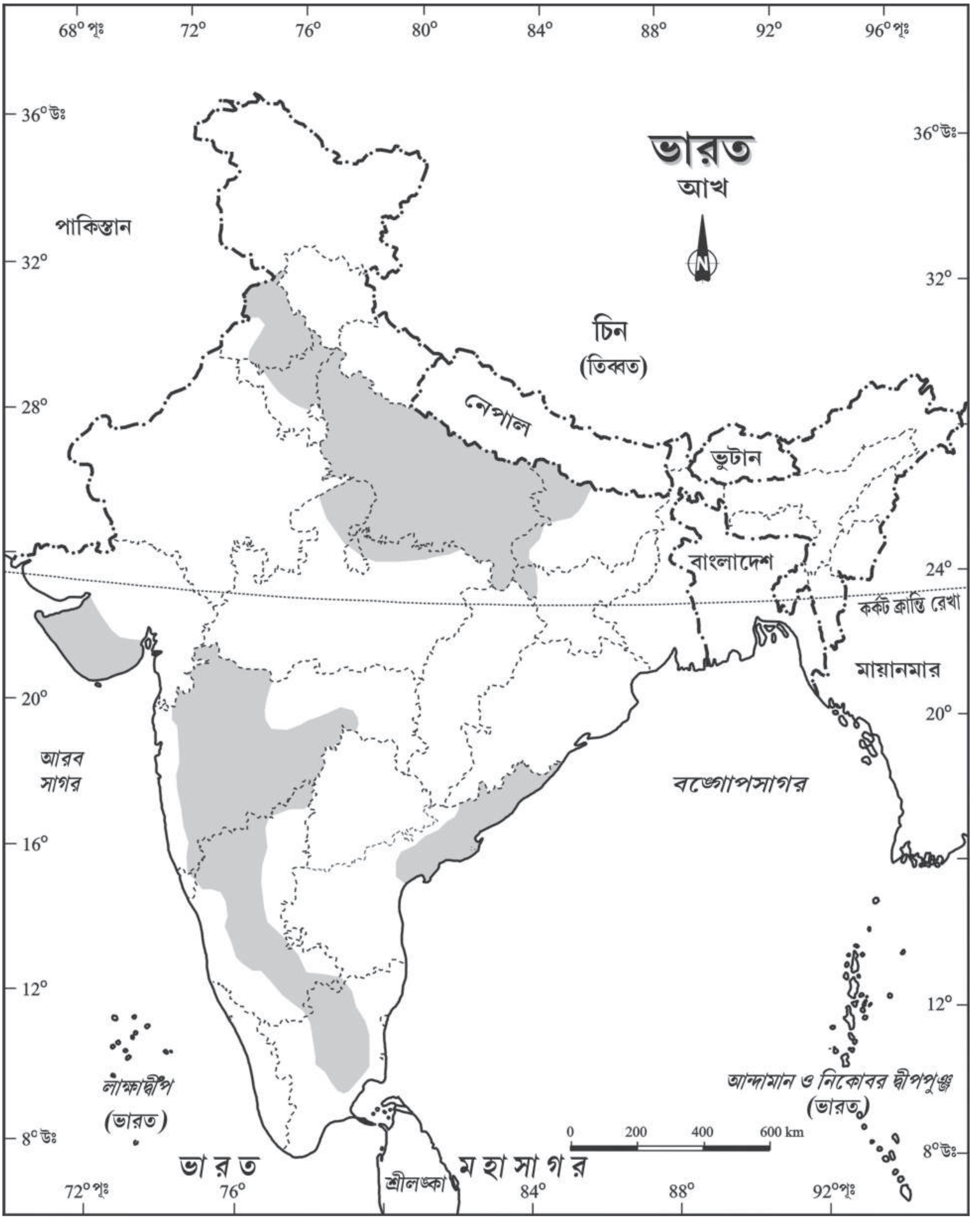

চিত্র 5.9 : ভারত—আখের বণ্টন

সেবিত অঞ্চলে চাষ করা হয়।

2014 সালে ব্রাজিলের পর ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম আখ উৎপাদক দেশ ছিল। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত আখের 19 শতাংশ ভারতে উৎপাদিত হয়। এই দেশের মোট চাষযোগ্য জমির 2.4 শতাংশ আখ চাষের অন্তর্গত। উত্তরপ্রদেশ দেশের মোট উৎপাদিত আখের দুই-পঞ্চমাংশ উৎপাদন করে থাকে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই ফসলের অন্যান্য প্রধান উৎপাদক রাজ্য যেখানে আখের উৎপাদন বেশি। এর উৎপাদন উত্তর ভারতে কম। ।

চা (Tea)

চা একটি বাগিচা ফসল যা পানীয় রূপে ব্যবহার করা হয়। কালো চা পাতাগুলো গাঁজানো হয় পক্ষান্তরে সবুজ চা পাতা গাঁজানা হয় না। চা পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন ও ট্যানিন পাওয়া যায়। এটি উত্তর চিনের পাহাড়ি অঞ্চলের একটি স্থানীয় ফসল। এটি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের আর্দ্র ও নাতি-আর্দ্র জলবায়ুতে পাহাড়ের তরাঙ্গায়িত ভূমিতে উত্তম জল নিকাশী (well-drained) ব্যবস্থাযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপাদিত হয়। ভারতে চা চাষ শুরু হয় 1840 এর দশকে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, যা এখনও দেশের একটি প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল। পরবর্তী সময়, এই চা চাষ পশ্চিমবঙ্গের অব-হিমালয় অঞ্চলে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায়) শুরু হয়েছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতের নীলগিরি ও কার্জমম পাহাড়ের নিম্নঢালেও চা চাষ করা হয়। চা উৎপাদনের ভারত অন্যতম উৎপাদক দেশ এবং

চিত্র 5.10 : চা চাষ

সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদিত চায়ের ২৪ শতাংশ এই দেশে উৎপাদিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা যথেষ্ঠ পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। 2014 সালে বিশ্বে চা রপ্তানীতে চিনের পর ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আসামের মোট চাষযোগ্য জমির 53.2 শতাংশ জমিতে চা চাষ করা হয় এবং দেশের মোট চা উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি এখানে হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু হল অন্যান্য প্রধান চা উৎপাদক রাজ্য।

কফি (Coffee)

কফি একটি ক্রান্তীয় বাগিচা ফসল। এর বীজগুলো সেঁকা, গুড়ো করা হয় এবং পানীয় প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের কফি রয়েছে- যেমন— অ্যারাবিকা, রোবুস্তা এবং লিবেরিকা। ভারতে সাধারণত উত্তম গুণমান সম্পন্ন অ্যারাবিকা কফি চাষ করা হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে। ভারতে বিশ্বের মোট উৎপাদনের শুধুমাত্র 3.7 শতাংশ কফি চাষ করা হয় এবং 2014 সালে কফি উৎপাদনে ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, কলোম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ইথিওপিয়ার পর ভারত ষষ্ঠস্থান অধিকার করে। কফি কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চভূমিতে চাষ করা হয়। কর্ণাটক একাই দেশের মোট কফি উৎপাদনের দুই -তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে থাকে।

ভারতীয় কৃষির উন্নয়ন (Agricultural Development in India)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। 2001 সালের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার 53 শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতে কৃষি ক্ষেত্রের গুরুত্ব কতটা তা এই তথ্যটি থেকেই অনুমান করা যায় যে, দেশের 53 শতাংশ ভূমি ফসল উৎপাদনের জন্য উৎসর্গীকৃত যেখানে পৃথিবীতে এর পরিমাণ মাত্র 12 শতাংশ। তা সত্ত্বেও ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে প্রচন্ড চাপ রয়েছে যা এই তথ্য থেকে প্রতিফলিত হয় যে দেশের মানুষ-জমি অনুপাত মাত্র 0.31 হেক্টর যা বিশ্বের মোট মানুষ-জমির অনুপাতের অর্ধেক (0.59 হেক্টর) বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় কৃষি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বহুদূর এগিয়েছে।

উন্নয়ন কৌশল (Strategy of Development)

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি মূলত জীবিকা সত্তাভিত্তিক ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে এর কর্মদক্ষতা হতাশাজনক ছিল। এই সময়কালে তীব্র খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতের এক তৃতীয়াংশ সেচসেবিত ভূমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত সেচসেবিত ভূমির পরিমাণ হ্রাস করে। স্বাধীনতার পর সরকারের তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্য

চিত্র 5.11 : ভারত— চা ও কফির বণ্টন

উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর উদ্দেশ্য (i) অর্থকরী ফসল থেকে খাদ্য শস্য চাষের দিকে অগ্রসর হওয়া। (ii) চাষ হচ্ছে এমন জমিতে শস্য চাষের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা এবং (iii) চাষযোগ্য এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। প্রাথমিক ভাবে, এই কৌশল খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু 1950 এর দশকের শেষ দিকে কৃষি উৎপাদন স্থির হয়ে পড়ে। এই সমস্যা দূর করার জন্য নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি (Intensive Agricultural District Programme (IADP) এবং নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি (Intensive Agricultural Area Programme) গৃহীত হয়। কিন্তু 1960 এর দশকের মধ্যভাগে পর পর দুটো খরা সংগঠিত হওয়ার পর দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। যার ফলে, অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়েছিল।

গম (মেক্সিকো) এবং ধান (ফিলিপিনস্) এর নতুন বীজের বৈচিত্র্য যা উচ্চ ফলনশীল বৈচিত্রতা সম্পন্ন (high yielding varieties/HYVs) বীজ 1960 এর দশকে চাষের জন্য সহজলভ্য ছিল। ভারত এই উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করেছিল এবং সেচসেবিত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটে একটি প্যাকেজ প্রযুক্তি চালু করে যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজ, পাশাপাশি রয়েছে রাসায়নিক সার। সেচের মাধ্যমে মৃত্তিকার আর্দ্রতা বজায় রাখা এই নতুন কৃষি প্রযুক্তির একটি প্রাথমিক শর্ত। এই পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়নের ফলে লভ্যাংশ খুব দ্রুত পাওয়া যায় এবং খাদ্য শস্যের উৎপাদনও খুব দ্রুত হয়। কৃষিক্ষেত্রে এই দ্রুত উন্নয়ন **'সবুজ বিপ্লব'** নামে পরিচিত। ইহা বিশাল সংখ্যা কৃষি নিবেশ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প সমূহের উন্নয়নে প্রেরণা যুগিয়েছেন। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই কৌশলটি দেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু 'সবুজ বিপ্লব' শুরুর দিকে সেচ সেবিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা 1970 এর দশক পর্যন্ত দেশের কৃষিক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ ছিল, পরবর্তীকালে এই কৌশল দেশের পূর্ব এবং মধ্যাংশে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন 1980 এর দশকে বৃষ্টিবহুল এলাকার সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেয়। এর ফলস্বরূপ 1988 সালে কৃষি-জলবায়ু পরিকল্পনার জন্ম হয়, যা দেশের আঞ্চলিক ভারসাম্যযুক্ত কৃষি উন্নয়ন প্রবর্তন করে। ইহা কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্রতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং দুগ্ধ কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন, উদ্যান পালন, পশুপালন এবং জলজ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের বিকাশের দিকে জোর দেয়।

1990 এর দশকের উদারীকরণ নীতি এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রচলন ভারতীয় কৃষির উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নের অভাব, ভর্তুকি এবং মূল্য সমর্থন প্রত্যাহার করা এবং গ্রামীন ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্তরায় গ্রামীণ অঞ্চলে আন্তঃ আঞ্চলিক এবং আন্তঃব্যক্তিক অসমতা সৃষ্টি করতে পারে।

কৃষি উৎপাদনের বিকাশ এবং প্রযুক্তি (Growth of Agricultural Output and Technology)

কৃষি উৎপাদন এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল।

- অধিকাংশ ফসল যেমন ধান এবং গমের বপনকৃত ফসল এবং উৎপাদিত ফসলের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছিল। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আখ, তৈলবীজ এবং তুলার উৎপাদন লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 2011 সালে ডাল এবং পাট উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারত ধান, গম চিনাবাদাম, আখ এবং শাকসব্জীর দ্বিতীয় প্রধান উৎপাদক।
- সেচের সম্প্রসারণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি জটিল ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা পরবর্তী সময়ের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ভিত্তি প্রদান করে, যেমন— উচ্চফলনশীল বীজের বৈচিত্র্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং খামার যন্ত্রপাতি। 1950-51 থেকে 2000-01 সাল সময়কাল পর্যন্ত মোট সেচসেবিত এলাকা 20.85 মিলিয়ন হেক্টর থেকে 54.66 মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছায়। এই পঞ্চাশ বছরের সময়কালে, একাধিকবার সেচ ব্যবহার হয়েছে এমন অঞ্চল 1.71 থেকে 20.46 মিলিয়ন হেক্টর হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার পনের গুণ বেড়েছে। 2001-02 সালে, ভারতে হেক্টর প্রতি রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিল 91 kg, যা বিশ্বে গড় রাসায়নিক সার ব্যবহারের (90 kg) সমান। কিন্তু, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাসায়নিক সারের ব্যবহার

জাতীয় গড় থেকে চারগুণ বেশি। যেহেতু, উচ্চফলনশীল বীজগুলো খুব সহজেই পোকামাকড় ও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার ফলে কীটনাশকের ব্যবহার 1960 এর দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

চিত্র 5.12 : রটো টিল ড্রিল- একটি আধুনিক কৃষি

ভারতীয় কৃষির সমস্যাসমূহ (Problems of Indian Agriculture)

ভারতীয় কৃষির সমস্যার প্রকৃতি কৃষি-বাস্তুসংস্থানিক এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। অতএব, বেশিরভাগ কৃষি সমস্যাগুলো আঞ্চলিক। তাসত্ত্বেও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যা সার্বজনীন এবং তাতে প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় সবই উপস্থিত রয়েছে। এসকল সমস্যার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

অনিশ্চিত মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীলতা (Dependence on Erratic Monsoon)

ভারতের মোট চাষ হওয়া জমির মাত্র 33 শতাংশ জমি সেচসেবিত। বাকী জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অনিয়মিত আসা যাওয়ার ফলে খালগুলোতে সেচের জলের সরবরাহে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, রাজস্থান ও অন্যান্য খরা কবলিত অঞ্চলেও বৃষ্টিপাত খুবই নগণ্য এবং অত্যাধিক অনির্ভরযোগ্য। এমনকি যেসব অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি সেখানেও বৃষ্টিপাতের অস্থিরতা দেখা যায়। এমন অবস্থায় এই অঞ্চলসমূহের বন্যা ও খরার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হল খরা, যা আবার মাঝে মাঝে বন্যার কবলে পড়ে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলে 2006 সালে এবং 2017 সালের হড়কা বান হল এসকল ঘটনার উদাহরণ। ভারতীয় কৃষিতে খরা এবং বন্যা যমজ সংকট রূপে বিরাজ করছে।

নিম্ন উৎপাদনশীলতা (Low productivity)

আন্তর্জাতিক স্তরের তুলনায় ভারতে শস্যের উৎপাদন কম। ধান, গম, তুলা এবং তৈলবীজের মত অধিকাংশ শস্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ভারতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং জাপানের তুলনায় অনেক কম। ভূ-সম্পদের উপর অত্যাধিক চাপ থাকার কারণে, ভারতে শ্রমিক প্রতি উৎপাদন আন্তর্জাতিক স্তরের থেকে অনেক কম। দেশের বিস্তৃত বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চল, প্রধানত শুষ্ক অঞ্চল যেখানে মূলত মোটা দানাশস্য উৎপাদিত হয়, ডাল এবং তৈলবীজের উৎপাদন খুবই কম।

কেন শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিজ উৎপাদন কম?

অর্থনৈতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং ঋণগ্রস্থতা (Constraints of Financial Resources and Indebtedness)

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষি ক্ষেত্রের ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশি। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কৃষির সম্পদ নিবিড় দৃষ্টিভঙ্গি (Resource Intensive Approach) নিয়ন্ত্রণাতীত কারণ তাদের কৃষিতে বিনিয়োগ করার মতো খুব সামান্য বা একেবারে নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় এ ধরনের কৃষকদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ফলসহানি এবং কৃষিক্ষেত্রে কম লাভ কৃষকদের ঋণের চক্রে ফাঁসিয়ে দেয়।

অত্যাধিক ঋণগ্রস্থতার তাৎপর্য কী? তুমি কি মনে করো আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার ঘটনা ঋণগ্রস্থতার কারণে ঘটেছে?

ভূমি সংস্কারের অভাব (Lack of Land Reforms)

ভূমির অসম বন্টনের ফলে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় দীর্ঘসময় ধরে শোষিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রচলিত তিন ধরনের কর ব্যবস্থা যথা— মহলওয়াড়ী, রায়তওয়াড়ী এবং জমিদারী, এদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যবস্থাটি কৃষকদের জন্য সর্বাধিক শোষণমূলক ছিল। স্বাধীনতার পর, ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব ছিল, কিন্তু এই সংস্কারগুলো দৃঢ় রাজনৈতিক

ইচ্ছার অভাব থাকার ফলে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। বেশিরভাগ রাজ্যের সরকার রাজনৈতিকভাবে কঠিন সিদ্ধান্ত যা তাদের রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যেতে পারে, তা নেওয়াটা এড়িয়ে গেছে। ভূমি সংস্কার প্রয়োগের অভাব থাকায় কৃষিজমির অসম বন্টন চলতে থাকে যা কৃষির উন্নয়নের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

জোতের ক্ষুদ্র আকার এবং দ্বিখণ্ডিত জোত (Small Farm Size and Fragmentation of Landholdings)

দেশে বিশাল সংখ্যক প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছে। এদের মধ্যে 60 শতাংশ মালিকানাধীন কৃষি জমির আকার এক হেক্টরের কম। অধিকন্তু, 40 শতাংশ কৃষকের চাষযোগ্য জমির আকার 0.5 হেক্টরের কম। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমির আকার হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া, ভারতের অধিকাংশ জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। এমন কিছু রাজ্য রয়েছে যেখানে জমির একত্রীকরণ একবারও হয়নি। এমনকি যেসব রাজ্যে একবার একত্রিকরণ করা হয়েছে সেখানেও দ্বিতীয় পর্যায়ে একত্রিকরণের প্রয়োজন কারণ জোতগুলো মালিকানার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য বিখণ্ডিত হয়েছে। ক্ষুদ্র আকৃতির খণ্ড বিখণ্ড জোতসমুহ মূলত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়।

বাণিজ্যিকিকরণের অভাব (Lack of Commercialisation)

অধিকাংশ কৃষকগণ নিজস্ব ব্যবহারের জন্য শস্য উৎপাদন করে। এসকল কৃষকের প্রয়োজনীয়তার অধিক উৎপাদন করতে পর্যাপ্ত ভূ-সম্পদ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য

কৃষি এবং চাষাবাদ পদ্ধতির মধ্যে তোমরা কী পার্থক্য লক্ষ করেছ? শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

উৎপাদন করে যা তাদের নিজ পরিবারের চাহিদা মেটায়। যদিও সেচযুক্ত এলাকায় কৃষির আধুনিকীকরণ এবং বাণিজ্যিকিকরণ হচ্ছে।

সুবিশাল বেকারত্ব (Vast Underemployment)

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত সেচবিহীন বিশাল পরিমাণে বেকারত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এসকল এলাকায় ঋতুকালীন বেকারত্ব লক্ষ করা যায় যা 4 থেকে 8 মাস পর্যন্ত থাকে। কৃষিজাত কার্যকলাপ শ্রমনিবিড় নয় বলে শস্যকালীন ঋতুতেও বর্ষব্যাপী কাজ পাওয়া যায় না। একারণে, কৃষিতে যুক্ত মানুষের সারাবছর ব্যাপী কাজ করার সুযোগ হয়ে উঠে না।

চাষযোগ্য জমির অবক্ষয় (Degradation of Cultivable Land)

সেচ ও কৃষিজ বিকাশের ত্রুটিপূর্ণ কৌশলের ফলে উদ্ভুত গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি হল ভূ-অবক্ষয়। এটি সংকটজনক, কারণ এটি মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস করতে পারে। বিশেষত সেচযুক্ত অঞ্চলে এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। মৃত্তিকায় ক্ষারকীয়তা ও লবণাক্ততা এবং জলমগ্নতার কারণে কৃষিজ জমির এক বিশাল অংশ উর্বরতা হারিয়েছে। ক্ষারকীয়তা এবং লবণাক্ততার দরুণ ইতোমধ্যেই 8 মিলিয়ন হেক্টর জমি প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। জলমগ্নতার কারণে দেশের আরও 7 মিলিয়ন হেক্টর জমি এর উর্বরতা হারিয়েছে। কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের অত্যাধিক ব্যবহার মৃত্তিকা পরিলেখতে বিষাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। সেচযুক্ত অঞ্চলে শিম্বিগোত্রীয় ফসলগুলো শস্য উৎপাদনের ধরন থেকে অপসারিত হয়েছে এবং বহুফসলী শস্য চাষের কারণে পতিত জমির পরিমাণ যথেষ্ঠ হ্রাস পেয়েছে। এটি প্রাকৃতিক উর্বরতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যথা নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণকে নস্ট করে দিয়েছে। ক্রান্তীয় জলবায়ুর আর্দ্র ও শুষ্কপ্রায় বর্ষানির্ভর অঞ্চলগুলোও বিভিন্ন প্রকার অবক্ষয়ের সম্মুখীন যথা জল দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় এবং বায়ু দ্বারা ক্ষয় যা প্রায়শই মানুষের কার্যাবলি দ্বারা প্রণোদিত হয়।

কাজ

তোমাদের নিজ অঞ্চলের কৃষিজ সমস্যার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। এগুলোর সাথে এই অধ্যায়ে আলোচিত সমস্যাগুলোর কতটুকু সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যতা রয়েছে?

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ

(i) নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি ভূমি ব্যবহারের প্রকার নয় ?

(a) পতিত ভূমি
(b) প্রান্তিক ভূমি
(c) মোট কৃষিজ ভূমি
(d) চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমি

(ii) বিগত 40 (চল্লিশ) বছরে বনভূমির অনুপাত বৃদ্ধির জন্য নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি প্রধান কারণ ?

(a) বনায়নের বিস্তৃতি এবং সুদক্ষ প্রচেস্টা
(b) সামাজিক বনায়নের অধীন অঞ্চলের বৃদ্ধি
(c) বনভূমির বৃদ্ধির জন্য বরাদ্ধকৃত অঞ্চলের বৃদ্ধি
(d) বনভূমির পরিচালনায় জনগনের আরও ভালোভাবে অংশ গ্রহণ।

(iii) নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি সেচযুক্ত অঞ্চলের অবক্ষয়ের প্রধান কারণ?

(a) নালা ক্ষয়
(b) বায়ু দ্বারা ক্ষয়
(c) মৃত্তিকায় লবনাক্ততা
(d) পলিযুক্ত জমি

(iv) নীচের কোন্ ফসলটি শুষ্ক ভূমির কৃষিতে চাষ করা হয়?

(a) রাগী (c) চিনাবাদাম

(b) জোয়ার (d) আখ বা ইক্ষু

(v) নীচের কোন্ দেশের জোড়ায় গম এবং ধানের বিভিন্ন প্রকারের উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ করা হয়েছিল ?

(a) জাপান ও অস্ট্রেলিয়া (c) মেক্সিকো ও ফিলিপাইন

(b) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান (d) মেক্সিকো ও সিংগাপুর

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

(i) অনুর্বর ও পরিত্যক্ত জমি এবং চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমির মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করো।

(ii) প্রকৃত কৃষিজ ভূমি ও মোট কৃষিজ ভূমির মধ্যে তোমরা পার্থক্য কিভাবে নিরূপণ করবে?

(iii) ভারতের মতো দেশে শস্য প্রগাঢ়তার বৃদ্ধির কৌশল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(iv) তোমরা কীভাবে মোট চাষযোগ্য ভূমির পরিমাপ করবে?

(v) শুষ্ক ভূমি কৃষি ও আদ্র ভূমি কৃষির মধ্যেকার পার্থক্য কী?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ

(i) ভারতের ভূ-সম্পদের বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত সমস্যাগুলো কী কী?

(ii) ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে অনুসৃত কৃষি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি কী কী?

একক III

অধ্যায় 6

জল সম্পদ
(WATER RESOURCES)

তোমরা কি কখনও ভেবেছ যে, যা কিছু বর্তমানে রয়েছে, তা একই থাকবে অথবা ভবিষ্যতে কিছু ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হতে পারে? এটা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে সমাজ জনবিবর্তন, জনসংখ্যার ভৌগোলিক স্থানান্তর, প্রযুক্তিগত উন্নতি, পরিবেশের অবনমন, জলের অভাবের সাক্ষী থাকবে। চাহিদার বৃদ্ধির সাথে অত্যধিক ব্যবহার ও দূষণের কারণে জলের যোগান কম হওয়ায় জলের অভাব সম্ভবত সব থেকে বড়ো সমস্যা। জল একটি আবর্তনশীল সম্পদ যার বিশ্বে প্রচুর যোগান রয়েছে। প্রায় 71 শতাংশ পৃথিবী পৃষ্ঠ এর দ্বারা আবৃত কিন্তু মোট জলভাগের 3 শতাংশ স্বাদুজল রয়েছে। এমনকি স্বাদুজলের খুব কম অংশই মানুষের ব্যবহারের জন্য কার্যকরীভাবে সহজলভ্য। স্বাদুজলের সহজলভ্যতা স্থান ও সময় ভেদে বিভিন্ন। এই দুর্লভ সম্পদের ভাগীদারি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপা উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব জাতি, অঞ্চল ও রাজ্যের মধ্যে বিবাদের বিষয় হয়ে গেছে। উন্নতিকে সুনিশ্চিত করতে জলের মূল্যায়ন, কার্যকর ব্যবহার এবং জলের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের জলসম্পদ, এর ভৌগোলিক বন্টন, ক্ষেত্রগত ব্যবহার এবং সংরক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভারতের জলসম্পদ (Water Resources of India)

ভারত পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় 2.45 শতাংশ, বিশ্বের জলসম্পদের প্রায় 4 শতাংশ, এবং বিশ্বের প্রায় 16 শতাংশ জনসংখ্যা অধিকার করে রয়েছে। দেশে প্রতিবছর অধঃক্ষেপন থেকে প্রাপ্ত জলের পরিমাণ প্রায় 4000 কিউবিক কিমি। ভূপৃষ্ঠস্থ জলের প্রাপ্যতা এবং পুনঃপূরণশীল ভৌমজলের পরিমাণ 1,869 কিউবিক কিমি। এর মধ্যে শুধুমাত্র 60 শতাংশ ব্যবহারযোগ্য। অতএব দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ মাত্র 1,122 কিউবিক কিমি।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ (Surface Water Resources)

ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের চারটি উৎস। এগুলো হল নদী, হ্রদ, পুকুর এবং জলাধার। দেশে প্রায় 10,360 টি নদী এবং উপনদী আছে যাদের প্রত্যেকটি 1.6 কিমি দীর্ঘ। ভারতে সমস্ত নদী অববাহিকার গড় বার্ষিক প্রবাহ আনুমানিক 1869 কিউবিক কিমি। যা হোক ভূ-প্রকৃতিগত, জলসংক্রান্ত এবং অন্যান্য বাধার কারণে শুধুমাত্র প্রায় 690 কিউবিক

কিমি. (32 শতাংশ) প্রাপ্ত ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল ব্যবহৃত হয়। নদীর জলপ্রবাহ নির্ভর করে ধারক অববাহিকা (catchment area) অথবা নদী অববাহিকার আকারের ওপর এবং ধারক অববাহিকার বৃষ্টিপাতের ওপর। তোমরা একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই 'ভারতঃ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল' এ পড়েছ যে, ভারতে অধঃক্ষেপন স্থানভেদে বিভিন্ন এবং তা প্রধানতঃ মৌসুমি ঋতুতে হয়ে থাকে। তোমরা পাঠ্যবই এ আরও পড়েছে যে দেশের কিছু নদী যেমন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধুর বৃহৎ নদী ধারক অববাহিকা রয়েছে। এমনকি অধঃক্ষেপন (precipitation) গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদী আহরণক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি। এই নদীগুলো যদিও দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, নদীগুলো প্রায় 60 শতাংশ সামগ্রিক ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ ধারণ করে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো যেমন গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী নদীগুলোর বার্ষিক জলপ্রবাহ কাজে লাগানো হয়, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার অববাহিকাগুলোতে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ভৌমজলসম্পদ (Groundwater Resources)

দেশের মোট পুনঃপূরণশীল ভৌমজলসম্পদ প্রায় 432 কিউবিক কিমি। সারণি 6.1 এ দেখা যাচ্ছে যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রায় 46 শতাংশ পুনঃপূরণশীল ভৌমজল সম্পদ রয়েছে। ভৌমজলের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থিত নদী অববাহিকায় অপেক্ষাকৃত বেশি।

ভৌমজলের ব্যবহার পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে সবথেকে বেশি। যাই হোক, ছত্রিশগড়, ওড়িশা, কেরালা প্রভৃতি রাজ্য স্বল্প অনুপাতে তাদের সম্ভাব্য ভৌমজল ব্যবহার করে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ত্রিপুরা এবং মহারাষ্ট্র তাদের ভৌমজলসম্পদ পরিমিত হারে ব্যবহার করে। যদি বর্তমান ধারা চলতে থাকে তবে জলের চাহিদা মেটানোর জন্য যোগানের প্রয়োজন

সারণি 6.1: ভারতে অববাহিকার ভিত্তিতে ভৌমজলের সম্ভাবনা ও ব্যবহার (কিউবিক কিমি:/ বছর)

ক্র: নং	অববাহিকার ভৌমজল সম্পদের নাম	মোট পুনঃপূরণশীল জলের ব্যবহার (%)	ভৌমজল স্তর
1.	ব্রাহ্মণীর সাথে বৈতরণী	4.05	8.45
2.	ব্রহ্মপুত্র	26.55	3.37
3.	চম্বল ও তার সংযুক্ত নদী	7.19	40.09
4.	কাবেরী	12.3	55.33
5.	গঙ্গা	170.99	33.52
6.	গোদাবরী	40.65	19.53
7.	সিন্ধু	26.49	77.71
8.	কৃষ্ণা	26.41	30.39
9.	লুনি নদী সহ কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র	11.23	51.14
10.	চেন্নাই এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ু	18.22	57.68
11.	মহানদী	16.46	6.95
12.	মেঘনা (বরাক এবং অন্যান্য)	8.52	3.94
13.	নর্মদা	10.83	21.74
14.	উত্তর-পূর্বের সংযুক্ত নদী	18.84	17.2
15.	পেন্নার	4.93	36.6
16.	সুবর্ণরেখা	1.82	9.57
17.	তাপ্তী	8.27	33.05
18.	পশ্চিমঘাট	17.69	22.88
	মোট	**431.42**	**31.97**

উৎস: *Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi; http://wrmin.nic.in/resource/gwresource1.htm*

চিত্র 6.1 : ভারত—নদী অববাহিকা

হবে এবং এরূপ অবস্থা উন্নতির জন্য ক্ষতিকারক হবে এবং সামাজিক বিপর্যয় ও ভাঙ্গানের কারণ হতে পারে।

সারণি 6.1 এর ওপর ভিত্তি করে অনুশীলনী

1. কোন্ নদী অববাহিকায় মোট সর্বোচ্চ পুনঃপূরণশীল ভৌমজল সম্পদ রয়েছে?
2. কোন্ নদী অববাহিকার ভৌমজল সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়?
3. কোন্ নদী অববাহিকায় মোট সর্বনিম্ন পুনঃপূরণশীল ভৌমজলসম্পদ রয়েছে?
4. কোন্ নদী অববাহিকার ভৌমজল সবথেকে কম ব্যবহৃত হয় ?
5. 10টি প্রধান নদী অববাহিকার পুনঃপূরনশীল ভৌমজলসম্পদের একটি স্তম্ভচিত্র অংকন করো।
6. সেই ১০টি নদী অববাহিকার ভৌমজল স্তরের ব্যবহারের স্তম্ভচিত্র অংকন করো যে নদীগুলোকে নিয়ে আগের প্রশ্নের স্তম্ভচিত্রটি অংকন করেছ।

লেগুন বা উপহ্রদ এবং বেকওয়াটার (Lagoons and Backwaters)

ভারতে বিশাল উপকূলরেখা রয়েছে এবং কিছু রাজ্যের উপকূলরেখা খুবই খাঁজযুক্ত। এই কারণে প্রচুর সংখ্যক লেগুন ও উপহ্রদ গঠিত হয়েছে। কেরালা, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে লেগুন ও হ্রদে বিশাল পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ রয়েছে। যদিও সাধারণত এই সমস্ত জলাশয়ের জল নোনা, তা মৎস্যচাষ এবং নির্দিষ্ট প্রকারের ধান ও নারকেল প্রভৃতি চাষে জলসেচের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জলের চাহিদা ও ব্যবহার (Water Demand and Utilisation)

ভারত ঐতিহ্যগতভাবে একটি কৃষি অর্থনীতির দেশ এবং এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অতএব কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলসেচের উন্নতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বহুমুখী নদী পরিকল্পনা যেমন ভাকরা নাঙ্গাল, হিরাকুঁদ, দামোদর উপত্যকা, নাগার্জুন সাগর, ইন্দিরাগান্ধী খাল প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি ভারতে জলের চাহিদা বর্তমানে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

6.2 এবং 6.3 চিত্রে কৃষিতে বেশিরভাগ ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল এবং ভৌমজলের ব্যবহারের বিবরণ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের ব্যবহার 89 শতাংশ এবং ভৌমজলের ব্যবহার 92 শতাংশ।

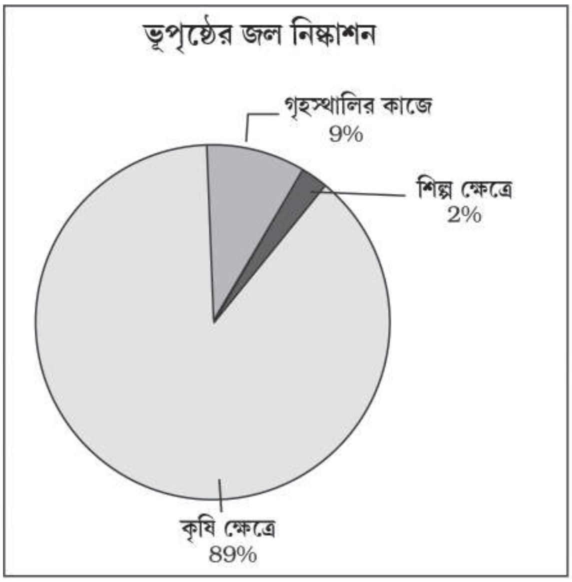

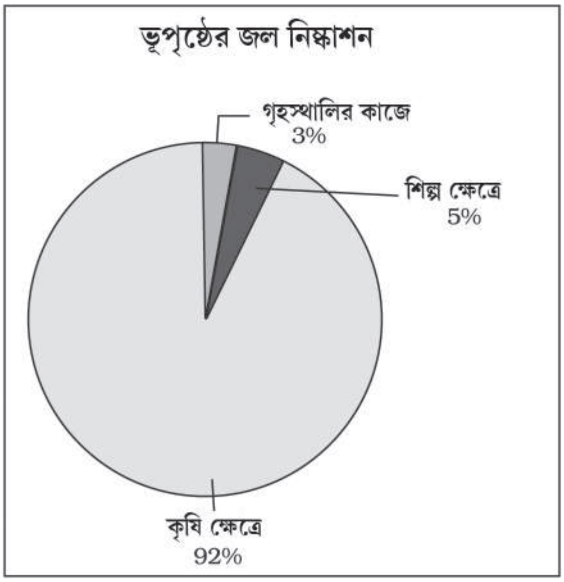

উৎস : *Earth Trend 2001, World Resource Institute, as given in Goverment of India (2002) Report*

চিত্র 6.2 : ভূপৃষ্ঠের জলের ক্ষেত্রগত ব্যবহার

চিত্র 6.3 : ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রগত ব্যবহার

যেখানে শিল্পক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের ব্যবহারের পরিমাণ সীমিত রয়েছে প্রায় 2 শতাংশ এবং ভৌমজলের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ 5 শতাংশ, গৃহস্থালির কাজে ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ব্যবহার ভৌমজলের তুলনায় খুবই বেশী (9 শতাংশ)। কৃষিক্ষেত্রে মোট জলের ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় খুবই বেশি। যাইহোক, ভবিষ্যতে উন্নতির সাথে সাথে দেশে শিল্প ও গৃহস্থালির ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে।

জলসেচের জন্য জলের চাহিদা (Demand of Water for Irrigation)

কৃষিকাজে জল প্রধানত জলসেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেশে বৃষ্টিপাতের স্থানিক ও সময়গত পরিবর্তনশীলতার জন্য জলসেচের প্রয়োজন। দেশের একটি বড় অঞ্চল স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত এবং খরাপ্রবণ। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এ ধরনের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দেশের বেশিরভাগ অংশে শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল কম-বেশি শুষ্ক ঋতুতে সুনিশ্চিত জলসেচ ছাড়া কৃষিকাজ করা কঠিন। এমনকি অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে মৌসুমি বিরতি এবং এর ব্যর্থতা শুষ্ক পরিস্থিতি তৈরি করে যা কৃষির জন্য ক্ষতিকারক। নির্দিষ্ট শস্যের জন্য জলের চাহিদাও জলসেচের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ ধান, আখ, পাট প্রভৃতির জন্য উচ্চমাত্রায় জলের প্রয়োজন যা শুধুমাত্র জলসেচের দ্বারাই সম্ভব।

জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা বহুফসলি চাষ সম্ভব। এমনকি দেখা গেছে যে, সেচবিহীন জমির তুলনায় সেচযুক্ত জমিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা অধিক। এছাড়াও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন শস্যের নিয়মিত আর্দ্রতার প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র উন্নত জলসেচ পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব। এমনকি, এই কারণে দেশে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে কৃষির উন্নতির জন্য সবুজ বিপ্লব কৌশল বিশাল সাফল্য অর্জন করেছিল।

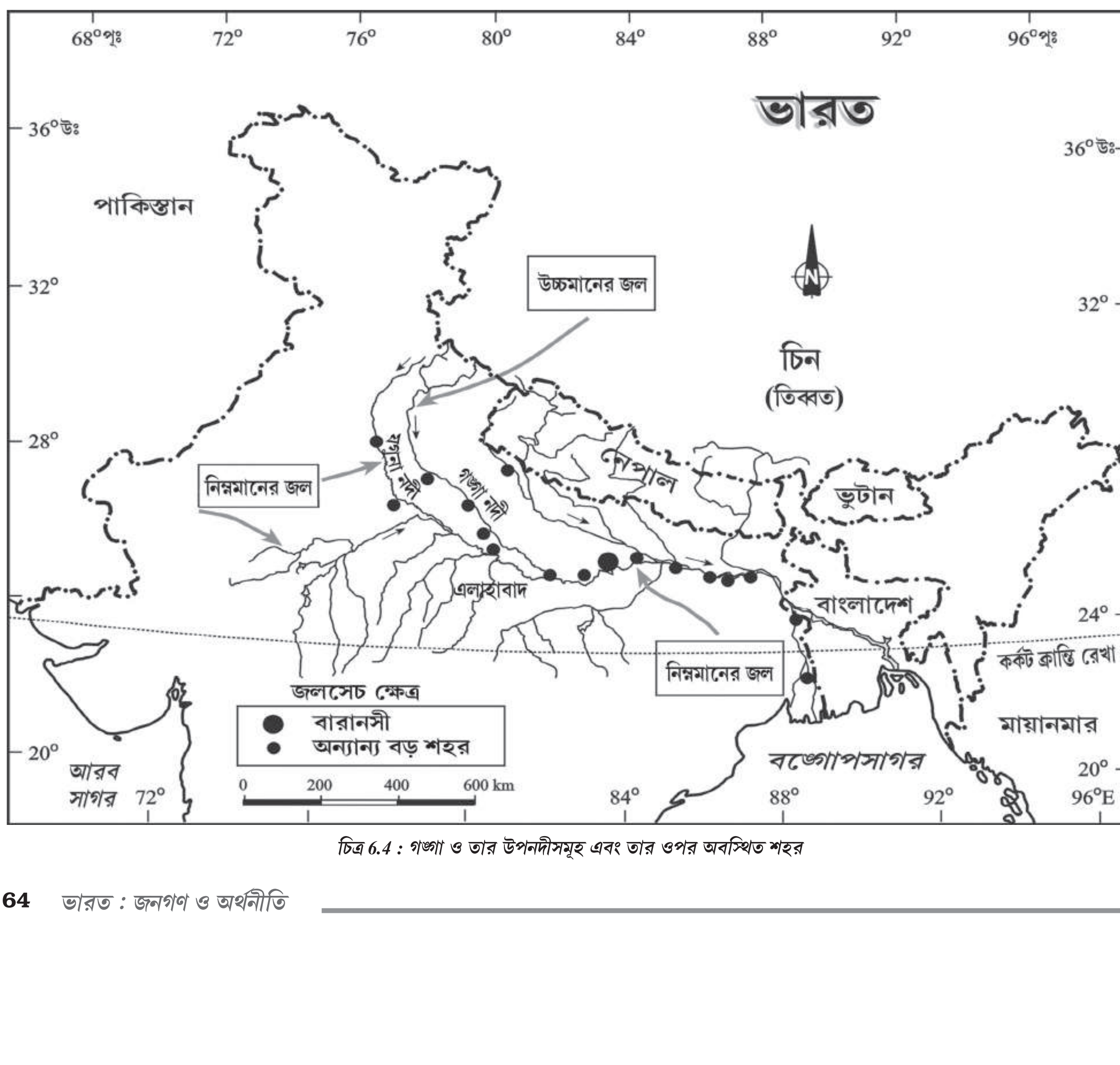

চিত্র 6.4 : গঙ্গা ও তার উপনদীসমূহ এবং তার ওপর অবস্থিত শহর

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে 85 শতাংশের বেশি চাষযোগ্য জমি জলসেচের আওতায় রয়েছে। এ সমস্ত রাজ্যগুলোতে গম এবং ধান প্রধানত জলসেচের সাহায্যে উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাবে মোট সেচসেবিত অঞ্চল 76.1 শতাংশ এবং হরিয়ানায় কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে সেচযুক্ত অঞ্চলের পরমিাণ 51.3 শতাংশ। তাই দেখা যায় যে এই রাজ্যগুলো তাদের ভূগর্ভস্থ জলের বৃহৎ অংশকে ব্যবহার করে যার ফলস্বরূপ এই রাজ্যগুলোতে ভূগর্ভস্থ জলের হ্রাস ঘটছে। যে রাজ্যগুলোতে কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে সেচযুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ খুবই বেশি তা সারণি 6.2 তে দেখানো হয়েছে।

সারণি 6.2: কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে মোট শতকরা সেচসেবিত অঞ্চলের পরিমাণ

রাজ্য	শতকরা হার
গুজরাট	86.6
রাজস্থান	77.2
মধ্যপ্রদেশ	66.5
মহারাষ্ট্র	65
উত্তরপ্রদেশ	58.21
পশ্চিমবঙ্গ	57.6
তামিলনাড়ু	54.7

উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে জলসেচের ধরন কীরূপ?

রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর খরা প্রবণ অঞ্চলে ভৌমজলের ব্যবহারের ফলে কীরূপ প্রভাব পড়েছে?

এ রাজ্যগুলোতে ভৌমজল সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস ঘটাচ্ছে। এমনকি কিছু রাজ্য যেমন রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে অত্যধিক ভৌমজলের ব্যবহার ভুগর্ভস্থ জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে এবং এর ব্যবহারের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়েছে।

কাজ

পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে নিবিড় জলসেচের দ্বারা মৃত্তিকায় লবণ তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জলসেচের জন্য ব্যবহৃত ভৌমজল নিঃশেষিত হচ্ছে। কৃষিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করো।

জলের সমস্যা বৃদ্ধি (Emerging Water Problems)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জলের সহজলভ্যতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। প্রাপ্য জলসম্পদ শিল্প, কৃষি এবং গার্হস্থ্য ব্যবহারের দ্বারা দূষিত হচ্ছে এবং এটি পরবর্তীকালে ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের সহজলভ্যতাকে আরও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

জলের গুণগতমান হ্রাস (Deterioration of Water Quality)

জলের গুণগতমান বলতে জলের বিশুদ্ধতাকে বোঝায় অথবা অনাবশ্যক বহিরাগত পদার্থ বিহীন জলকে বোঝায়। জল দূষিত হয় বহিরাগত পদার্থ যেমন অনুজীব, রাসায়নিক, শিল্পজাত এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দ্বারা। এই পদার্থগুলো জলের গুণগত মানকে হ্রাস করে যা মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী। যখন বিষাক্ত পদার্থগুলো হ্রদ, জলপ্রবাহ, নদী, সমুদ্র এবং অন্যান্য জলাশয়ে প্রবেশ করে তারা দ্রবীভূত হয়ে যায় বা ভাসমান অবস্থায় থাকে। ফলস্বরূপ জল দূষিত হয়, জলের গুণগত মান হ্রাস পাওয়ায় জলজ তন্ত্র (aquatic systems) প্রভাবিত হয়। মাঝে মাঝে এই দূষক পদার্থগুলো নিম্নে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করে। দেশে গঙ্গা ও যমুনা দুটি অত্যন্ত দূষিত নদী।

কাজ

গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলোর তীরে অবস্থিত প্রধান শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলোকে খুঁজে বের করো।

জলসংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা (Water Conservation and Management)

যেহেতু স্বাদুজলের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে এর সহজলভ্যতা হ্রাস পাচ্ছে তাই স্থিতিশীল (sustainable)উন্নয়নের জন্য এই মূল্যবান জীবনদায়ী সম্পদ সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপিত হয়েছে। সমুদ্র/মহাসাগর থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য জল লবণমুক্ত করার প্রক্রিয়া উচ্চ ব্যয়ের কারণে গুরুত্বহীন হিসাবে বিবেচিত হয়, ভারতকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কার্যকর নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংরক্ষণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও জলসাশ্রয়কারী উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির মাধ্যমে দূষণ রোধ করার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী জল সরবরাহ বজায় রাখার জন্য জলাশয়ের উন্নয়ন, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলের পুনরাবর্তন ও পুনর্ব্যবহার এবং জলের সমন্বিত ব্যবহারের ওপর উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন।

Rivers of conflict...but also of peace

Water has been known for centuries to be a major cause of tension and conflict—within countries, as well as among nations. Yet while its propensity to strain relations frequently makes headlines, the other side of the coin—water as an agent of cooperation—rarely gets sufficient attention.

With more than the 260 water basins in the world transcending national borders, it is hardly surprising that the situation is widely seen as being fodder for hostility.

Nevertheless, research has shown much more historical evidence of water as a catalyst for cooperation rather than a trigger of conflict. There are more than 3,800 unilateral, bilateral or multilateral declarations or conventions on water 286 are treaties, with 61 referring to over 200 international river basins.

There are examples of workable accords on water reached even by states that were in conflict over other matters like India and Pakistan, Israel and Jordan. Another example is that of the Northern Aral Sea, shared by Kazakhstan and Uzbekistan. It is being successfully restored after its surface had shrunk to less than half its original size as a result of a massive diversion of water under the Soviet Union, which had drained the two rivers feeding it and devastated the surrounding environment.

There have been more than 500 conflicts over water in the past century, but it's also an agent of cooperation

ALL WELL? There are more than 3,800 declarations or conventions on water, including 286 treaties

Rich countries poor in supply of water: WWF

Geneva: Rich countries have to make drastic changes to policies if they are to avoid the water crisis that is facing poorer nations, environmental organisation WWF said on Wednesday.

In a survey of the situation across the industrialised world, it said many cities were already losing the battle to maintain water supplies as governments talked about conservation but failed to implement their pledges.

has been very difficult."

In Europe, the report said, countries around the Atlantic are suffering from recurring droughts, while in the Mediterranean region water resources were being depleted by the boom in tourism and irrigated agriculture.

In Australia, already the driest continent, salinity had become a major threat to a large proportion of key farming areas, while in the US wide areas were using substantially more water than could be replenished.

Even in Japan with its high rainfall, contamination of water supplies had become a serious issue.

WILL IT LAST?

Climate change? Barmer grapples with floods

Prakash Bhandari | TNN

AND THEY SAY IT'S A DESERT

place in Barmer, 500 people in the region died of falsciparium malaria. The state government's health department is yet to wake up to the situation.

Ironically, this is the same region where the much-touted Indira Canal cuts a greening swathe across the desert, but brings its own share of woes. The waters that were to bloom the desert, have also led to a change in eco-system of the desert. Large parts of it have turned marshy and in some places, soil salinity has changed, leading to problems like waterlogging, say experts.

The worst-hit are Kawas,

...ght-prone Barmer?

SURVIVAL INSTINCT

भाखड़ा से नर्मदा तक बांध से भी ऊंची है विस्थापन की समस्या

प्रदीप सौरभ

बांधों के मामले में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे नंबर पर है भारत

In the Times of Adversity : A woman carries her child to safety in the flooded Kudla village of Rajasthan's Barmer district

Water Woes : A father carries his son to safety as he wades through floodwater, after a three-day spell of heady rain in Dhantala village, near Siliguri

খবরের মুখ্য ঘটনাগুলো আলোচনা করো।

জল দূষণ প্রতিরোধ (Prevention of Water Pollution)

প্রাপ্য জলসম্পদের দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলের উচ্চস্থানে স্বল্পঘনবসতি অঞ্চলে দেশের প্রধান নদীগুলোতে সাধারণত জলের গুণগতমান বজায় থাকে। সমতলে, নদীর জলকে জলসেচ, পানীয় জল, গৃহস্থালীর কাজে এবং শিল্পের কাজে নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা হয়। কৃষি সংক্রান্ত বর্জ্য (সার ও কীটনাশক), গৃহস্থালীর বর্জ্য (কঠিন ও তরল) এবং শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ বহনকারী নালাগুলো নদীর সাথে যুক্ত। গ্রীষ্মঋতুতে যখন জলের প্রবাহ কম থাকে নদীতে সাধারণত দূষিত পদার্থের ঘনত্ব খুবই বেশি থাকে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা Central Pollution Control Board (CPCB) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যৌথভাবে 507 টি স্টেশনে জাতীয় জলসম্পদের গুণগত মানের পর্যবেক্ষণ করে। এই সমস্ত স্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, জৈব এবং ব্যাকটেরিয়া ঘটিত দূষণ নদী দূষণের প্রধান উৎসকে নিয়মিত দূষিত করছে। দেশে দিল্লি এবং এটাওয়ার এর মধ্যবর্তী যমুনা নদী দেশের সবথেকে দূষিত নদী। অন্যান্য অধিক দূষিত নদীগুলো হল– এলাহাবাদের সবরমতি, লখনউ এ গোমতী, কালি, আদ্যর কুয়াম (সমগ্র এলাকা) মাদুরাইয়ের ভাইগাই এবং হায়দ্রাবাদের মুসি এবং কানপুর ও বারানসীর কাছে গঙ্গানদী। দেশের বিভিন্ন অংশে অতি মাত্রায় ভারী / বিষাক্ত পদার্থগুলো, ফ্লোরাইড এবং নাইট্রেটের ঘনত্বের কারণে ভৌমজল দূষিত হচ্ছে।

আইনগত ব্যবস্থা যেমন 1974 সালে জল আইন (দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ) এবং 1986 সালে পরিবেশ সুরক্ষা আইন কার্যকরীভাবে রূপায়িত হয়নি। ফলস্বরূপ 1997 সালে 251 টি দূষণকারী শিল্পগুলো নদী ও হ্রদের পাশে গড়ে উঠেছিল। 1977 সালের জলশুল্ক আইন, দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে সামান্য প্রভাব ফেলেছে। তাই জলের গুরুত্ব এবং জলদূষণের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। জনসচেতনতা ও প্রতিক্রিয়া কৃষিসংক্রান্ত কার্যকলাপ,

গৃহস্থালী ও শিল্প ক্ষেত্র থেকে নিষ্কাশিত দূষকগুলো হ্রাস করতে খুবই কার্যকরী হতে পারে।

জলের পুনরাবর্তন ও পুনর্ব্যবহার (Recycle and Reuse of Water)

আরেকটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা স্বাদুজলের সহজলভ্যতাকে বৃদ্ধি করতে পারি তা হল জলের পুনরাবর্তন ও পুনর্ব্যবহার। নিম্ন গুণসম্পন্ন জলের ব্যবহার যেমন বর্জ্য জলের পুর্নব্যবহার কারখানাগুলোর শীতলীকরণ ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য একটি আকর্ষণীয় উপায় হতে পারে যা জলের উপর ব্যয় হ্রাস করতে পারবে। একইভাবে পৌর অঞ্চলে স্নান এবং বাসন ধোয়ার পর জল বাগানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যানবাহন ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত জলও বাগানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি পানীয় জলের জন্য উচ্চ গুণসম্পন্ন জল সংরক্ষণ করবে। বর্তমানে জলের পুনরাবর্তনের ব্যবহার খুবই সীমিত। যাইহোক, পুনরাবর্তনের মাধ্যমে জল পুনরায় পূরণশীল করার বিশাল সুযোগ রয়েছে।

কাজ

তোমার বাড়িতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জলের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করো এবং যে পদ্ধতিতে জলের পুনর্ব্যবহার ও পুনরাবর্তন করা যেতে পারে তা তালিকাভুক্ত করো।

শ্রেণি শিক্ষকদের জলের পুনরাবর্তন ও পুনর্ব্যবহারের ওপর একটি আলোচনা আয়োজন করা উচিত।

জলাশয় ব্যবস্থাপনা (Watershed Management)

জলাশয় ব্যবস্থাপনা মূলত বোঝায় কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভৌমজল সম্পদের সংরক্ষণ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জলপ্রবাহ প্রতিরোধ এবং সঞ্চয় ও বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন জলাধারের অনুস্রবণ, কূপ পুনর্ভরণ করা প্রভৃতির মাধ্যমে ভৌমজল পুনর্জীবিত করা। বিস্তৃত অর্থে, জলাশয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, সমস্ত সম্পদের যথা প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন ভূমি, জল, উদ্ভিদ, পশুপাখি) এবং মানব সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জলাশয় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যদিকে সমাজের মধ্যে ভারসাম্য আনা। জলাশয় উন্নয়নের সাফল্য বেশিরভাগ নির্ভর করে সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জলাশয় উন্নয়ন ও পরিচালন কার্যক্রমের সূচনা করেছে। এদের মধ্যে কিছু কার্যক্রম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারাও রূপায়িত হয়েছে। হরিয়ালি ***(Haryali)*** একটি জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প যা কেন্দ্র সরকার দ্বারা প্রবর্তিত যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনগণকে পানীয় জল, জলসেচ, মৎস্যচাষ ও বনসৃজনের জন্য জল সংরক্ষণ করতে সক্রিয় করে তোলা। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীরু মীরু (***Neeru-Meeru***- জল ও তুমি) কর্মসূচি (অন্ধ্রপ্রদেশে) এবং অরভরি পানি সংসদ *(Arvary Pani Sansad)* (রাজস্থানের আলোয়াড়ে) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন জলসংগ্রহের কাঠামো যেমন অনুস্রবণ জলাধার, পুকুরখনন *(Johad)*, বাঁধ প্রতিরোধ প্রভৃতির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। তামিলনাড়ুর সমস্ত বাড়িতে জল সংগ্রহের কাঠামো নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জল সংগ্রহের কাঠামো নির্মাণ ছাড়া কোনো বাড়ি তৈরি করা যাবে না।

জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প কিছু অঞ্চলে সফলতার সঙ্গে পরিবেশ এবং অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করেছে। যদিও এর সফলতার কাহিনী খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যক্রম এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দেশের সমস্ত জনগণের মধ্যে জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সুফল সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন এবং সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে জলের সহজলভ্যতা বজায় রাখাকে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting)

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হল বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জলকে ধরে রাখা এবং সঞ্চয় করার একটি পদ্ধতি। এটি ভৌমজলাধার *(aquifers)*-কেও পুনর্জীবিত করে। নলকূপ, গভীর গর্ত ও কূপের মধ্যে বৃষ্টির জলের প্রত্যেকটি জলবিন্দুকে সঞ্চয় করার জন্য এটি একটি কম ব্যয় সম্পন্ন এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বৃষ্টির জল সংগ্রহ জলের সহজলভ্যতাকে বাড়ায়, ভৌমজলস্তরের হ্রাস পাওয়াকে প্রতিরোধ করে, দূষিত তরলীকৃত পদার্থ যেমন ফ্লোরাইড এবং নাইট্রেট হ্রাসের মাধ্যমে ভৌমজলের গুণগতমান উন্নত করে, মৃত্তিকা ক্ষয় ও বন্যা প্রতিরোধ করে এবং যদি ভৌমজলাধার পুনর্জীবিত করা হয় তাহলে উপকূল অঞ্চলে লবণ জলের অনুপ্রবেশ রোধ করা যাবে।

দীর্ঘসময় ধরে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রক্রিয়া চলে আসছে। গ্রামীণ অঞ্চলে গতানুগতিক বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ সঞ্চিত জলাধার যেমন– হ্রদ, পুকুর, জলসেচ, জলাধার প্রভৃতির ব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়। রাজস্থানে বৃষ্টির জল সংগ্রহের স্থানীয় নাম কুঁদ (*Kund*) বা টংকা

রালেগান সিদ্ধি, আহমেদনগর, মহারাষ্ট্রে জলাশয়ের উন্নয়ন : একটি ক্ষেত্রে সমীক্ষা (A Case Study)

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম রালেগান সিদ্ধি। এই গ্রাম সারা দেশ জুড়ে জলাশয় উন্নয়নের উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

1975 সালে এই গ্রাম দারিদ্র্য ও অবৈধ মদ ব্যবসার জালে জড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামে পরিবর্তন এসেছিল যখন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী গ্রামটিতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং জলাশয় উন্নয়নের কাজ শুরু করেছিল। তিনি পরিবার পরিকল্পনা ও স্বেচ্ছা শ্রমের গুরুত্ব, মুক্ত পশুচারণ, বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ এবং মদ বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামবাসীদের বোঝাতে পেরেছিলেন। আর্থিক সহায়তার জন্য সরকারের ওপর ন্যূনতম নির্ভরতা নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছা শ্রম প্রয়োজনীয় ছিল। ওই সক্রিয়বাদীর ব্যাখ্যা অনুসারে, "এটি প্রকল্পগুলোর ব্যয়কে সামাজিকীকরণ করে দিয়েছিল।" এমনকি গ্রামের বাইরে কর্মরত ব্যক্তিরাও অঙ্গীকার করে প্রতি বছর এক মাসের বেতন প্রদান করে উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করেছিল।

গ্রামে অনুস্রবণ জলাধার নির্মাণের মধ্য দিয়েই কাজ শুরু হয়েছিল। 1975 সালে জলাধারটি জল ধরে রাখতে পারল না। বাঁধের দেওয়াল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছিল। লোকেরা স্বেচ্ছায় বাঁধটি মেরামত করেছিল। লোকেদের জীবনযাত্রার স্মৃতিতে প্রথমবারের মতো গ্রীষ্মকালে এর নীচে সাতটি কূপ জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা তাঁকে ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল।

অরুণ মণ্ডল নামে একটি যুবদল গঠন করা হয়েছিল। এই দলটি যৌতুক প্রথা, বর্ণ বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করার কাজ করেছিল। মদ পাতন কারখানা অপসারণ করা হয়েছিল এবং মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নতুন করে দোচালা ঘরে ভোজন প্রদানের ওপর জোর দিয়ে মুক্ত পশুচারণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আখ চাষের মতো নিবিড় জলের ফসল চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কম জল প্রয়োজন হয় এমন ফসল যেমন ডাল, তৈলবীজ এবং কিছু অর্থকরী ফসল চাষে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল।

জলাশয় উন্নয়নের পূর্বে রালেগান সিদ্ধি

স্থানীয় সংস্থার সকল নির্বাচন ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে দিয়েছিল, "এটি সম্প্রদায়ের নেতাদের সম্পূর্ণরূপে জনগণের প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছিল।" ন্যায় পঞ্চায়েতের একটি পদ্ধতিও (আনুষ্ঠানিক আদালত) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তখন থেকে কোনো মোকদ্দমা পুলিশের কাছে পাঠানো হয়নি।

শুধুমাত্র গ্রামের সম্পদ ব্যবহার করে 22 লক্ষ টাকার একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। কোনো অনুদান নেওয়া হয়নি। প্রয়োজন হলে অর্থ ধার নেওয়া হয়েছিল এবং পরে অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এই আত্মনির্ভরতায় গর্ব বোধ করত। গর্ব ও স্বেচ্ছা উদ্দীপনার এই অনুপ্রেরণায় শ্রমের অংশীদারিতে এক নতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। মানুষ কৃষিকাজে স্বেচ্ছায় একে অপরকে সাহায্য করতে লাগল। ভূমিহীন শ্রমিকরাও কর্মসংস্থান লাভ করছিল। আজ গ্রামটি তাদের জন্য সংলগ্ন গ্রামগুলোতে জমি ক্রয় করার পরিকল্পনা করেছে।

জলাশয় উন্নয়নের পর রালেগান সিদ্ধি

বর্তমানে জল পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে; কৃষিক্ষেত্রও সমৃদ্ধ, যদিও সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অধিক মাত্রায় হচ্ছে। নেতার পর কার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান বংশধরের সমৃদ্ধি বজায় রাখার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। কেননা আন্দোলনটির নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে, "একটি আদর্শ গ্রাম তৈরি হওয়া পর্যন্ত রালেগানের বিকাশ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে না। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ বিকাশের নতুন পথের দিকে অগ্রসর হয়। ভবিষ্যতে রালেগান অবশ্যই দেশের একটি ভিন্ন মডেল উপস্থাপন করতে পারে।"

একটি প্রশমন প্রচেষ্টা কী করতে পারে ? একটি সাফল্যের গল্প

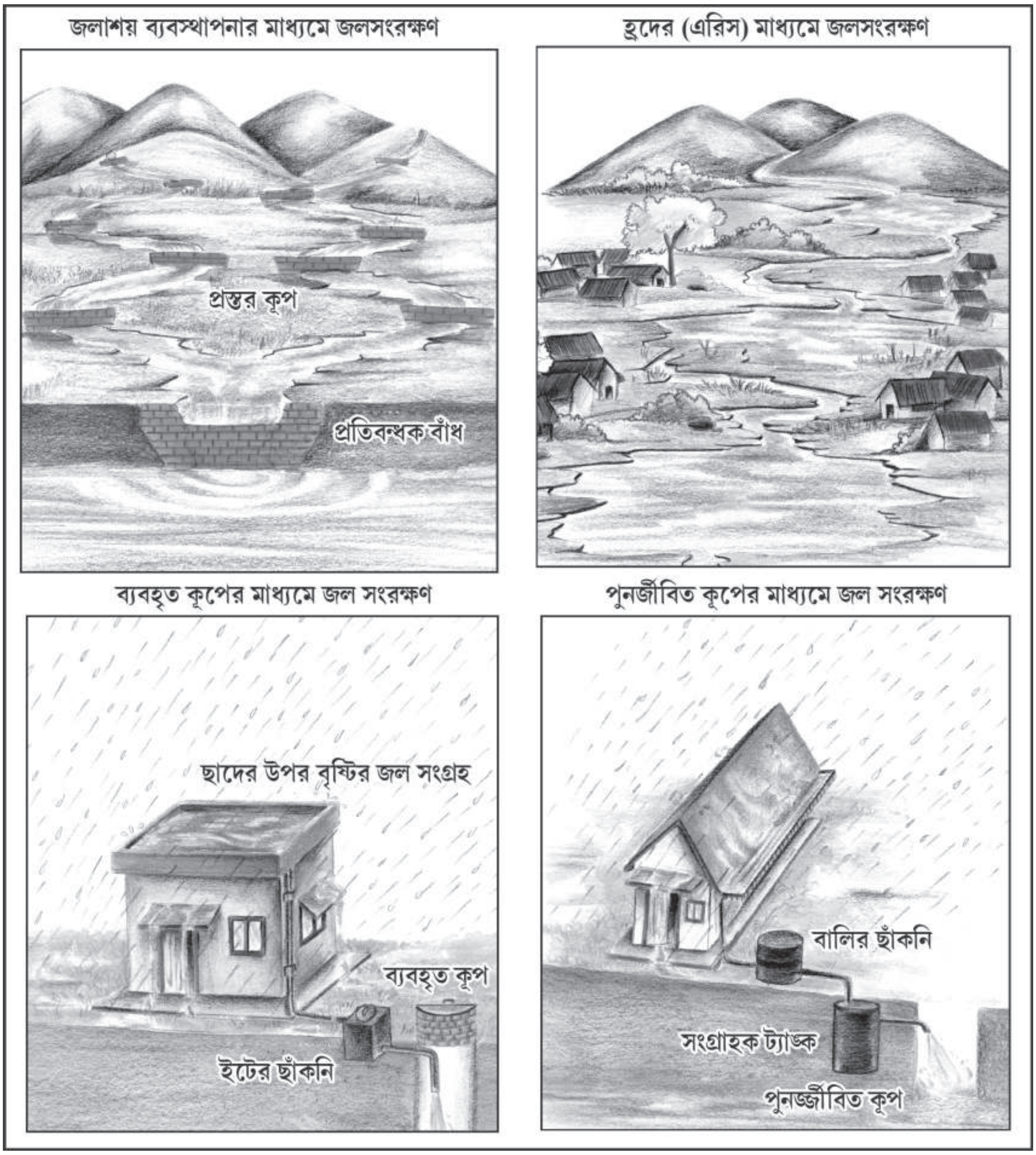

চিত্র 6.6 : বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

(একটি আচ্ছাদিত ভূগর্ভস্থ জলাধার) বাড়িতে বা বাড়ির কাছে অথবা গ্রামের মধ্যে নির্মাণ করা হয় (বিভিন্নভাবে জল সংরক্ষণের পদ্ধতি বোঝার জন্য চিত্র 6.5 দেখো)।

মূল্যবান জলসম্পদ সংরক্ষণের জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কৌশলগুলোর ব্যবহার করার বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। এটি ছাদ এবং খোলা জায়গায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ওপর সম্প্রদায়ের নির্ভরতা হ্রাস করে। এছাড়াও চাহিদা সরবরাহের ব্যবধান কমিয়ে আনার পাশাপাশি এটি ভৌমজলের উত্তোলন শক্তির সঞ্চয়ও করতে পারে কারণ ভৌমজলের পুনর্জীবন ভৌমজলস্তর বৃদ্ধি করে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাপক হারে নেওয়া হয়েছে। নগর অঞ্চলগুলো বৃষ্টিপাতের জল সংরক্ষণ থেকে বিশেষ উপকৃত হয় কারণ বেশিরভাগ শহরে ও নগরে জলের চাহিদা ইতোমধ্যে জলের সরবরাহকে ছাপিয়ে গেছে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে এবং শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে লবণ জল নির্লবণীকরণ, অতিরিক্ত জলযুক্ত অঞ্চল থেকে কম জলযুক্ত অঞ্চলে নদীগুলোর আন্তঃসংযুক্তির মাধ্যমে জলের স্থানান্তর, ভারতে জলের সমস্যা দূর

করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হতে পারে। (নদীর আন্তঃসংযুক্তি সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করো)। যাই হোক, স্বতন্ত্র ব্যবহারকারী, গৃহস্থালী এবং সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় হল জলের মূল্য নির্ধারণ।

ভারতীয় জাতীয় জল নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য- 2002

জাতীয় জলনীতি 2002 চুক্তির দ্বারা জল বরাদ্দের অগ্রাধিকারগুলো নিম্নলিখিত ক্রমে দেওয়া হল– পানীয় জল, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, নাব্যতা, শিল্প ও অন্যান্য ব্যবহার। নীতিটি জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নতুন পথগুলো নির্ধারণ করে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

- সেচ এবং বহুমুখী প্রকল্পগুলোতে অবিচ্ছিন্নভাবে পানীয় জলের উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেখানে পানীয় জলের বিকল্প উৎস নেই।
- সমস্ত মানুষ এবং প্রাণীকে পানীয় জল সরবরাহ করা প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
- ভৌম জলের অতিমাত্রায় ব্যবহারকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
- ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলের গুণগত মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। জলের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- দক্ষতার সাথে জল ব্যবহার করা উচিত।
- দুষ্প্রাপ্য সম্পদ হিসাবে জলের সচেতনতাকে উৎসাহিত করা উচিত।
- শিক্ষা, নিয়ম-কানুন, উৎসাহ এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে সংরক্ষণ সচেতনতাকে প্রচার করা উচিত।

উৎস : *Government of India (2002), 'India's Reform Initiatives in Water Sector', Ministry for Rural Development, New Delhi*

কাজ

ওয়েবসাইট (www.wrmin.nic.in) থেকে জাতীয় জল নীতি, 2012 এবং গঙ্গা নদীর পুনর্জীবিত করা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

জল ক্রান্তি অভিযান (2015-16) Jal Kranti Abhiyan (2015-16)

জল একটি পুনরাবর্তন সম্পদ কিন্তু এর সহজলভ্যতা সীমিত এবং সময়ের সাথে সাথে এর চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান বাড়বে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। জলের অতি চাহিদার সাথে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভারতে এক বিশেষ অবস্থা তৈরি করেছে। দেশে মাথাপিছু জলের সহজলভ্যতার মাধ্যমে জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 2015–16 সালে ভারত সরকার 'জল ক্রান্তি অভিযান' শুরু করেছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ জলের সহজলভ্যতাকে নিশ্চিত করতে জলের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক প্রথা ব্যবহার করেছে।

'জল ক্রান্তি অভিযানের' উদ্দেশ্য স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO) এবং জনগণকে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করা, এর উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা। নিম্নে জল ক্রান্তি অভিযান এর প্রস্তাবিত কার্যাবলি দেওয়া হল—

1. জল গ্রাম 'Jal Gram' তৈরি করতে দেশের প্রতিটি 672 জেলার মধ্যে একটি গ্রামকে নির্বাচন করা।
2. দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় 1000 হেক্টর মডেল কমান্ড অঞ্চল চিহ্নিত করা যেমন-উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা (উত্তর), কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু (দক্ষিণ), রাজস্থান, গুজরাট (পশ্চিম), ওড়িশা (পূর্ব), মেঘালয় (উত্তর-পূর্ব)।
3. দূষণ হ্রাস করা :
   - জল সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম উপায়ে পুনর্জীবন
   - ভৌমজল দূষণ হ্রাস করা
   - দেশের নির্বাচিত অঞ্চলগুলোতে আর্সেনিক মুক্ত কূপ নির্মাণ
4. সামাজিক মাধ্যম, রেডিও, টি. ভি. মুদ্রণ মাধ্যম, পোস্টার এবং বিদ্যালয়গুলোতে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জন সচেতনতা সৃষ্টি করা।

জলের নিরাপত্তার মাধ্যমে জীবিকা ও খাদ্য সুরক্ষা প্রদান করতে 'জল ক্রান্তি অভিযান' তৈরি করা হয়েছিল।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

(i) নিম্নলিখিত কোন্‌টি জলকে একটি সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করে–

(a) অজৈব সম্পদ (c) জৈব সম্পদ

(b) অপুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ (d) চক্রাকার সম্পদ

(ii) নিম্মলিখিত নদীগুলোর মধ্যে কোন্‌টিতে দেশের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ ভৌমজল সম্পদ রয়েছে?

(a) সিন্ধু (c) গঙ্গা

(b) ব্রহ্মপুত্র (d) গোদাবরী

(iii) নিম্নে প্রদত্ত কিউবিক কিলোমিটারের কোন্ পরিসংখ্যানটি ভারতের মোট বার্ষিক অধঃক্ষেপনকে সঠিকভাবে দেখায়?

(a) 2,000 (c) 4,000

(b) 3,000 (d) 5,000

(iv) নিম্নলিখিত দক্ষিণ ভারতের কোন্ রাজ্যটি মোট সম্ভাব্য ভৌমজল সমুদ্রের মধ্যে সর্বোচ্চ ভৌমজল ব্যবহার করে?

(a) তামিলনাড়ু (c) অন্ধ্রপ্রদেশ

(b) কর্ণাটক (d) কেরালা

(v) দেশে ব্যবহৃত মোট জলের সর্বাধিক অনুপাত নিম্নলিখিত কোন্ ক্ষেত্রে দেখা যায় ?

(a) জলসেচ (c) গৃহস্থালির ব্যবহারে

(b) শিল্পসমূহ (d) ওপরের কোনটিই নয়

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) এটি বলা হয় যে ভারতের জলসম্পদগুলো খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জল সম্পদ হ্রাসের জন্য দায়ী কারণসমূহ আলোচনা করো।

(ii) পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে সর্বাধিক ভৌমজলের উন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো কী কী?

(iii) কেন দেশের মোট ব্যবহৃত জলের কৃষিক্ষেত্রের অংশ হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে?

(iv) জনগণের উপর দূষিত/অপরিষ্কার জল গ্রহণের সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) দেশে জলসম্পদের সহজলভ্যতা এবং এর স্থানিক বণ্টন নির্ধারণকারী কারণগুলো আলোচনা করো।

(ii) জল সম্পদের অবক্ষয়জনিত কারণে সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

(iii) জলাশয় ব্যবস্থাপনা কী? তোমরা কি মনে করো স্থিতিশীল উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে?

একক III

অধ্যায় 7

খনিজ এবং শক্তি সম্পদ
(MINERAL AND ENERGY RESOURCES)

ভারত তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের জন্য প্রচুর খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাক্-পেলিওজোয়িক যুগে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান খনিজ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল (একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বই "প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব" এর অধ্যায়-2) এবং তার সঙ্গে প্রধানত উপদ্বীপীয় ভারতের রূপান্তরিত ও আগ্নেয় শিলা জড়িত রয়েছে। উত্তর ভারতের বিশাল পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খনিজ ভান্ডারের আর্শীবাদ স্বরূপ। খনিজ সম্পদ যে কোনো দেশের শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি প্রদান করে। এই অধ্যায়ে আমরা এই দেশের বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও শক্তি সম্পদের সহজলভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব।

> খনিজ হল রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম বিশিষ্ট জৈব ও অজৈব বস্তুর উৎপত্তির সময় সৃষ্ট এক প্রাকৃতিক পদার্থ।

খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ (Types of Mineral Resources)

রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের ওপর ভিত্তি করে খনিজকে প্রধানত ধাতব ও অধাতব এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একে পুনরায় নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যেতে পারে :

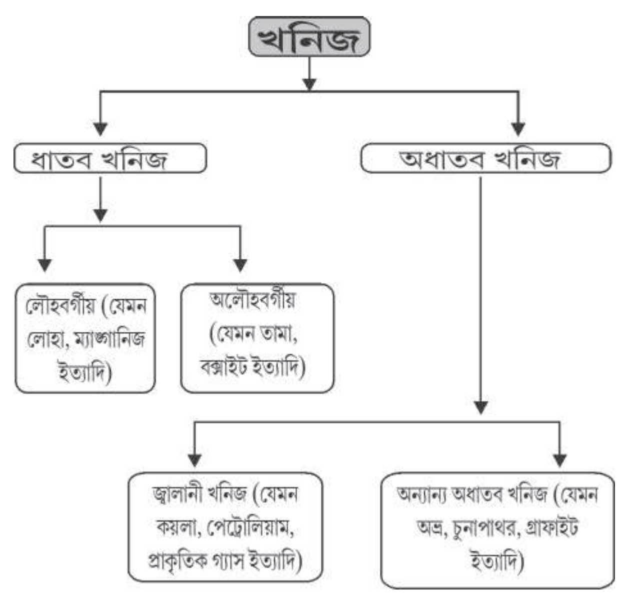

চিত্র 7.1 : খনিজের শ্রেণিবিভাগ

চিত্র 7.1 থেকে বোঝা যায় যে ধাতব খনিজের উৎস হল ধাতু। লৌহ আকরিক, তামা, স্বর্ণ উৎপাদনকারী ধাতু ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধাতব খনিজ আবার লৌহবর্গীয় এবং অ-লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজে বিভক্ত। লৌহ বর্গীয়কে তোমরা লোহা হিসাবে জান। যেসব খনিজের মধ্যে লোহার উপাদান রয়েছে সেগুলি লৌহ বর্গীয়, যেমন– লৌহ আকরিক এবং যাদের মধ্যে লোহার উপদান নেই সেগুলি হল অ-লৌহবর্গীয়, যেমন– তামা, বক্সাইট প্রভৃতি।

অধাতব খনিজ হয়তো জৈব উৎসে পাওয়া যায় যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি, এটি খনিজ জ্বালানি হিসাবেও পরিচিত যা মাটিতে চাপাপড়া প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত হয়, যেমন কয়লা ও খনিজ তেল। অন্যান্য ধরনের অ-ধাতব খনিজগুলো যা অজৈব উৎসে পাওয়া যায় সেগুলো হল– অভ্র, চুনাপাথর এবং গ্রাফাইট ইত্যাদি।

খনিজের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো পৃথিবী জুড়ে অসমভাবে বন্টিত। খনিজের গুণগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক লক্ষ করা যায়, যেমন নিকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন খনিজের তুলনায় উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন খনিজ কম পরিমাণে পাওয়া যায়। তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হল সব খনিজই সময়ের সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে যায়। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে এগুলো পূরণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং প্রয়োজনের সময় তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করা যায় না। এই জন্য এদের সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং অপব্যবহার বন্ধ করা উচিত যেহেতু এগুলো দ্বিতীয়বার উৎপাদন করা যায় না।

খনিজ উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত সংস্থাসমূহ
(Agencies involved in the exploration of minerals)

ভারতে খনিজের নিয়মিত সমীক্ষা, প্রত্যাশা এবং অনুসন্ধানের জন্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (GSI), অয়েল এন্ড ন্যাচারল গ্যাস কমিশন (ONGC), মিনারেল এক্সপ্লোরেসান কর্পোরেশন লিমিটেড (MECL), ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন (NMDC), ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস (IBM), ভারত গোল্ড মাইনস লিমিটেড (BGML), হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড (HCL), ন্যাশনাল অ্যালমনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (NALCO) এবং বিভিন্ন রাজ্যের মাইনিং ও জিওলোজি বিভাগ কাজ করে চলছে।

ভারতে খনিজের বন্টন (Distribution of Minerals in India)

অধিকাংশ ধাতব খনিজ ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলের প্রাচীন কেলাসিত শিলাতে পাওয়া যায়। প্রায় 97 শতাংশ কয়লা দামোদর, শোন, মহানদী এবং গোদাবরী উপত্যকা অঞ্চলে সঞ্চিত রয়েছে, আসামের পলল অববাহিকা অঞ্চল, গুজরাট এবং মুম্বে-হাই যা আরব সাগরের পুরোদেশীয় তটভূমিতে অবস্থিত, অঞ্চলে খনিজ তেল সঞ্চিত রয়েছে। নবীন সঞ্চিত অঞ্চলগুলো কৃষ্ণা-গোদাবরী এবং কাবেরী অববাহিকায় অবস্থিত। অধিকাংশ প্রধান খনিজগুলো ম্যাঙ্গালোর এবং কানপুর সংযুক্ত রেখার পূর্বদিকে পাওয়া যায়।

ভারতের খনিজগুলো প্রধানত তিনটি বিশাল বলয়ে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিছু বিক্ষিপ্ত ভান্ডার এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন বলয়ে পাওয়া যায়। এই বলয়গুলো হল :

উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল (The North-Eastern Plateau Region)

এই বলয়টি ছোটোনাগপুর (ঝাড়খন্ড), ওড়িশার মালভূমি, পশ্চিমবঙ্গ এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্পগুলো কেন এই অঞ্চলে অবস্থিত? এখানে বিভিন্ন প্রকার খনিজ যেমন লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, অভ্র প্রভৃতি রয়েছে।

বিশেষ অঞ্চল খুঁজে বের করো যেখানে এই খনিজগুলো আহরণ করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মালভূমি অঞ্চল (The South-Western Plateau Region)

এই বলয়টি সমগ্র কর্ণাটক, গোয়া, তামিলনাড়ুর উচ্চভূমি সংলগ্ন এলাকা ও কেরালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ধাতব লৌহ এবং বক্সাইটে সমৃদ্ধ। এখানে উচ্চমানের আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এবং চুনাপাথর রয়েছে। নেভেলির লিগনাইট ছাড়া এই অঞ্চলে সীমিত কয়লা সঞ্চয় রয়েছে।

এই অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব বলয়ের মতো খনিজ সঞ্চয়ের বৈচিত্র্য নেই। কেরালায় মোনাজাইট, থোরিয়াম এবং বক্সাইট ক্লে সঞ্চিত রয়েছে। গোয়াতে লৌহ আকরিক সঞ্চিত রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (The North-Western Region)

এই বলয়টি আরাবল্লি সংলগ্ন রাজস্থান এবং গুজরাটের কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত এবং খনিজগুলো ধারোওয়ার ক্রমের শিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তামা এবং দস্তা এখানকার প্রধান খনিজ। রাজস্থান পূর্তশিলা (building stones) যেমন বেলেপাথর, গ্রানাইট, মার্বেল ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। জিপসাম এবং মুলতানী মাটিরও বিপুল সঞ্চয় এ অঞ্চলে রয়েছে। গুজরাট পেট্রোলিয়াম সঞ্চয়ের জন্য বিখ্যাত।

তোমরা নিশ্চয়ই জান গুজরাট এবং রাজস্থান উভয়ই লবণের উৎস হিসাবে সমৃদ্ধ।

মহাত্মা গান্ধী কেন ও কোথায় ডান্ডি অভিযান করেছিল ?

হিমালয় অঞ্চল আরেকটি খনিজ অঞ্চল হিসাবে বিখ্যাত যেখানে তামা, সিসা, দস্তা, কোবাল্ট এবং টাংস্টেন পাওয়া যায়। এগুলি পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অংশেই পাওয়া যায়। আসাম উপত্যকা খনিজ তেলে সমৃদ্ধ। তাছাড়া মুম্বাই উপকূলের পুরোদেশীয় অঞ্চলে (মম্বে হাই) তৈল সম্পদ পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলোতে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ খনিজের আঞ্চলিক বন্টন সম্পর্কে জানতে পারবে।

লৌহ বর্গীয় খনিজ (Ferrous Mineral)

লৌহ বর্গীয় খনিজ যেমন আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট প্রভৃতি ধাতব শিল্পের উন্নতির জন্য মজবুত ভিত্তি প্রদান করে। লৌহ বর্গীয় খনিজের সঞ্চয় এবং উত্তোলন উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ উত্তম স্থান দখল করে আছে।

আকরিক লোহা (Iron Ore)

ভারত প্রচুর লৌহ আকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আকরিক লোহার ভান্ডার। আমাদের দেশে আকরিক লোহার প্রধান দুটি বিভাগ হল হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট। উত্তম গুণমানের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। দেশের উত্তর পূর্ব মালভূমি অঞ্চলে আকরিক লোহার খনিগুলো কয়লা ক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি স্থানে রয়েছে যা এদের সুবিধা প্রদান করেছে।

2004-05 সালে দেশের মোট আকরিক লোহার সঞ্চয় প্রায় 20 বিলিয়ন টন। মোট সঞ্চয়ের প্রায় 95 শতাংশ আকরিক লোহা ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, গোয়া, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত ওড়িশায় লৌহ আকরিক সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ এবং ঝাড় অঞ্চলের সারিবদ্ধ পাহাড় শ্রেণিতে পাওয়া যায়। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ খনিগুলো হল গুরুমহিষানী, সুলাইপাত, বাদামপাহাড় (ময়ূরভঞ্জ) কিরুবুরু (কেন্দুঝাড়) এবং বোনাই (সুন্দরগড়)। ঝাড়খন্ডের একই পাহাড় শ্রেণিগুলোতে কিছু পুরাতন আকরিক লোহার

Iron ore mining gets a boost

The iron ore mining industry in India is attracting several new players, both large and small

Any industrialised nation requires vast quantities of iron ore, which is the basic raw material from which iron and steel are made. India is no exception, and its development over the past few decades has necessitated huge reserves of iron and steel. Iron ore is produced in approximately 46 countries, and world resources are estimated to exceed 800 billion tons of crude ore containing more than 230 billion tons of iron. While Brazil and China are world leaders in iron ore production and consumption, India ranks sixth in terms of iron ore deposits. Interestingly however, India's per capita mineral consumption is one of the lowest in the world.

The Indian ferrous industry can be divided into ore miners and producers. Ore miners are engaged in mining activities to extract the ore, largely for the use of producers. Key players include National Mineral Development Corporation (NMDC), Kudremukh Iron Ore Co (KIOCL), Essel Mining & Industries Ltd. and Sesa Goa (Sesa). Other players like the Belgaum based PVG group which has tied up with the Kolhapur-based Ghodawat Group to form Star PVG exports are also making a mark. Iron ore mines are mostly located in Jharkhand, Orissa, West Bengal, Chattisgarh and Karnataka. Recently however, some Indian steel manufacturing companies have invested in steel and coal mines abroad, such as in Australia.

Producers are classified into main or integrated producers, and ... grated producers account ... crude steel production in ... integrated steel produc... ity of India Ltd (SAIL), R... Limited (RINL), and TIS... the best-known private sector companies in the country. Companies like SAIL and TISCO have their own captive mines. The other or secondary producers include re-rollers and stand alone producers in the organised and unorganised segments, and account for the remaining 58% of India's steel production. Producers are also classified on the basis of the production process and the type of products (long or flat) manufactured by the producers.

Stand alone producers produce sponge iron and pig iron to be used by the main producers. India is the largest producer of coal based sponge iron in the world, and accounts for 15% of the global output. Jindal Steel & Power Ltd. is the largest producer of coal based sponge iron in India - it is also the second largest in the world - with a capacity of 550,000 TPA. KIOCL, Sesa Goa and Usha Ispat are the major producers of pig iron. Integrated steel plants like SAIL and RINL also produce a significant amount of pig iron.

While iron ore is a major component of the steel manufacturing process, scrap is often used to supplement it, though it is in relative... ...rect indicators of iron ore consumption than crude steel. However, imports of iron ore are not a direct indicator of a change in iron ore consumption in any country that produces iron ore.

The Government of India has taken several steps to promote the growth of the mineral sector under the overall framework of the National Mineral Policy, 1993. The amended Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR Act) is aimed at attracting private investment and foreign direct investment (FDI) into the sector. It is estimated that the production of iron ore during the terminal year of the Tenth Plan (2006-07) will touch 110 mt, with around 40 mt exported annually during the Plan period. The Government also regulates the amount of iron ore to be extracted to counter pollution. Modern excavation heavy blasting techniques have been developed which help minimise damage to the environment.

Export of high-grade iron ore has been so far channelled through the Minerals and Metals Trading Corporation Ltd (MMTC), and quantitative restrictions were imposed by the Government to ensure that indigenous demand was met before any surplus could be exported. However a shift in this policy is expected.

With the number of end user industries in India growing at a significant rate, the production of steel based products is ... prospect, drawing a large ...

তোমরা কি এর কারণ খুঁজে বের করতে পারবে ?

খনি রয়েছে এবং অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এদের চারপাশে অবস্থিত। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ খনিগুলো, যেমন— নোয়ামুন্ডি এবং গুয়া পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলায় অবস্থিত। এই বলয়টি পুনরায় দুর্গ, দন্তেওয়ারা বাইলাডিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ডাল্লি এবং দুর্গের রাজহারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ লৌহ আকরিক খনি। কর্ণাট ক বেল্লারি জেলায় সান্দুর হসপেট অঞ্চলে, চিকমাগালু জেলায় বাবাবুদান পাহাড় ও কুদ্রেমুখ এবং শিবমোগ্গা, চিত্রদুর্গ ও টুমাকুরু জেলার কিছু অংশে লৌহ আকরিকের সঞ্চয় রয়েছে। মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা ও রত্নাগিরি জেলা, তেলেঙ্গানার করিমনগর ও ওয়ারাঙ্গাল জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল কুড্ডাপ্পা ও অনন্তপুর জেলা, তামিলনাড়ুর সালেম ও নীলগিরি জেলা হল অন্যান্য লৌহ খনি অঞ্চল। গোয়া ও গুরুত্বপূর্ণ আকরিক লোহা উৎপাদক হিসাবে উদিত হয়েছে।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

ম্যাঙ্গানিজ হল লৌহ আকরিক গলনের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এবং এটি সঙ্কর লৌহ নির্মাণেও ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গানিজের সঞ্চয় প্রায় সকল প্রকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠনে পাওয়া যায়। যদিও এটি প্রধানত ধারওয়ার ক্রমের সঙ্গে যুক্ত।

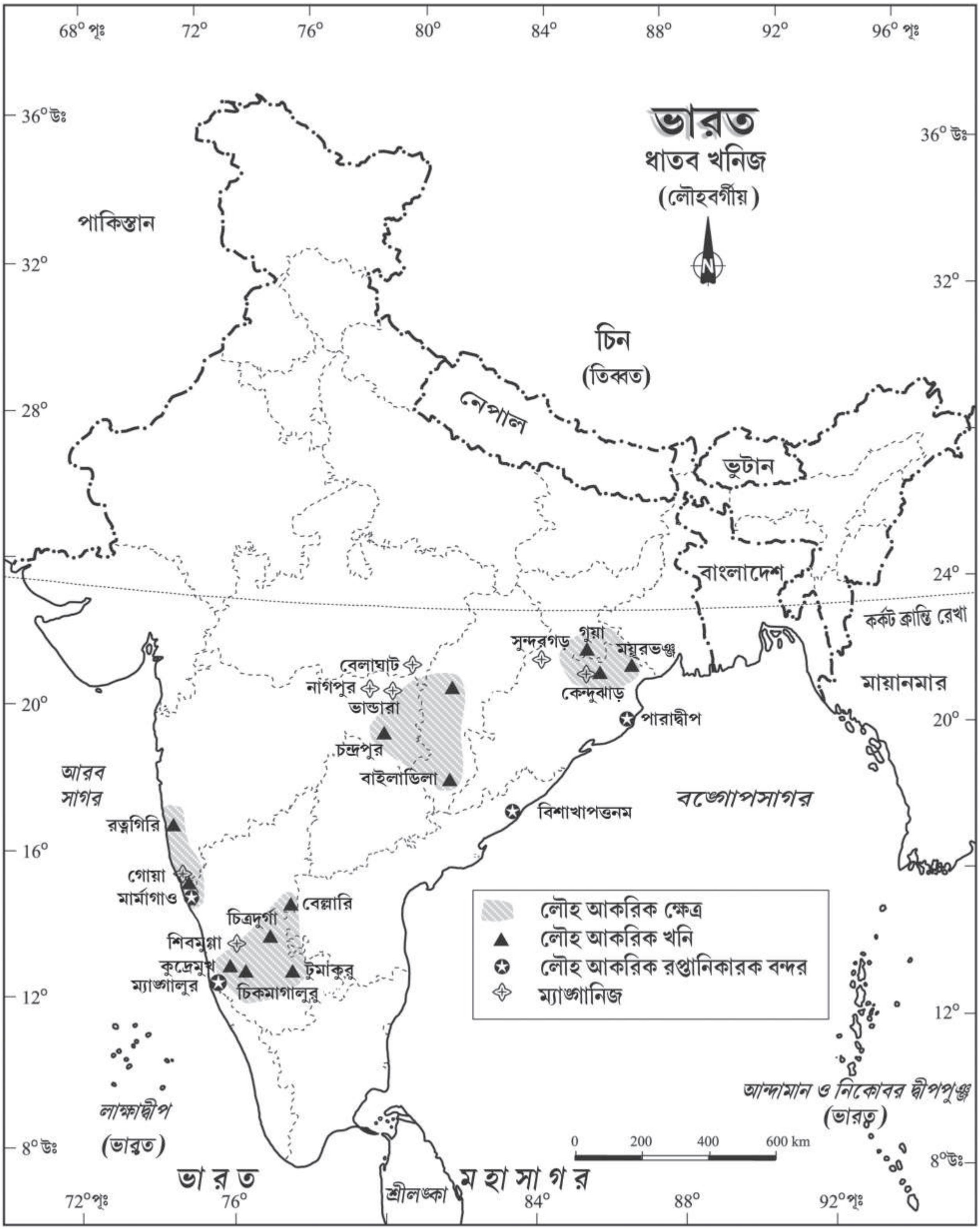

চিত্র 7.2 : ভারত— ধাতব খনিজ (লৌহ বর্গীয়)

ওড়িশা হল মঙ্গানিজের প্রধান উৎপাদক। ওড়িশার প্রধান খনিগুলো ভারতের লৌহ আকরিক বলয়ের মধ্যভাগে বিশেষত বোনাই, কেন্দুঝাড়, সুন্দরগড়, গঙ্গাপুর, কোরাপুট, কালাহান্দি এবং বোলানগিরে অবস্থিত।

কর্ণাটক অপর একটি প্রধান উৎপাদক এবং এখানকার খনিগুলো ধারওয়ার, বেল্লারি, বেলাগাভি, উত্তর কানাড়া, চিকমাগলুর, শিব মোগা, চিত্রদুর্গা এবং টুমাকুরুতে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রও একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক, যার খনিগুলো নাগপুর, ভান্ডারা এবং রত্নগিরি জেলাতে রয়েছে। এই খনিগুলোর অসুবিধা হল এগুলো ইস্পাত কারখানা থেকে দূরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ বলয়টি বালাঘাট-চিন্দধোয়ার-নিমার - মান্দালা এবং ঝাবুয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

তেলেঙ্গানা, গোয়া এবং ঝাড়খন্ড হল অ-প্রধান ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক রাজ্য।

অ-লৌহ বর্গীয় খনিজ (Non-Ferrous Minerals)

ভারতে বক্সাইট ছাড়া অ-লৌহ বর্গীয় খনিজের পরিমাণ কম।

বক্সাইট (Bauxite)

বক্সাইট হল একটি আকরিক যা অ্যালুমিনিয়াম নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বক্সাইট প্রধানত টার্শিয়ারী সঞ্চয়ে পাওয়া যায় এবং ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গো যুক্ত রয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে উপদ্বীপীয় ভারতের মালভূমি অথবা পর্বত শ্রেণির সাথে সাথে দেশের উপকূলীয় অংশেও পাওয়া যায়।

ওড়িশা হল বৃহত্তম বক্সাইট উৎপাদক। কালাহান্দি এবং সম্বলপুর হল প্রধান উৎপাদক। বোলানগির এবং কোরাপুট হল অন্য দুটি অঞ্চল যাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে। ঝাড়খন্ডের লোহারডাগার পাটল্যান্ড (patlands) বক্সাইট সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ। গুজরাট, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র হল অন্যান্য প্রধান উৎপাদক। গুজরাটের ভাবনগর এবং জামনগরে সবচেয়ে বেশি সঞ্চয় রয়েছে। ছত্তিশগড়ে অমরকন্টক মালভূমিতে বক্সাইটের সঞ্চয় রয়েছে যেখানে মধ্যপ্রদেশের কাটনি-জবলপুর অঞ্চল এবং বালাঘাটে গুরুত্বপূর্ণ বক্সাইটের ভান্ডার রয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোলাবা, থানে, রত্নাগিরি, সাঁতারা, পুনে এবং কোলাপুর প্রভৃতি হল গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং গোয়া হল অ-প্রধান বক্সাইট উৎপাদক রাজ্য।

তামা (Copper)

তামা বিদ্যুৎ শিল্পে, তার, বৈদ্যুতিক মটর, ট্রান্সফরমার এবং জেনেরেটের তৈরিতে অপরিহার্য ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সঙ্করযোগ্য, নমনীয় এবং প্রসারনশীল। অলঙ্কারকে সুদৃঢ় করার জন্য স্বর্ণের সঙ্গো এর মিশ্রন ঘটানো হয়।

তামা প্রধানত সঞ্চিত রয়েছে ঝাড়খন্ডের সিংভূম জেলায়, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় এবং রাজস্থানের জুনজুনা ও আলোয়ার জেলায়।

তামার উৎপাদক অঞ্চল হল গুন্টুর জেলার (অন্ধ্রপ্রদেশ) অগ্নিগুন্ডালা, হাসান জেলার (কর্ণাটক) চিত্রদুর্গ এবং দক্ষিণ আর্কট (তামিলনাড়ু) প্রভৃতি।

অধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals)

ভারতে উৎপাদিত অধাতব খনিজের মধ্যে অভ্র গুরুত্বপূর্ণ। যে সব খনিজ স্থানীয় ভোগের জন্য উত্তোলন করা হয় সেগুলো হল চুনাপাথর ডলোমাইট এবং ফসফেট।

অভ্র (Mica)

অভ্র প্রধানত বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। একে হালকা পাতে আলাদা করা যায় যেগুলো শক্ত এবং নমনীয়। ভারতে অভ্র উৎপাদিত হয় ঝাড়খন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং রাজস্থানে। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশে অভ্র পাওয়া যায়। ঝাড়খন্ডে উচ্চগুণ সম্পন্ন অভ্র নিম্ন হাজারিবাগ মালভূমির 150 কিমি লম্বা ও 22 কিমি চওড়া বলয়ে বিস্তৃত রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলায় অতি উচ্চমানের অভ্র উৎপাদিত হয়। রাজস্থানে অভ্র বলয়টি প্রায় 320 কিমি বিস্তৃত যা জয়পুর থেকে ভিলওয়ারা এবং উদয়পুরের আশেপাশে অবস্থিত। কর্ণাটকের মহীশূর এবং হাসান জেলা, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর, তিরুচিরাপল্লি, মাদুরাই ও কন্যাকুমারী, কেরালার আলেপ্পি, মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাকুরায় অভ্র সঞ্চিত রয়েছে।

শক্তি সম্পদ (Energy Resources)

শক্তি উৎপাদনের জন্য খনিজ জ্বালানি অপরিহার্য যা কৃষি, শিল্প, যাতায়াত এবং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন। খনিজ জ্বালানি যেমন কয়লা, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (জীবাশ্ম জ্বালানি হিসাবে পরিচিত), পারমাণবিক শক্তি সম্পদ প্রচলিত শক্তির উৎস।

চিত্র 7.3 : ভারত– খনিজ (অ-লৌহবর্গীয়)

এই প্রচলিত শক্তির উৎসগুলো অপূরণশীল সম্পদ।

কয়লা (Coal)

কয়লা একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক এবং লৌহ আকরিক গলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কয়লা প্রধানত দুটি ভূতাত্ত্বিক যুগ যেমন গন্ডোয়ানা ও টার্শিয়ারি যুগের শিলাতে সঞ্চিত রয়েছে। ভারতের সঞ্চিত কয়লার প্রায় ৪০ শতাংশ বিটুমিনাস শ্রেণির এবং তা কোক কয়লা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়। ভারতে গন্ডোয়ানা কয়লার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত।

গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা ঝাড়খন্ড-বঙ্গ কয়লা বলয়ে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কয়লাক্ষেত্রগুলো হল রানিগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, করনপুরা প্রভৃতি।

ঝরিয়া হল বৃহত্তম কয়লা ক্ষেত্র, পরের স্থানে রয়েছে রানিগঞ্জ। কয়লা সম্পর্কিত অন্যান্য নদী উপত্যকাগুলো হল গোদাবরী, মহানদী এবং শোন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনিগুলো হল মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গ্রাউলি (সিঙ্গ্রাউলি কয়লা ক্ষেত্রের কিছু অংশ উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত), ছত্তিশগড়ে কোরবা, ওড়িশার তালচের ও রামপুর, মহারাষ্ট্রের চান্দা-ওয়ার্ধা, কামপেটিও বান্দোর, তেলেঙ্গানার সিঙ্গারেনী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পান্ডুর প্রভৃতি।

সিঙ্গারেনীতে খননকার্যে নিযুক্ত কর্মীদের উদ্ধার কাজে উপদ্বীপীয় পাখিদের ভূমিকা
(At Singareni, Canaries to miners' rescue)

সিঙ্গারেনী কোলেরিজ যা দেশের প্রথম কয়লা উৎপাদক সংস্থা, এখনও ভূ-নিম্নস্থ খনিতে ক্ষতিকারক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য উপদ্বীপীয় পাখিদের ব্যবহার করে থাকে। যদি স্বল্প পরিমাণে অত্যধিক বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ও বায়ুতে থাকে তাহলে কর্মীরা ঢলে পড়ে যায়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যদিও খননকারীরা উপদ্বীপীয়পাখিদের সম্পর্কে মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু ভূ-নিম্নস্থ অভিজ্ঞতা পাখিদের জন্য সবসময় সুখদায়িক হয় না। যখন এই পাখিদের কার্বন-মনোক্সাইড যুক্ত খনিতে পাঠানো হয় তখন অনেক সঙ্কটময় লক্ষণ প্রকাশ করে যেমন পাখার ঝাপটানো, বেশি কিচিরমিচির ডাক এবং মৃত্যু। এই অবস্থা দেখা যায় যখন বায়ুতে 0.15 শতাংশ কার্বন মনোক্সাইড উপস্থিত থাকে। যদি মিশ্রণটি 0.3 শতাংশ হয় তাহলে পাখি তৎক্ষণাৎ সঙ্কটময় অবস্থা প্রকাশ করে এবং দুই-তিন মিনিটের মধ্যে ঢলে পড়ে যায়। একজন কয়লা খননকারীর মতে একটি পাখির খাঁচা বায়ুতে 0.15 শতাংশ বেশি কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতির ভালো সংকেত বহন করে।

উন্নতমানের কার্বন মনোক্সাইড শনাক্ত করার যন্ত্র সংস্থার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে ন্যূনতম 10 ppm থেকে উচ্চতম 1,000 ppm পর্যন্ত কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়।। তা সত্ত্বেও খননকারীরা পাখিদের বেশি বিশ্বাস করে, কারণ পাখিরা তাদের পূর্বসুরীদের অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।

ডেকান ক্রানিকেল, 26.08.2006

চিত্র 7.4 : নেভেলির কয়লাক্ষেত্র

চিত্র 7.5 : ভারত–প্রচলিত শক্তি সম্পদ

টার্শিয়ারী কয়লা আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে রয়েছে। এটি দরানগিরি, চেরাপুঞ্জি, মেওলং এবং লংগ্রিন (মেঘালয়), উচ্চ আসামের মাকুম, জয়পুর এবং নাজিরা, নামচিক-নাম্ফুক (অরুণাচল প্রদেশ) এবং কালাকোট (জম্মু ও কাশ্মীর) প্রভৃতি থেকে উত্তোলন করা হয়।

এছাড়াও বাদামি কয়লা অথবা লিগনাইটট রয়েছে তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরী, গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীরে।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum)

তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন নিয়ে গঠিত হয়, যার রাসায়নিক গঠন, বর্ণ এবং আপেক্ষিক গুরুত্বে বিভিন্নতা রয়েছে। এটি অটোমোবাইল, রেল এবং বিমানের ইঞ্জিনে অন্তর দহনের জন্য অপরিহার্য্য শক্তির উৎস। পেট্রো রাসায়নিক শিল্পে এর অনেক উপজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ করা হয় যেমন-- সার, কৃত্রিম রাবার, কৃত্রিম তন্তু, ঔষধ, ভেসেলিন, পিচ্ছিলকারক তেল, সাবান এবং প্রসাধনী সামগ্রী।

তোমরা জানো কি?

দুর্লভ পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একে তরল সোনা বলা হয়।

160 কিমি দূরে অবস্থিত এবং 1976 সালে এর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পূর্ব উপকূলের কৃষ্ণা-গোদাবরী এবং কাবেরী অববাহিকা অঞ্চলে অন্বেষনকারী কূপে পাওয়া গেছে।

কূপ থেকে নিষ্কাশিত তৈল অপরিশোধিত এবং অনেক অশুদ্ধ মিশ্রিত থাকে। একে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। এর শোধন করা প্রয়োজন। (a) ক্ষেত্র ভিত্তিক এবং (b) বাজার ভিত্তিক। ডিগবয় ক্ষেত্রভিত্তিক শোধনাগার এবং বারাউনি বাজার ভিত্তিক শোধনাগারে উদাহরণ।

2011 সালের জুন পর্যন্ত ভারতে 21টি তৈল শোধানাগার ছিল (চিত্র 7.6)। রাজ্যগুলো চিহ্নিত করো যেখানে তৈলশোধনাগারগুলো অবস্থিত।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (GAIL) 1984 সালে সরকার অধিকৃত ক্ষেত্র হিসাবে স্থাপিত হয়েছে যা প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন ও বিপনন করে। প্রাকৃতিক গ্যাস সব তৈলক্ষেত্রে তেলের সঙ্গে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বতন্ত্র ভান্ডারগুলো পূর্ব উপকূল (তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং তার সাথে ত্রিপুরা, রাজস্থান এবং গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পুরোদেশীয় কূপগুলোতে অবস্থিত।

রামনাথপুরমে (তামিলনাড়ুর) বিশাল গ্যাস ভান্ডারে সংকেত {Indications of huge gas reserves in Ramanathapuram (Tamil Nadu)}

সংবাদপত্রের তথ্য অনুসারে (দ্যা হিন্দু, 05.09.2006) রামনাথপুরম জেলার তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন প্রাকৃতিক গ্যাস ভান্ডারের সাম্ভাব্য অঞ্চল খুঁজে পেয়েছে। এই সমীক্ষাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ভান্ডারে ঠিক কী পরিমাণ গ্যাস রয়েছে তা কেবলমাত্র সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর জানা যাবে। কিন্তু সমীক্ষার পরিণাম উৎসাহজনক।

অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম টার্শিয়ারি যুগের পাললিক শিলায় রয়েছে। 1956 সালে তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন স্থাপনের পর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তৈল উত্তোলন ও উৎপাদক শুরু হয়েছে। তখন পর্যন্ত আসামের ডিগবয়ই একমাত্র তৈল উৎপাদক ক্ষেত্র ছিল, যদিও 1956 সালের পর এর প্রেক্ষাপট পরবর্তিত হয়। বর্তমানে দেশের পশ্চিমাংশের শেষ প্রান্তে এবং পূর্বাংশে নতুন তৈল ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। আসামের ডিগবয় নাহারকাটিয়া এবং মোরান হল গুরুত্বপূর্ণ তৈল উৎপাদক অঞ্চল। গুজরাটের প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলো হল আঙ্কলেশ্বর, কল্লোল, মেহসানা, নোয়াগ্রাম, কোসাম্বা এবং লুনেজ প্রভৃতি। 1973 সালে মুম্বাই হাই আবিষ্কৃত হয়েছে যা মুম্বাই থেকে

অ-প্রচলিত শক্তির উৎস (Non-Conventional Energy Sources)

জীবাশ্ম জ্বালানির উৎস, যেমন- কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পারমাণবিক শক্তি ক্ষয়শীল কাঁচামাল ব্যবহার করে। সুস্থিত শক্তির সম্পদগুলো হল কেবলমাত্র পূণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস যেমন সৌর, বায়ু, জল, ভূ-তাপ এবং জীবভর প্রভৃতি। এই শক্তির উৎসগুলো অধিকতর যথার্থভাবে বণ্টিত এবং পরিবেশ বান্ধব। প্রারম্ভিক খরচ ব্যয়িত হওয়ার পর অ-প্রচলিত শক্তির উৎসগুলো অধিক স্থিতিশীল, পরিবেশ বান্ধব তুলনামূলকভাবে সস্তা শক্তি প্রদান করে।

চিত্র 7.6 : ভারত–তেল শোধনাগার

পারমাণবিক শক্তি সম্পদ (Nuclear Energy Resources)

বর্তমান সময়ে দীর্ঘস্থায়ী উৎস হিসাবে পারমাণবিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলো হল ইউরেনিয়াম এবং থেরিয়াম। ইউরেনিয়াম সঞ্চিত রয়েছে ধারওয়ার শিলায়। ভৌগোলিকভাবে ইউরেনিয়ামের আকরিক সিংভূমের তামা বলয়ের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এটি রাজস্থানের উদয়পুর, আলোয়ার এবং ঝুনঝুনু জেলাতে, ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলা, মহারাষ্ট্রের বান্দরা জেলা এবং হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলাতেও পাওয়া যায়। থোরিয়াম প্রধানত কেরালা এবং তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলের সৈকত ভূমিতে প্রাপ্ত মোনাজাইট এবং ইলমেনাইট থেকে পাওয়া যায়। বিশ্বের সমৃদ্ধ মোনাজাইট কেরালার পালাক্কাড ও কোলাম জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশে বিশাখাপত্তনমের নিকটবর্তী এবং ওড়িশার মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে সঞ্চিত রয়েছে।

আনবিক শক্তি কমিশন স্থাপিত হয়েছিল 1948 সালে। কিন্তু এর অগ্রগতি 1954 সালে ট্রম্বেতে এটমিক এনার্জি ইনস্টিটিউট স্থাপনের পর শুরু হয় যা 1967 সালে ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার হিসাবে নতুনভাবে নামকরণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ আণবিক শক্তি প্রকল্পগুলো হল তারাপুর (মহারাষ্ট্র) কোটার নিকট রাওতভাটা (রাজস্থান), কালপক্কম (তামিলনাড়ু), নারোরা (উত্তরপ্রদেশ), কাইগা (কর্ণাটক) এবং কাকারাপাড়া (গুজরাট) প্রভৃতি।

সৌরশক্তি (Solar Energy)

আলোকভল্টীয় কোশে সূর্য রশ্মিকে আবদ্ধ করে শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায়, যা সৌর শক্তি নামে পরিচিত। আলোক ভল্টীয় এবং সৌর তাপীয় প্রযুক্তি দুটি কার্যকরী প্রক্রিয়া রূপে গ্রহণযোগ্য যা সৌর শক্তিকে সক্রিয়ভাবে আবদ্ধ করে রাখে। সর্বোপরি অন্যান্য অ-নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের তুলনায় সৌর তাপীয় শক্তির কিছু সুবিধা রয়েছে। এটির তুলনামূলক ব্যয় কম, পরিবেশ বান্ধব এবং সহজে নির্মাণ করা যায়। সৌর শক্তি কয়লা অথবা তৈল ভিত্তিক প্ল্যান্টের তুলনায় 7 শতাংশ অধিক প্রভাবশালী এবং পারমাণবিক প্ল্যান্টের তুলনায় 10 শতাংশ অধিক সক্রিয়। সাধারণত হিটার, ফসল শুষ্ককরন যন্ত্র (crop dryers) এবং কুকার প্রভৃতি যন্ত্রে এর অধিক ব্যবহার করা হয়। ভারতের পশ্চিম অংশে গুজরাট এবং রাজস্থানে সৌরশক্তির উন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়ু শক্তি (Wind Energy)

বায়ু শক্তি হল সম্পূর্ণ রূপে দূষণমুক্ত এবং অফুরন্ত শক্তির উৎস। প্রবাহিত বায়ুকে বায়ু শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া সহজ।

টারবাইনের মাধ্যমে বায়ুর গতি শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। স্থায়ী বায়ু প্রবাহ যেমন নিয়ত বায়ু, পশ্চিমাঝঞ্ঝা এবং ঋতুগত বায়ু উদাহরণস্বরূপ, মৌসুমী বায়ুকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এগুলো ছাড়াও স্থানীয় বায়ু, স্থলবায়ু এবং সমুদ্র বায়ুকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভারত ইতোমধ্যে বায়ু শক্তি উৎপাদন করা শুরু করে দিয়েছে। প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রয়োজন অনুসারে 12টি কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে যেখানে লক্ষপূর্ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে মোট 45 মেগাওয়াট ক্ষমতার জন্য 250টি বায়ু চালিত টারবাইন স্থাপন করা হয়েছে। অপ্রচলিত শক্তির উৎস মন্ত্রক ভারতে তৈল আমদানি বিলের বোঝা কমানোর জন্য বায়ু শক্তির উন্নতি ঘটাচ্ছে। আমাদের দেশে বায়ু শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা 50,000 মেগাওয়াটের বেশি যার এক চতুর্থাংশ সহজে কাজে লাগানো যাবে। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র কর্ণাটকে বায়ু শক্তির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।

জোয়ার ও তরঙ্গ শক্তি (Tidal and Wave Energy)

মহাসাগরীয় স্রোত হল অপরিমিত শক্তির ভান্ডার। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অনবরত জোয়ারি তরঙ্গ এবং সমুদ্র স্রোত থেকে অধিক কার্যকরী শক্তি প্রবাহ উৎপাদনের জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলছে।

ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর বৃহত্তর জোয়ারি তরঙ্গ দেখা যায়। যদিও ভারতে উপকূল অঞ্চল বরাবর জোয়ারি শক্তির উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এখনও এর প্রয়োগ হয়নি।

ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy)

যখন ভূ-গর্ভ থেকে ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে, তখন অত্যধিক তাপ নির্গত হয়। এই তাপ শক্তিকে আবদ্ধ করে সফলভাবে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এছাড়াও গিজার কূপ থেকে ফোয়ারার মতো নির্গত উষ্ণ জলকে ব্যবহার করে তাপ শক্তি উৎপাদন করা যায়। এটি ভূ-তাপীয় শক্তি নামে পরিচিত। এই শক্তিকে এখন একটি প্রধান শক্তির উৎস হিসাবে গণ্য করা হয় যা বিকল্প উৎস হিসাবে বিকশিত করা যেতে পারে। মধ্যযুগ থেকেই উষ্ণ প্রসবন (hot springs) এবং গিজারের ব্যবহার হয়ে আসছে। ভারতে ভূ-তাপীয় শক্তি প্ল্যান্ট হিমাচল প্রদেশের মনিকরণে স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

> ভূ-গর্ভস্থ তাপের ব্যবহারের প্রথম সফর চেষ্টা (1890) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইদাহোর বোয়েজে শহরে হয়েছিল যেখানে উষ্ণ জলের পাইপের নেটওয়ার্ক (network) তৈরি করা হয়েছিল যার সাহায্যে চারপাশের ভবনগুলোতে তাপ দেওয় হত। এই প্ল্যান্টটি এখনও কাজ করছে।

জৈব শক্তি (Bio-energy)

জৈব শক্তি বলতে সেই শক্তিকে বোঝায় যা জৈবিক পদার্থ থেকে আসে যেমন কৃষিক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ, পৌরনিগম, শিল্প ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ। শক্তি পরিবর্তনের এক সম্ভাব্য উৎস হল জৈব শক্তি। একে বৈদ্যুতিক শক্তি, তাপীয় শক্তি অথবা রান্নার গ্যাসে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। অবশিষ্টাংশ এবং বর্জ্য পদার্থকে প্রক্রিয়াজাত করে শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। এটি উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের আর্থিক জীবনের উন্নতি ঘটাতে পারে, পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে, স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে এবং জ্বালানি কাঠের ওপর চাপ হ্রাস করে। পৌরনিগমের আবর্জনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি প্রকল্প দিল্লির ওখলাতে অবস্থিত।

খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of Mineral Resources)

স্থিতিশীল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জের জন্য আর্থিক উন্নতির সাথে পরিবেশগত বিষয়কেও সমন্বয় করা প্রয়োজন। চিরাচরিত প্রথায় সম্পদের ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা উৎপাদিত হয় এবং পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। অতএব স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে বোঝায় ভাবী প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করা। সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন জরুরী। বিকল্প শক্তির উৎস যেমন– সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, তরঙ্গ শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তিগুলো হল অফুরন্ত সম্পদ। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের পরিবর্তে এগুলোর উন্নয়ন করা যেতে পারে। ধাতব খনিজের ক্ষেত্রে অবশিষ্টাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে ধাতুর পুন:ব্যবহার করা যেতে পারে। তামা, সীসা এবং দস্তার ক্ষেত্রে অবশিষ্টাংশ ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতে এগুলোর ভান্ডার অপর্যাপ্ত। দুর্লভ ধাতুর পরিপূরক দ্রব্যের ব্যবহার এদের ভোগকে হ্রাস করতে পারে। সামরিক ও দুর্লভ খনিজের রপ্তানি অবশ্যই কমাতে হবে, তাহলে বিদ্যমান ভান্ডার অনেক সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

   (i) নীচের কোন্ রাজ্যে প্রধান তৈল ক্ষেত্রগুলো অবস্থিত?

   (a) আসাম (c) রাজস্থান

   (b) বিহার (d) তামিলনাড়ু

   (ii) নিম্নলিখিত কোন্ স্থানে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল?

   (a) কালপক্কম (c) রানা প্রতাপ সাগর

   (b) নারোর (d) তারাপুর

   (iii) নিম্নের কোন্ খনিজটি খয়েরি হীরা নামে পরিচিত?

   (a) লোহা (c) ম্যাঙ্গানিজ

   (b) লিগনাইট (d) অভ্র

   (iv) নীচের কোন্‌টি অ-প্রচলিত শক্তির উৎস?

   (a) জল (c) তাপ

   (b) সৌর (d) বায়ু শক্তি

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

   (i) ভারতে অভ্র বন্টনের একটি বিবরণ দাও।

   (ii) পারমাণবিক শক্তি কী? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো উল্লেখ করো।

   (iii) অ-লোহবর্গীয় ধাতুর নাম লেখো। তাদের স্থানিক বন্টন আলোচনা করো।

   (vi) অ-প্রচলিত শক্তির উৎসগুলো কী কী?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

   (i) ভারতের খনিজ তেল সম্পদের ওপর বিস্তৃত টিকা লেখো।

   (ii) ভারতে জলবিদ্যুতের ওপর একটি রচনা লেখো।

একক III

অধ্যায় 8

শ্রম শিল্প (MANUFACTURING INDUSTRIES)

আমরা আমাদের চাহিদা পূরণ করতে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে থাকি। কৃষিজ উৎপাদিত বস্তু যেমন গম, ধান প্রভৃতি আমাদের ভোগ করার পূর্বে আটা এবং চাল হিসাবে তৈরি করতে হয়। কিন্তু রুটি এবং চাল ছাড়াও আমাদের পোষাক, বই, পাখা, গাড়ি, ঔষধ প্রভৃতিও প্রয়োজন হয় এবং এগুলো বিভিন্ন শিল্প কারখানায় উৎপাদিত হয়। আধুনিক যুগে এই শিল্পগুলো অর্থনীতির খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই শিল্পোদ্যোগুলো বিশাল শ্রমশক্তিকে কর্মসংস্থান দেয় এবং মোট জাতীয় সম্পদ/আয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

শিল্পের শ্রেণিবিভাগ (Types of Industries)

শিল্পগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। আকার, মূলধন বিনিয়োগ এবং নিযুক্ত শ্রমশক্তির ওপর ভিত্তি করে শিল্পসমূহকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। মালিকানার ভিত্তিতে শিল্পগুলোকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয় যথা– (i) সরকারি ক্ষেত্র (ii) বেসরকারি ক্ষেত্র এবং (iii) যৌথ ও সমবায় ক্ষেত্র। সরকারি উদ্যোগ ক্ষেত্র হল সরকার/রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংস্থা অথবা সরকার পরিচালিত নিগম। সাধারণত সামরিক ও জাতীয় গুরুত্বের শিল্পগুলো সরকারি ক্ষেত্রের আয়ত্তাধীন পণ্যের ব্যবহারের ভিত্তিতে শিল্পগুলোকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (i) মুখ্য পণ্য শিল্প, (ii) মূলধনি পণ্যশিল্প, (iii) মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প এবং (iv) ভোক্তাসাধন পণ্য শিল্প।

বিভিন্ন উদ্যোগের দ্বারা ব্যবহৃত কাঁচামালের ভিত্তিতে শিল্পগুলোকে অন্য পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়। সেই অনুসারে এগুলো হতে পারে ঃ (i) কৃষিভিত্তিক শিল্প, (ii) বনজসম্পদ ভিত্তিক শিল্প, (iii) খনিজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প, (iv) উদ্যোগ দ্বারা নির্মিত কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্প।

উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আরেকটি প্রচলিত শ্রেণিবিভাগে শিল্পগুলোকে বিভক্ত করা যায়। শিল্পের আটটি শ্রেণিকে এভাবে শনাক্ত করা যায়, যথা– (1) ধাতব শিল্প, (2) যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, (3) রাসায়নিক এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্প, (4) বস্ত্রশিল্প, (5) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, (6) বিদ্যুৎ উৎপাদন, (7) বৈদ্যুতিন এবং (8) যোগাযোগ শিল্প। তোমরা শিকড় আলগা শিল্প সম্পর্কেও কখনও পড়ে থাকতে পারো। এগুলো কী? কাঁচামালের অবস্থানের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

শিল্পের অবস্থান (Location of Industries)

তোমরা কি পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের কারণগুলো অনুমান করতে পারো? উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং গুজরাটে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প নেই কেন?

শিল্পগুলোর অবস্থান কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বিদ্যুৎ, বাজার, মূলধন, পরিবহণ এবং শ্রমিক ইত্যাদির মতো কিছু কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব সময় এবং স্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়। কাঁচামাল এবং শিল্পের ধরনের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শ্রমশিল্পগুলোকে এমন এক জায়গায় স্থাপন করা প্রয়োজন যেখানে উৎপাদন মূল্য ও ভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত পণ্যগুলোর বিতরণ মূল্য সবচেয়ে কম হয়। পরিবহণ ব্যয় অনেকাংশে কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। শিল্পগুলোর অবস্থানকে প্রভাবিত করার কারণগুলোর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

কাঁচামাল (Raw Materials)

ওজন হ্রাসশীল কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্পসমূহ সে সকল অঞ্চলে স্থাপন করা হয় যেখানে কাঁচামাল পাওয়া যায়। কেন ভারতের চিনি কলগুলো আখ উৎপাদন অঞ্চলে অবস্থিত? একইভাবে, মন্ডশিল্প (pulp industry), তামা বিগলন শিল্প (copper smelting) এবং পিগ আয়রন ইত্যাদি শিল্প তাদের কাঁচামাল প্রাপ্তির স্থানের নিকট অবস্থিত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলোতে (pig iron) লৌহ আকরিক এবং কয়লা উভয়ই ওজনহ্রাসশীল কাঁচামাল, সুতরাং লৌহ ইস্পাত শিল্পের জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থানটি কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি হওয়া উচিত। এ কারণেই বেশিরভাগ লোহা ও ইস্পাত শিল্পগুলো কয়লাক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত হয় (বোকারো, দুর্গাপুর ইত্যাদি) বা লৌহ আকরিকের উৎসের নিকটে অবস্থিত (ভদ্রাবতী, ভিলাই এবং রাউরকেল্লা)। একইভাবে ক্ষয়িষ্ণু কাঁচামালভিত্তিক শিল্পগুলোও কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি অবস্থিত।

শক্তি (Power)

শক্তি যন্ত্রগুলোর চালনাশক্তি প্রদান করে এবং তাই শিল্পস্থাপনের আগে শক্তি সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। যাই হোক, কিছু শিল্প যেমন অ্যালুমিনিয়াম এবং কৃত্রিম নাইট্রোজেন উৎপাদন শিল্পগুলো শক্তির উৎসের নিকটে স্থাপন করার প্রবণতা রয়েছে, কারণ এগুলো শক্তি নির্ভর এবং বিপুল পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।

বাজার (Market)

বাজারগুলো উৎপাদিত পণ্যের জন্য নির্গমন পথের ব্যবস্থা করে। ভারী যন্ত্র, যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম, ভারী রাসায়নিক শিল্পগুলো উচ্চ চাহিদাযুক্ত অঞ্চলগুলোর নিকটে অবস্থিত হয়, কারণ এগুলো বাজার কেন্দ্রিক হয়। কার্পাস বয়ন শিল্প ওজন হ্রাসশীল নয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঁচামাল ব্যবহার করে এবং সাধারণত বড়ো শহরের কেন্দ্রে স্থাপিত হয়, উদাহরণ– মুম্বাই, আহমেদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি। অপরিশোধিত তেলের পরিবহণ সহজসাধ্য এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি পণ্য অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পেট্রোলিয়াম শোধনাগারগুলোও বাজারের নিকটে অবস্থিত। কয়ালি, মথুরা এবং বারাউনি শোধনাগার হল এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বন্দরগুলোও তেল শোধনাগারগুলোর অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবহণ (Transport)

তোমরা কি কখনও মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি এবং কলকাতার আশেপাশে শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছ? এটি একারণেই হয়েছিল যে এগুলো প্রাথমিকভাবে পরিবহণের সংযোগস্থলের প্রধান বিন্দু হয়ে ওঠেছিল। একমাত্র রেলপথ স্থাপন করার পরই শিল্পগুলো অভ্যন্তরীণ অবস্থানগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সমস্ত মুখ্য শিল্প কারখানাগুলো প্রধান রেলপথের কাছে অবস্থিত।

শ্রম (Labour)

আমরা কি শ্রম ছাড়া শিল্পের কথা ভাবতে পারি? শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ভারতে শ্রম পুরোপুরি গতিশীল এবং আমাদের বিশাল জনসংখ্যার কারণে তা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক কারণসমূহ (Historical Factors)

তোমরা কি কখনও মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইকে শিল্প কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠার কারণগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এই স্থানগুলো আমাদের অতীত ঔপনিবেশিক দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত ছিল। ঔপনিবেশিককালের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, উৎপাদন কার্যাবলিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত নতুন উদ্দীপনা রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ভাদোহি, সুরাট, ভাদোদরা, কেজিকোড, কোয়েম্বাটুর, মাইশোর ইত্যাদি স্থানগুলো গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে উত্থিত হয়েছিল। ঔপনিবেশবাদের পরবর্তী শিল্প পর্যায়ে ব্রিটেনের উৎপাদিত পণ্যগুলোর প্রতিযোগিতা এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বৈষম্যমূলক নীতির কারণে এই উৎপাদনগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ঔপনিবেশবাদের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশরা নির্বাচিত অঞ্চলে কয়েকটি শিল্পকে উন্নীত করেছিল। এটি দেশের বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বৃহত্তর স্থানিক বিস্তার ঘটায়।

শিল্পনীতি (Industrial Policy)

গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ার ফলে ভারতের লক্ষ্য হল সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা।

ভিলাই এবং রাউরকেল্লায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপন দেশের পিছিয়ে পড়া উপজাতি অঞ্চলের উন্নয়নের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। বর্তমানে ভারত সরকার অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্পস্থাপনে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করে।

মুখ্য শিল্প (Major Industries)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যে কোনো দেশের শিল্প বিকাশের প্রাথমিক উপাদান। বস্ত্রবয়ণ শিল্প আমাদের এক ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প। ব্রিটিশ যুগ থেকে চিনি শিল্প স্থানীয় কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে সাফল্য অর্জন করে। এছাড়া অত্যাধুনিক পেট্রোরাসায়নিক শিল্প এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্প এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (The Iron and Steel Industry)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ভারতে দ্রুত শিল্প বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। ভারতীয় শিল্পের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র তাদের মৌলিক পরিকাঠামোর জন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ওপর নির্ভর করে। আমরা কি কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি লোহা ছাড়া তৈরি করতে পারি?

লৌহ আকরিক এবং কোক কয়লা ছাড়াও অন্যান্য কাঁচামাল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যেমন চুনাপাথর, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ এবং পোড়ামাটি। এই সমস্ত কাঁচামাল স্থূল (ওজন হ্রাসশীল) প্রকৃতির, অতএব কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি অবস্থানই হল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য সর্বোত্তম স্থান। ভারতের ছত্তিশগড়, ওড়িশার উত্তরাংশ, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের কিছু অংশ নিয়ে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের অঞ্চল রয়েছে যা উচ্চমানের লৌহ আকরিক, উচ্চগুণমান সম্পন্ন কোক কয়লা এবং অন্যান্য পরিপূরক কাঁচামালগুলোতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বড়ো ইস্পাত কারখানাগুলোর সাথে সাথে ছোটো ইস্পাত কারখানাগুলো নিয়ে গঠিত। এতে গৌণ উৎপাদক, চলমান কারখানা (rolling mills) এবং আনুষঙ্গিক শিল্পগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

সমন্বিত ইস্পাত কারখানা (Integrated Steel Plants)

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (TISCO)

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কারখানাটি মুম্বাই-কলকাতা রেলপথের নিকটে অবস্থিত এবং ইস্পাত রপ্তানির জন্য প্রায় 240 কিমি দূরে নিকটতম বন্দর কলকাতা রয়েছে। সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদী থেকে এই কেন্দ্রে জল সরবরাহ করা হয়। নোয়ামুন্ডি ও বাদাম পাহাড় থেকে আকরিক লোহা প্রাপ্ত হয় এবং কয়লা ওড়িশার যোদা খনি থেকে আনা হয়। কোক কয়লা ঝরিয়া এবং পশ্চিম বোকারোর কয়লা ক্ষেত্র থেকে আসে।

ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (IISCO)

ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির প্রথম কারখানাটি হীরাপুর এবং পরবর্তী সময়ে কুলটিতে স্থাপিত হয়। 1937 সালে বেঙ্গাল স্টিল করপোরেশন এর সহযোগিতায় গঠিত হয় IISCO এবং বার্নপুর (পশ্চিমবঙ্গে) আরেকটি লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সংস্থা স্থাপিত হয়। IISCO এর অধীনে এই তিনটি কারখানা দামোদর ভ্যালির কয়লাক্ষেত্র (রানিগঞ্জ, ঝরিয়া এবং রামগড়) নিকটে অবস্থিত। লৌহ আকরিক ঝাড়খন্ডের সিংভূম থেকে আসে দামোদরের উপনদী বরাকর নদী থেকে জল সরবরাহ করা হয়। কলকাতা-আসানসোল রেলপথের নিকটে সব উৎপাদন কারখানা স্থাপিত। দুর্ভাগ্যক্রমে 1972-73 সালে IISCO থেকে ইস্পাত উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল এবং কারখানাগুলো ভারত সরকারের অধীনে চলে আসে।

বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড (VISL)

তৃতীয় সমন্বিত ইস্পাত কেন্দ্র, বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস, সম্প্রতি মাইশোর আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কস নামে পরিচিত, বাবাবুদান পাহাড়ের কেমানগুন্ডি খনির লৌহ আকরিক উৎপাদন কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত। চুনাপাথর এবং ম্যাঙ্গানিজও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য। কিন্তু এই অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না। প্রথমদিকে কাছাকাছি বনজঙ্গাল থেকে প্রাপ্ত কাঠ পুড়িয়ে চারকোল তৈরি করা হত। যা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত।। কিছুদিন পরে বৈদ্যুতিক চুল্লি লাগানো হয়, তাতে যোগ জলপ্রপাত জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা হয়। কারখানায় ভদ্রাবতী নদীর জল সরবরাহ করে। এই কারখানায় উন্নতমানের ইস্পাত এবং সংকর ইস্পাত তৈরি করা হয়।

চিত্র 8.1 : ভারত—লৌহ ও ইস্পাত কারখানা

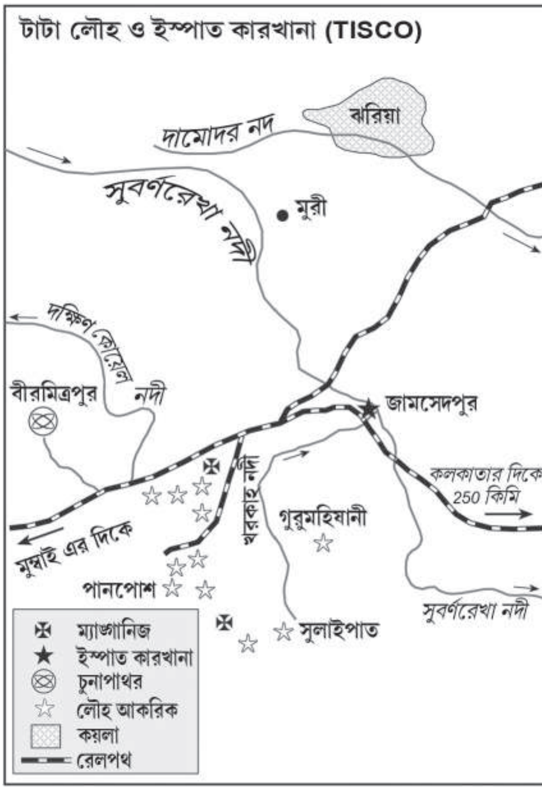

চিত্র : 8.2

চিত্র : 8.3

চিত্র : 8.4

চিত্র : 8.5

চিত্র : 8.6

চিত্র : 8.7

চিত্র : 8.8

স্বাধীনতার পরে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1956-61), বিদেশী সহযোগিতায় তিনটি নতুন সমন্বিত ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয় ঃ ওড়িশার রাউলকেল্লা, ছত্তিশগড়ের ভিলাই এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর। এই সরকারি কারখানাগুলো হিন্দুস্তান লিমিটেড (HSL) এর অধীনে ছিল। 1973 সালে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL) কারখানাগুলো পরিচালনা করার জন্য গঠন করা হয়েছিল।

রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট (Rourkela Steel Plant)

রাউলকেল্লা ইস্পাত কারখানাটি জার্মানির সহায়তায় 1959 সালে ওড়িশার সুন্দরগড় জেলায় স্থাপিত হয়। এই কারখানা কাঁচামালের নৈকট্যের ওপর নির্ভর করে স্থাপিত হয়। এইভাবে, ওজন হ্রাসশীল কাঁচামালের পরিবহণ মূল্য কম হয়। এই কারখানার এক অনন্য স্থানীয় সুবিধা রয়েছে, যেমন এটি ঝাড়খন্ডের ঝরিয়া থেকে কয়লা এবং সুন্দরগড় ও কেন্দুঝার থেকে লৌহ আকরিক আনে। হীরাকুঁদ প্রকল্পটি বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং কোয়েল ও শঙ্খ নদী থেকে জল পাওয়া যায়।

ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট (Bhilai Steel Plant)

রাশিয়ার সহায়তায় ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলায় ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টটি স্থাপিত হয় এবং 1959 সালে এর উৎপাদন শুরু হয়েছিল। লৌহ আকরিক ডাল্লি-রাজহার খনি থেকে (চিত্র 8.6) এবং কয়লা কোরবা ও কারগালি কয়লাক্ষেত্র থেকে আসে। তুন্ডুলা বাঁধ থেকে জল পাওয়া যায় এবং কোরবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই কারখানাটি কলকাতা-মুম্বাই রেলপথের নিকটে অবস্থিত। উৎপাদিত ইস্পাতের বেশিরভাগ অংশ বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্থান সিপার্ডে চলে যায়।

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (Durgapur Steel Plant)

ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাটি স্থাপিত হয় এবং 1962 সালে এর উৎপাদন শুরু হয়। এই কারখানাটি রানিগঞ্জ ও ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত এবং আকরিক লৌহ নোয়ামুন্ডি (চিত্র 8.7) থেকে আনা হয়। দুর্গাপুর কলকাতা-দিল্লি রেলপথের নিকটে অবস্থিত। জলবিদ্যুৎ ও জল দামোদর ভ্যালি করপোরেশন (DVC) থেকে পাওয়া যায়।

বোকারো ইস্পাত কারখানা (Bokaro Steel Plant)

রাশিয়ার সহযোগিতায় 1964 সালে বোকারোতে ইস্পাত কারখানাটি স্থাপিত হয়। পরিবহন ব্যয় হ্রাস করার নীতির ওপর এই কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছিল সেই অনুসারে বোকারো-রাউরকেল্লাকে সংযুক্ত করা হয়েছিল যার মাধ্যমে রাউরকেল্লা থেকে আকরিক লৌহ আনা হয় এবং যাওয়ার সময় মালগাড়িগুলো করে রাউরকেল্লার জন্য কয়লা নিয়ে যায়। অন্যান্য কাঁচামাল বোকারো প্রায় 350 কিলোমিটার পরিধির ভিতরেই পেয়ে যায়। দামোদর ভ্যালি করপোরেশন (DVC) জল এবং জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

অন্যান্য ইস্পাত কারখানা (Other Steel Plants)

চতুর্থ পরিকল্পনায় স্থাপিত নতুন ইস্পাত কারখানাগুলো প্রধান কাঁচামাল উৎস থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তিনটি কারখানার সবগুলোই দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের ভাইজাগ স্টিল কারখানা হল প্রথম বন্দরভিত্তিক কারখানা যার কার্যকারিতা 1992 সালে শুরু হয়েছিল। এই বন্দরের অবস্থান খুব সুবিধাজনক ছিল।

কর্ণাটকের হসপেটে বিজয়নগর ইস্পাত কারখানাটি দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বনে এটি স্থানীয় লৌহ আকরিক এবং চুনাপাথর ব্যবহার করে থাকে। তামিলনাড়ুর সালেম ইস্পাত কারখানাটি 1982 সালে অনুমোদিত হয়েছিল।

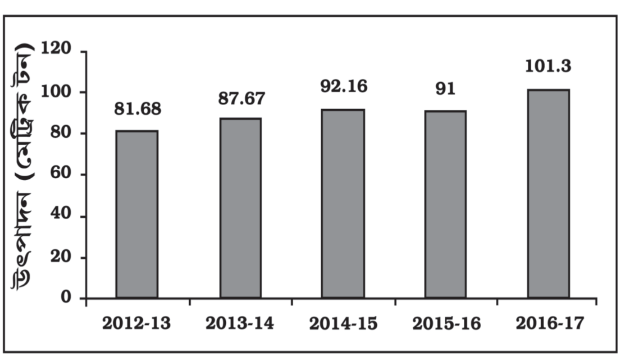

উৎস : *Ministry of Steel, Government of India*

চিত্র 8.9 : নির্মিত ইস্পাতের উৎপাদন

এই প্রধান ইস্পাত কারখানাগুলো ছাড়াও, দেশের বিভিন্ন জায়গায় 206 টিরও বেশি কারখানা রয়েছে। এদের বেশিরভাগ প্রধান কাঁচামাল হিসাবে লৌহ বর্জিত অংশ ব্যবহার করে এবং এইগুলো বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

কার্পাস বয়ন শিল্প (The Cotton Textile Industry)

কার্পাস বয়ন শিল্প ভারতের চিরাচরিত শিল্প। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে, এই শিল্পকে কুটির শিল্পে ব্যবহার করা হত। ভারত অতি উৎকৃষ্টমানের সুতি কাপড় মসলিন, ক্যালিকস (বিশেষ বস্ত্র), রঙিন ছিট কাপড় এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ভালো গুণমানের সুতিকাপড় উৎপাদনে বিশ্বব্যাপি বিখ্যাত ছিল। ভারতে এই শিল্পের উন্নতি বেশ কয়েকটি কারণেই হয়েছিল। প্রথমত, এটি একটি ক্রান্তীয় দেশ এবং তুলা উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক তন্তু। দ্বিতীয়ত, ভারতে বিপুল পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়। এই দেশে শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। আসলে, কিছু অঞ্চলের জনগণ বংশপরম্পরায় সুতিবস্ত্র তৈরি করছিল এবং তাদের দক্ষতা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের দক্ষতা এই প্রক্রিয়াটিকে আরও নিখুঁত করে তোলে।

প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশরা দেশীয় সুতি বস্ত্র শিল্প বিকাশের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করেনি। তারা মানচেস্টার এবং লিভারপুলের কারখানাগুলোতে কাঁচাতুলা রপ্তানি করত এবং প্রস্তুত পণ্যগুলো ভারতে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসত। এই কাপড়ই সস্তা ছিল কারণ এটি ভারতের কুটির ভিত্তিক শিল্পের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারখানায় ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত হত।

1854 সালে মুম্বাই-এ প্রথম আধুনিক কাপড়ের কারখানাটি স্থাপিত হয়। সুতির বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের বেশ কয়েকটি সুবিধা ছিল। এই অঞ্চলটি গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের খুব কাছাকাছি ছিল। ইংল্যান্ড নিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁচা তুলা মুম্বাই বন্দরে আনা হত। অতএব, মুম্বাই শহরে সহজেই তুলা পাওয়া যেত। উপরন্তু মুম্বাই ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং একটি শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সেখানে পাওয়া যেত। একটি বিশাল শহর হিসাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক আকৃষ্ট হত। সুতরাং, সেখানে সস্তা এবং সুলভ শ্রমিকও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ছিল। সুতি বস্ত্র কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা

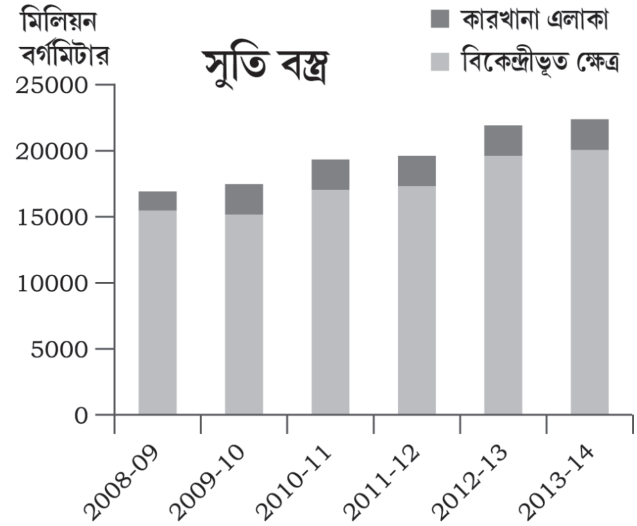

উৎস : *Annual Report 2013-14, (CITI)*

চিত্র 8.10 : সুতি বস্ত্রের উৎপাদন

বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে সুতা কাটা

হস্তচালিত কার্পাস বয়ন শিল্প

চিত্র 8.11 : কার্পাস বয়ন শিল্প

হত। পরবর্তীকালে আরও দুটো মিল যেমন শাহপুর মিল এবং কালিকো মিল আহমেদাবাদে স্থাপিত হয়। 1947 সালে ভারতে কারখানার সংখ্যা 423টি পর্যন্ত হয়েছিল কিন্তু দেশ ভাগের পর দৃশ্যপট পাল্টে যায় এবং এই শিল্পগুলো এক বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর কারণ হল অধিকাংশ ভালো গুণসম্পন্ন কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে চলে যায় এবং ভারতে 409টি কারখানা এবং শুধুমাত্র 29 শতাংশ কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল থেকে যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে শিল্পগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং অবশেষে উন্নতি লাভ করে।

ভারতের বস্ত্র বয়ন শিল্পগুলো বিশদভাবে দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়, যথা– সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র। হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত কাপড় (খাদি সহ) এবং শক্তিচালিত তাঁতে উৎপাদিত কাপড় বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন 81 শতাংশ হ্রাস পায় যা 2000 সালে প্রায় 6 শতাংশ এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে, বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রে শক্তিচালিত তাঁতগুলো হস্তচালিত তাঁতের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে ।

সুতা হল একটি 'বিশুদ্ধ' কাঁচামাল যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ওজন হ্রাস করে না। সুতরাং অন্যান্য কারণগুলোর মতো, তাঁত চালানোর শক্তি, শ্রমিক, মূলধন ও বাজার প্রভৃতি শিল্পের অবস্থান নির্ধারণ করে। বর্তমানে এই শিল্পটিকে বাজারে অথবা বাজারের কাছাকাছি স্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায় এবং বাজারের নিকটবর্তী হওয়ায়, শিল্পে কোন্ ধরনের কাপড় উৎপাদিত হবে তা বাজারই স্থির করে দেয়। এছাড়াও বাজারের জন্য তৈরি পণ্যগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। অতএব, বাজারের নিকটবর্তী কারখানাগুলোর অবস্থানের গুরুত্ব অনেক বেশি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বাই এবং আহমেদাবাদে প্রথম কারখানাগুলো স্থাপন করার পর বস্ত্র বয়ন শিল্প খুব দ্রুত প্রসারিত হয়। নাটকীয়ভাবে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন এই শিল্পে বেশি উৎসাহ প্রদান করেছিল, যেমন–ভারতীয় পণ্যের স্বপক্ষে ব্রিটিশদের তৈরি পণ্যের বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিল। 1921 সালের পর রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে অন্যান্য বস্ত্রবয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলো দ্রুত প্রসারিত হয়। দক্ষিণ ভারতের, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই এবং ব্যাঙ্গালুরুতে কারখানাগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। মধ্যভারতে, নাগপুর, ইন্দোর, শোলাপুর এবং ভাদোদরা বস্ত্র বয়ন শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হয়। কানপুরের বস্ত্র বয়ন মিলগুলো স্থানীয় বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়। বন্দর এর সুবিধার ওপর ভিত্তি করে কলকাতার মিলগুলো স্থাপিত হয়েছিল। জলবিদ্যুতের উন্নয়নও কার্পাস উৎপাদক ক্ষেত্র থেকে দূরে সূতি বস্ত্র মিলগুলোর অবস্থানকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। কারখানাগুলোর জন্য প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ শক্তির সহজলভ্যতার কারণে তামিলনাড়ুতে-এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। উজ্জয়ন, ভারুচ, আগ্রা, হাতরস, কোয়েম্বাটুর এবং তিরুনেলভেলির মতো কেন্দ্রে শ্রমিকের মূল্য কম হওয়ার কারণে কার্পাস উৎপাদক ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা স্বত্ত্বেও এই শিল্প স্থাপন করা হয়েছে।

এইভাবে বস্ত্র বয়ন শিল্প ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে স্থাপিত হয়, যেখানে শিল্পস্থাপনে এক বা একাধিক সুবিধাজনক পরিবেশ বিদ্যমান। এরূপ কাঁচামালের স্থানে বাজার অথবা সুলভ শ্রমিক অথবা শক্তির প্রাচুর্যতা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বর্তমানে, আহমেদাবাদ, ভিবান্তি, শোলাপুর, কোলাপুর, নাগপুর, ইন্দোর এবং উজ্জয়ন সূতিবস্ত্র শিল্পের মুখ্য কেন্দ্র। এই ধরনের কেন্দ্রগুলো গতানুগতিক কেন্দ্র ছিল এবং কার্পাস উৎপাদক কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ু মুখ্য কার্পাস উৎপাদক রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং পাঞ্জাব অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্পাস উৎপাদক রাজ্য (চিত্র 8.11)।

তামিলনাড়ু রাজ্যে অধিক সংখ্যায় কল (মিল) রয়েছে এর মধ্যে অধিকাংশ কাপড়ের বদলে সূতা উৎপাদন করে। কোয়েম্বটুর খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে অর্ধেকেরও বেশি মিলগুলো অবস্থিত। চেন্নাই, মাদুরাই, তিরুলেনভেলি, তুতিকোরিন, থাঞ্জাভুর, রামনাথপুরম ও সালেম অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কর্ণাটকে সূতিবস্ত্র কেন্দ্রের বিকাশ ঔ রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকের কার্পাস উৎপাদক ক্ষেত্রে ঘটেছে। দেবনগরি, হাভেলি, বেল্লারি, মাইশোর এবং ব্যাঙ্গালুরু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তেলেঙ্গানা প্রদেশের সুতি বস্ত্র শিল্প কেন্দ্র কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ মিলগুলো সুতা কাটার মিল (spinning mills) যেগুলো সুতা উৎপাদন করে থাকে। হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ এবং তেলেঙ্গানার ওরানগল ও অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র।

উত্তরপ্রদেশ এবং কানপুর সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র। কিছু গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্র হল মোদিনগর, হাতরস, সাহারানপুর, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ। পশ্চিমবঙ্গে সুতি কলগুলো হুগলি অঞ্চলে অবস্থিত। হাওড়া,

শ্রীরামপুর, কলকাতা ও শ্যামনগর এখানকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

স্বাধীনতার পর থেকে সুতিবস্ত্রের উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়ে যায়। কৃত্রিম বস্ত্রের সাথে সুতিবস্ত্রকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারতে বস্ত্রবয়ন শিল্পগুলোর অন্যান্য সমস্যাগুলো কী কী?

চিনি শিল্প (Sugar Industry)

চিনি শিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিভিত্তিক শিল্প। বিশ্বে আখ এবং চিনি উৎপাদনের সবচেয়ে বড়ো দেশ হল ভারত এবং ভারত বিশ্বের চিনি উৎপাদনের 8 শতাংশ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া, আখ থেকে খান্ডেসরি ও গুড় (Jagggery) তৈরি করা হয়। এই শিল্প প্রত্যক্ষভাবে 4 লক্ষের বেশি লোক এবং অপ্রত্যক্ষভাবে বড়ো সংখ্যায় কৃষকদের কর্মসংস্থান প্রদান করে। ঋতুভিত্তিক কাঁচামালের কারণে চিনিশিল্প একটি ঋতু ভিত্তিক শিল্প।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই শিল্পের বিকাশ 1903 সালে শুরু হয়, যখন বিহারে চিনি কল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে চিনিকল স্থাপিত হয়। 1950-51 সালে 139টি কারখানায় ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। 2010-11 সালে তা বেড়ে 662 তে দাঁড়ায়।

চিনি শিল্পের অবস্থান (Location of the Sugar Industry)

আখ এক প্রকার ওজন হ্রাসশীল ফসল। চিনি ও আখের অনুপাত 9 থেকে 12 শতাংশ এর মধ্যে হয় যা তার গুণমানের ওপর নির্ভর করে থাকে। খেত থেকে কেটে একত্রিত করে মালবহন করা অব্দি শর্করার মাত্রা শুকিয়ে যেতে থাকে। আখের খেত থেকে ফসল কাটার 24 ঘন্টার মধ্যে যদি কারখানায় পৌঁছায় তবে অধিক চিনি পাওয়া যায়। অতএব, সকল চিনি কারখানা আখ উৎপাদক খেতের নিকট অবস্থিত।

মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে চিনি উৎপাদক রাজ্য হিসাবে অগ্রনী ভূমিকা অর্জন করে এবং দেশের মোট চিনি উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে থাকে।

উত্তরপ্রদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি উৎপাদক অঞ্চল, চিনি কারখানাগুলো দুটি বলয়ে কেন্দ্রীভূত- গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এবং তরাই অঞ্চল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মুখ্য চিনি উৎপাদক অঞ্চলগুলো হল সাহারানপুর, মুজাফফরনগর, মিরাট, গাজিয়াবাদ, বাঘপত এবং বুলন্দশহরের জেলাসমূহ, যেখানে তরাই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ চিনি উৎপাদক অঞ্চলগুলো হল খেরি লাখিমপুর, বাস্তি, গোন্ডা, গোরখপুর, বাহরাইচ ইত্যাদি।

তামিলনাড়ুর চিনি কারখানাগুলো কোয়েম্বাটুর ভেলোর, তিরুবনমালাই, বিল্লুপুরম এবং তিরুচিরাপল্লি জেলায় অবস্থিত। কর্ণাটকের বেলাগাভি, বেল্লারিম মান্ডুয়া, শিবমোগ্গা বিজয়াপুরা এবং চিত্রদুর্গ জেলায় বেশিরভাগ চিনি উৎপাদক অঞ্চলগুলো অবস্থিত। এই শিল্প উপকূলীয় অঞ্চলের পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায় এবং নিজামবাদ ও তেলেঙ্গানার মেড়ক জেলায় বন্টিত রয়েছে।

বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট অন্যান্য চিনি উৎপাদক রাজ্য। বিহারের সারান, চম্পারন মুজফফরনগর, সিবান, দারভাঙ্গা ও গয়া গুরুত্বপূর্ণ আখ উৎপাদক অঞ্চল। পাঞ্জাবের গুরুত্ব আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কমে গেলেও গুরদাসপুর, জলন্ধর, সঙ্গারুঢ় পাতিয়ালা এবং অমৃতসর মুখ্য চিনি উৎপাদক অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। হরিয়ানার চিনি কারখানাগুলো যমুনা নগর, রোহটাক, হিসার এবং ফরিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। গুজরাটের চিনি শিল্প তুলনামূলকভাবে নতুন। এখানকার চিনি কলগুলো সুরাট, জুনাগড়, রাজকোট, অমরেলি, বালসদ এবং ভাবনগর জেলার আখ উৎপাদক ক্ষেত্রে অবস্থিত।

পেট্রোরাসায়নিক শিল্প (Petrochemical Industries)

এই জাতীয় শিল্প ভারতে খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্য এই শিল্পের অন্তর্গত। 1960 সালে যখন জৈব রাসায়নিকের চাহিদা এত বেশি বৃদ্ধি পায় তখন তার পূরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। ওই সময়ে, খনিজতেল শোধন করার শিল্পগুলো দ্রুত প্রসারিত হয়। অপরিশোধিত খনিজ তেল থেকে বিভিন্ন পদার্থ আহরিত হয়, যা অনেক নতুন শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগান দেয়, এগুলোই সমষ্টিগতভাবে পেট্রোরাসায়নিক শিল্প নামে পরিচিত। এই জাতীয় শিল্পকে চারটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়— (i) পলিমার, (ii) কৃত্রিম তন্তু, (iii) ইলাস্টোমার এবং (iv) পৃষ্ঠ সক্রিয়ক (surfactant intermediate)। মুম্বাই পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের কেন্দ্র। বাজির কারখানাগুলো উত্তরপ্রদেশের অরাইয়া, গুজরাটের জামনগর, গান্ধিনগর

তোমরা জানো কি?

भारत पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा

एस पी सैनी

नई दिल्ली। भारत अब पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यातक देश के रूप में भी उभर रहा है। यहां तक कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे साधन सम्पन्न विकसित भी भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं। देश से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2004-05 में देश से 29,928 करोड़ रुपये मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया था जबकि वर्ष 2005-06 में 46,785 करोड़ रुपये मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के निर्यात में भी वृद्धि हुी है।

वित्त वर्ष 2004-05 में भारत से विभिन्न देशों को 1 करोड़ 82 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2005-06 में बढ़ कर 2 करोड़ 15 लाख मीट्रिक टन हो गया। अधिकृत सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कि या गया पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 43.8 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2005-06 में बढ़ कर 49.6 प्रतिशत हो गया। इसी तरह निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2004-05 में 56.2 प्रतिशत था लेकिन वित्त वर्ष 2005-06 मे यह मामूली घट कर 50.4 प्रतिशत हो गया। सूत्रों के अनुसार 1998 में रिफाइनरी क्षेत्र को लाईसेंस की परिधि से बाहर

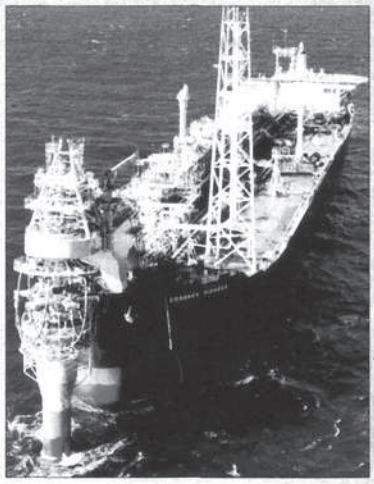

अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे साधन सम्पन्न विकसित देश भी भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं

किए जाने के बाद पेट्रोलियम क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर ढांचागत सुविधाओं में विस्तार हुआ है। यही नहीं देश में कई स्थानों पर घरेलू रिफाइनरियों की स्थापना भी की गई। इस तरह से भारत की पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के तौर पर विश्व में पहचान बनी और आज यह स्थिति है कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में अच्छा खासा निर्यातक देश बन गया है।

निजी क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा जामनगर (गुजरात) में प्रस्तावित सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हो जाने के बाद रिफाइनरी के क्षेत्र में भी भारत विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनर (तेलशोधक) देश बन जाएगा। रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा यह रिफाइनरी अपनी वर्तमान आरआईएल की रिफाइनरी के साथ ही 27,000 करोड़ रुपये की लागत से लगाई जा रही है। तीन वर्ष की अवधि में तैयार होने वाली इस रिफाइनरी की तेलशोधक क्षमता 5,80,000 बैरल प्रतिदिन होगी। यह रिफाइनरी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी होगी अर्थात इस रिफाइनरी में तैयार किए जाने वाले सभी उत्पाद निर्यात किए जाएंगे।

ও হাজিরা, মহারাষ্ট্রের নাগোথানে রত্নাগিরি, পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া এবং অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত।

রাসায়নিক ও পেট্রোরাসায়নিক বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে পেট্রোরাসায়নিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত তিনটি সংস্থা কাজ করছে। প্রথমটি হল ভারতীয় পেট্রোরাসায়নিক করপোরেশন লিমিটেড (IPCL) এবং এটি সরকারি ক্ষেত্রের অধীনে। এটি বিভিন্ন প্রকারের পেট্রোরাসায়নিক দ্রব্য যেমন পলিমার, রাসায়নিক, তন্তু এবং তন্তুর মধ্যবর্তী বস্তু নির্মাণ ও বন্টন করে। দ্বিতীয়টি হল পেট্রোফাইল্স কোপারেটিভ লিমিটেড (PCL) এবং এটি ভারত সরকার এবং তাঁতী সমবায় সমিতির একটি যৌথ উদ্যোগ। এটি গুজরাটের ভাদোদরা এবং নলধারিতে অবস্থিত তার দুটি কারখানায় পলিয়েস্টার তন্তু সুতা ও নাইলনের টুকরো (chips) উৎপাদন করে। তৃতীয়টি হল সেন্টাল ইনস্টিটিউট অফ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (CIPET) এবং এটি পেট্রোরাসায়নিক শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

পলিমার ইথিলিন এবং প্রপিলিন থেকে তৈরি হয়। অপরিশোধিত তেলের শোধন প্রক্রিয়ায় এই দ্রব্যগুলো পাওয়া যায়। পলিমার কাঁচামাল হিসাবে প্লাস্টিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পলিমারগুলোর মধ্যে পলিথিন হল বহুল ব্যবহৃত থার্মোপ্লাস্টিক। প্লাস্টিককে প্রথমে পাত, পাউডার, রেজিন ও টুকরোতে পরিবর্তিত করে তারপর প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক পণ্যগুলো তাদের দৃঢ়তা, নমনীয়তা, জল ও রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং স্বল্প মূল্যের কারণেই পছন্দসই হয়। অন্যান্য জৈব রাসায়নিক ব্যবহার করে পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের গোড়ায় ভারতে প্লাস্টিক পলিমারের উৎপাদন শুরু হয়। দ্যা ন্যাশনাল অরগানিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (NOCIL) 1961 সালে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হয় এবং এটি রাসায়নিক শিল্প প্রথম মুম্বাইতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে অনেক কারখানা গঠিত হয়েছিল। মুম্বাই, বারাউনি, মেত্তুর, পিম্পারি এবং রিশরা হল মুখ্য প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদক কেন্দ্র।

এই বিভাগের 75 শতাংশ ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প ক্ষেত্রে রয়েছে। এই শিল্প পুনরাবর্তন প্লাস্টিক ব্যবহার করে, যা পরো উৎপাদনের প্রায় 30 শতাংশ।

কৃত্রিম তন্তু ব্যাপকভাবে কাপড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি সহজাত সুদৃঢ়, স্থায়ীত্ব ধোয়ার যোগ্য ও সংকোচন প্রতিরোধী হয়। নাইলন ও পলিয়েস্টারের সুতা নির্মাণকারী শিল্প কারখানাগুলো কোটা, পিম্পারি, মুম্বাই, মোদিনগর, পুনা, উজ্জয়ন, নাগপুর এবং উধনাতে অবস্থিত। কোটা এবং ভাদোদরাতে অ্যাক্রেলিক প্রধান তন্তু উৎপাদিত হয়।

যদিও প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য বস্তু এবং এটি আমাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকারক। কিন্তু এর অজীবাণু বিয়োজ্য গুণাবলির কারণে এটি আমাদের পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো সংকট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্লাস্টিক ব্যবহারকে নিরুৎসাহ করা হচ্ছে। তোমরা কি জান প্লাস্টিক কীভাবে আমাদের পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে?

জ্ঞানভিত্তিক শিল্প (Knowledge based Industries)

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি দেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের নতুন সম্ভাবনা সূচনা করে। তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তি সক্ষম বাণিজ্যের প্রক্রিয়া বহিরাগত (ITES-BPO) পরিসেবাগুলোর শক্তিশালী বৃদ্ধির পথকে অব্যাহত রেখেছে। ভারতীয় সফটওয়্যার শিল্প অর্থনীতিতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সফটওয়্যার শিল্পটি ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার উৎপাদনে এগিয়ে গেছে। ভারত সরকার দেশে অনেক সফটওয়্যার পার্ক সৃষ্টি করেছে।

IT সফটওয়্যার এবং সেবামূলক উদ্যোগ ভারতের মোট দেশীয় উৎপাদনের (GDP) শতকরা 2 ভাগ ভারতের সফটওয়্যার শিল্প গুণমানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের জন্য একটি অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বিশাল সংখ্যায় ভারতীয় সফটওয়্যার কোম্পানিরা আন্তর্জাতিক মানের শংসাপত্র অর্জন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বহুজাতিক সংস্থাগুলো ভারতের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা গবেষণা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে ভারতে রয়েছে। যাই হোক, হার্ডওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে ভারত এখন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করতে পারেনি।

এই বৃদ্ধির একটি বড় প্রভাব কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর পড়েছে, যা প্রতিবছর প্রায় দ্বিগুণ হয়।

ভারতে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন (LPG) এবং শিল্প উন্নয়ন (Liberalisation, Privatisation, Globalisation (LPG) and Industrial Development in India)

1991 সালে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত লাভের ওপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা, এর বিকৃতি বা দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করা, উৎপাদনশীলতা ও লাভজনক কর্মসংস্থানের স্থায়ী বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই ছিল এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই নীতির অন্তর্গত শিল্পের পদক্ষেপগুলো হল : (1) শিল্পে লাইসেন্স ব্যবস্থা বাতিলকরণ, (2) বিদেশী প্রযুক্তিকে বিনামূল্যে প্রবেশ, (3) বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি, (4) মূলধন বাজারে অভিগমন, (5) মুক্ত বাণিজ্য, (6) পর্যায় ক্রমিক উৎপাদন কর্মসূচি বাতিল, (7) শিল্পের অবস্থান কার্যক্রমে উদারীকরণ। এই নীতির তিনটি প্রধান মাত্রা **উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন।**

সুরক্ষা, সামরিক বা পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্যোগ সম্পর্কিত ছয়টি শিল্প ব্যতীত সকলের জন্য শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়েছে। একই সময়ে, 1956 সালে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা 17 থেকে কমিয়ে 4 করা হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত শিল্প, পরমাণু শক্তি বিভাগের সূচীতে নির্দিষ্ট পদার্থসমূহের পাশাপাশি রেলপথগুলো সরকারি ক্ষেত্রের অধীনে রয়েছে। সরকার, সরকারি উদ্যোগের শেয়ার হোল্ডিংয়ের একটি অংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণ এবং কর্মীদের প্রদান করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্পদের প্রান্তিক সীমাটি বাতিল করা হয়েছে এবং কোনো শিল্পকে বিনা লাইসেন্স ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তাদের কেবল নির্ধারিত বিন্যাসে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে হবে।

নতুন শিল্পনীতিতে দেশ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে (FDI) উচ্চতর স্তরের অর্থনৈতিক বিকাশ লাভের জন্য দেশীয় বিনিয়োগের পরিপূরক হিসাবে দেখা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নতি, বিশ্ব পরিচালন দক্ষতা এবং অনুশীলনের অভিগমন, প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে FDI গার্হস্থ্য শিল্পের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও উপকৃত করে। এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগকে উদারীকরণ করা হয়েছে এবং সরকার বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) এর জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় পথে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। সরকার শিল্প অবস্থাননীতির পরিবর্তনও ঘোষণা করেছিল। পরিবেশগত কারণে বড়ো শহরগুলোতে অথবা তাদের অতি নিকটের শিল্পগুলোকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

দেশীয় এবং বহুজাতীয় উভয় প্রকারের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে শিল্পনীতির উদারীকরণ করা হয়েছে। খনি খনন, টেলিযোগাযোগ, রাজপথ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মতো নতুন ক্ষেত্রগুলো বেসরকারি কোম্পানির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এসব ছাড় থাকা সত্ত্বেও, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ FDI

চিত্র 8.12 : সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নত হয়নি। অনুমোদিত এবং প্রকৃত বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মধ্যে বড়ো ব্যবধান রয়েছে, যদিও বিদেশী সহযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিনিয়োগের বৃহত্তর অংশ গৃহস্থালীর উপকরণ, অর্থ, পরিসেবা, বৈদ্যুতিন ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং খাদ্য ও দুগ্ধজাত পণ্যগুলোতে খাটানো হয়েছে।

বিশ্বায়নের অর্থ হল দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একত্রীকরণ করা। এই প্রক্রিয়ার অধীনে মূলধন, শ্রম এবং সম্পদ সহ পণ্য ও পরিসেবাগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে অনায়াসে পৌঁছানো যেতে পারে। দেশীয় ও বিদেশী প্রতিযোগিতা বাড়াতে বাজার পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী ও প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ককে সহজ করার মাধ্যমে বিশ্বায়নের জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় প্রসঙ্গে, এটি বোঝায় : (1) ভারতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলোকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে অর্থব্যবস্থার উদ্বোধন; (2) ভারতে বহুজাতীয় কোম্পানিগুলোর প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এবং প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা; (3) ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে বিদেশী সহযোগিতা ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া এবং যৌথ উদ্যোগে বিদেশে উদ্যোগ স্থাপন করতে উৎসাহ প্রদান করা; (4) প্রথমে শুল্ককে পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা থেকে সরিয়ে নিয়ে বিশাল আমদানি উদারীকরণ কর্মসূচি পালন করা এবং তারপর আমদানি শুল্কের স্তরটি যথেষ্ঠ পরিমাণে কমিয়ে আনা; এবং (5) রপ্তানি উৎসাহের একটি সেটের (set) পরিবর্তে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বিনিময় দরের সমন্বয় বেছে নেওয়া।

বিদেশী সহযোগিতার অনুমোদন সমাপ্তির পর এটি প্রকাশ পায় যে, বিনিয়োগের বেশিরভাগ অংশ মূল ক্ষেত্রে এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে চলে গিয়েছে যেখানে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্র অস্পৃশ্যই রয়ে গেল। এছাড়াও, উন্নত ও উন্নয়নশীল রাজ্যগুলোর মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হয়েছে। দেশীয় বিনিয়োগ পাশাপাশি বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উভয়ের অধিকাংশ ইতোমধ্যে উন্নত রাজ্যগুলোতে চলে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 1991-2000 সালে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (23 শতাংশ) ছিল শিল্পোন্নত মহারাষ্ট্রের জন্য, 17 শতাংশ ছিল গুজরাটের জন্য, 7 শতাংশ ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য এবং তামিলনাড়ুর জন্য ছিল প্রায় 6 শতাংশ, অথচ বৃহত্তর জনসংখ্যা বহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের জন্য ছিল মাত্র 8 শতাংশ। বেশ কিছু ছাড় থাকা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগের শতাংশের চেয়েও কম পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাজ্যগুলো শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলোকে আকর্ষণ করার জন্য উন্মুক্ত বাজারে উন্নত রাজ্যগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছিল না। তাই তাদের সম্ভবত এই প্রক্রিয়াগুলো থেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ভারতের শিল্পাঞ্চল (Industrial Regions in India)

ভারতে শিল্পগুলোর বণ্টন সমানভাবে হয়নি। অনুকূল স্থানীয় কারণগুলোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্থানে শিল্পগুলো গড়ে ওঠার প্রবণতা থাকে।

শিল্প অঞ্চল ও জেলা

মুখ্য শিল্পাঞ্চলসমূহ (8)

1. মুম্বাই - পুনে অঞ্চল, 2. হুগলি অঞ্চল, 3. ব্যাঙ্গালুরু -তামিলনাড়ু অঞ্চল, 4. গুজরাট অঞ্চল, 5. ছোটোনাগপুর অঞ্চল, 6. বিশাখাপত্তনম-গুন্টুর অঞ্চল, 7. গুরুগ্রাম-দিল্লি-মীরাট অঞ্চল, এবং 8. কোল্লাম-তিরুবনন্তপুরম অঞ্চল।

গৌণ শিল্পাঞ্চলসমূহ (13)

1. আম্বালা-অমৃতসর, 2. সারাহানপুর-মুজাফফরনগর-বিজনর, 3. ইন্দোর-দিয়াস-উজ্জয়ন, 4. জয়পুর-আজমের, 5. কোলপুর-দক্ষিণ কানাড়া, 6. উত্তর মালবার, 7. মধ্য মালাবার, 8. আদিলাবাদ-নিজামাবাদ, 9. এলাহাবাদ-বারাণসী-মির্জাপুর, 10. ভোজপুর-মুঙ্গের, 11. দুর্গ-রায়পুর, 12. বিলাসপুর-কোবরা, এবং 13. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

শিল্প জেলাসমূহ (15)

1. কানপুর, 2. হায়দ্রাবাদ, 3. আগ্রা, 4. নাগপুর, 5. গোয়ালিয়র, 6. ভূপাল, 7. লখনউ, 8. জলপাইগুড়ি, 9. কটক, 10. গোরখপুর, 11. আলিগড়, 12. কোটা, 13. পুর্নিয়া, 14. জবলপুর এবং 15. বেরেলী।

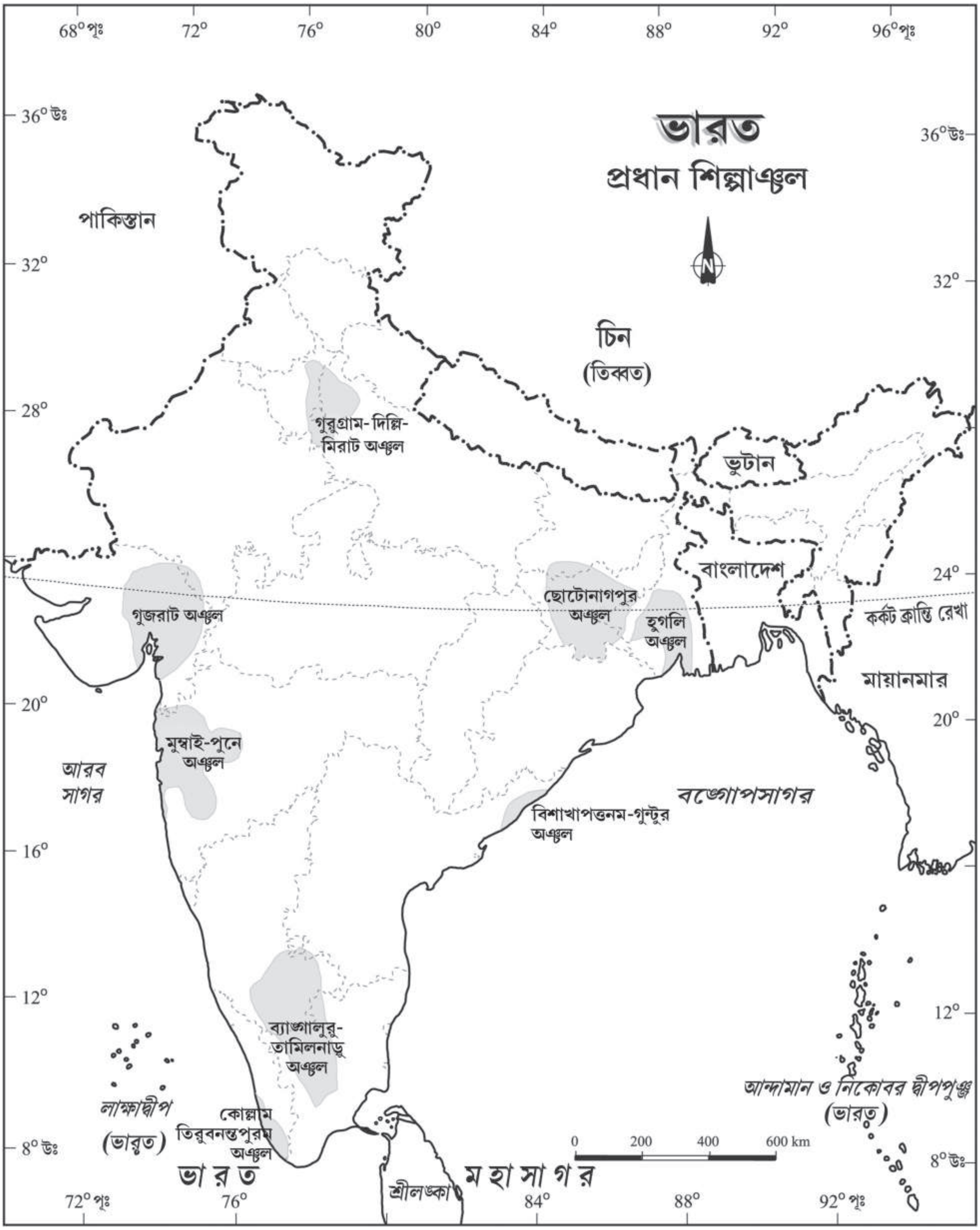

চিত্র 8.13 : ভারত—প্রধান শিল্পাঞ্চল

শিল্পসমূহকে চিহ্নিত করতে কয়েকটি সূচক ব্যবহার করা হয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো হল : (i) শিল্প কারখানার সংখ্যা, (ii) শিল্পকর্মীর সংখ্যা, (iii) শিল্পের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ, (iv) মোট শিল্পের উৎপাদন এবং (v) উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য সংযুক্ত মূল্য ইত্যাদি।

দেশের প্রধান শিল্প অঞ্চলগুলোর কিছু বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল (চিত্র 8.13)।

মুম্বাই-পুনে শিল্পাঞ্চল (Mumbai-Pune Industrial Region)

মুম্বাই- থানে থেকে পুনে এবং নাসিক ও শোলাপুরের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এছাড়াও কোলাবা, আহমেদনগর, সাতরা, সঙ্গালি এবং জালগাঁও জেলাতে শিল্পায়ন দ্রুততর হয়েছে। মুম্বায়ের কার্পাস বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল। মুম্বাই কার্পাসের পশ্চাদভূমি (hinterland) হওয়ায় এবং আর্দ্র জলবায়ুর দরুন এখানে কার্পাস বয়ন শিল্প স্থাপন করা অনুকূল ছিল। 1869 খ্রি: সুয়েজ খাল শুরু হওয়ার পর এটি মুম্বাই বন্দরের বৃদ্ধির প্রেরণা দেয়। এই বন্দরের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি করা হত। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহের জন্য পশ্চিমঘাট পর্বতে জলবিদ্যুৎ শক্তির বিকাশ হয়।

কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে রসায়ন শিল্পও উন্নত হয়েছিল। মুম্বাই-হাই পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের সূচনা এবং পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের স্থাপনা এই অঞ্চলকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে।

এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোরসায়ন, চামড়া, কৃত্রিম তন্তু ও প্লাস্টিক দ্রব্য, ঔষধ, সার বৈদ্যুতিক জাহাজ নির্মাণ, বৈদ্যুতিন সফটওয়্যার, পরিবহন সামগ্রী, খাদ্য শিল্পেও উন্নয়ন হয়েছিল। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রগুলো হল মুম্বাই, কোলাবা, কল্যান, থানে, ট্রম্বে, পুণে, পিম্প্রি,নাসিক, মানমাদ, শোলাপুর, কোলাপুর, আহমেদনগর, সাতরা এবং সাঙ্গালি ইত্যাদি।

হুগলি শিল্পাঞ্চল (Hugli Industrial Region)

হুগলি নদীর তীরে প্রায় 100 কিমি দূরত্বের মধ্যে এই অঞ্চলটি উত্তরে বাঁশবেরিয়া থেকে দক্ষিণে বিড়লানগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে মেদিনীপুরে এই শিল্পের বিকাশ ঘটে। কলকাতা-হাওড়া এই শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্র। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ এর উন্নতিতে যোগদান করে। এর উন্নতি হুগলি নদী বন্দরের উপর নির্ভর করে শুরু হয়। কলকাতা দেশের মধ্যে এক মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে, কলকাতাকে অভ্যন্তরীণ রেলপথ এবং সড়ক পথ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের পাহাড়সমূহে চা বাগিচাগুলোর বিকাশ, পূর্বে নীলচাষের প্রক্রিয়াকরণ ও পরবর্তী সময়ে পাট চাষ, দামোদর উপত্যকার কয়লাক্ষেত্র এবং ছোটোনাগপুর মালভূমিতে লৌহ আকরিকের সঞ্চয় মিলিতভাবে এই অঞ্চলের শিল্পান্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। বিহারের ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে সুলভ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ ও উড়িষ্যা ও এর উন্নতিতে যোগদান করে। ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা ভারতের রাজধানী (1773-1911) হওয়ায় ব্রিটিশ মূলধনকে আকর্ষণ করে থাকে। 1855 সালে রিষরায় প্রথম জুট (পাট) শিল্পের স্থাপনা এই অঞ্চলের আধুনিক শিল্প যুগের সূচনা করে।

হাওড়া এবং ভটপাড়ায় মুখ্য পাট শিল্পকেন্দ্রীভূত। 1947 সালে দেশ ভাগের পর এই শিল্পাঞ্চলটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাট শিল্পের সাথে কার্পাস বয়ন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটে, কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বয়ন যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিন, রাসায়নিক ফার্মাসিওটিকেলস সার এবং পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের এই অঞ্চলে উন্নতি ঘটে। কোন্নগরের হিন্দুস্থান মোটর লিমিটেড ও চিত্তরঞ্জনের ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা এই অঞ্চলের শিল্প স্তম্ভ। হলদিয়ার তৈল শোধনাগারের অবস্থান বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিতে সুবিধা প্রদান করে। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রগুলো হল কলকাতা, হাওড়া, হলদিয়া, শ্রীরামপুর, রিষরা, শিবপুর, নৈহাটি, কাকিনাড়া, শ্যামনগর, টিটাগড়, সোদপুর, বজবজ, বিড়লানগর, বাঁশবেড়িয়া, বেলঘড়িয়া, ত্রিবেনী, হুগলি, বেলুড় ইত্যাদি। এমন কি, এই অঞ্চলের শিল্পের বৃদ্ধি অন্যান্য অঞ্চলের বিকাশের তুলনায় নিম্নমুখী। পাট শিল্পের অবনতি এর একটি প্রধান কারণ।

ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাই শিল্পাঞ্চল (Bengaluru-Chennai Industrial Region)

স্বাধীনতার পর দ্রুত শিল্পের বৃদ্ধি এই অঞ্চলের সাক্ষ্য বহন করে। 1960 সাল পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল কেবল ব্যাঙ্গালুরু, সালেম ও মাদুরাই

জেলায় সীমিত ছিল কিন্তু তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম ছাড়া সব জেলাতেই ছড়িয়ে আছে। কয়লাক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের বিকাশ পায়কারা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে যা 1932 সালে স্থাপিত হয়েছিল। কার্পাস বয়ন শিল্প কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলে প্রথম স্থাপিত হয়। কার্পাস কল এর পাশাপাশি তাঁত শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। অনেক ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহ ব্যাঙ্গালুরুতে একত্রিত হয়েছে। বিমান (HAL) মেসিনটুলস, টেলিফোন (HTL) ও ভারত ইলেকট্রনিক্স এই অঞ্চলের শিল্পস্তম্ভ। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহগুলো হল বয়ন শিল্প, রেলওয়াগন, ডিজেল ইঞ্জিন, রেডিও, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাবার দ্রব্য, ঔষধ, অ্যালুমিনিয়াম, চিনি, সিমেন্ট, কাঁচ, কাগজ, রাসায়নিক, চলচিত্র, সিগারেট, দেশলাই বাক্স, চামড়ার দ্রব্যসমূহ ইত্যাদি। চেন্নাই এ খনিজতেল শোধনাগার, সালেম এ লৌহ ইস্পাত শিল্প এবং সার শিল্পের অভিনব বিকাশ ঘটেছে।

গুজরাট শিল্পাঞ্চল (Gujarat Industrial Region)

আমেদাবাদ এবং ভাদোদরার মধ্যে এই একত্রিত শিল্পাঞ্চলটি অবস্থিত। কিন্তু এই অঞ্চলটি দক্ষিণে বালসাদ এবং সুরাট ও পশ্চিমে জামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত। 1860 সাল থেকে এই অঞ্চলের উন্নয়ন কার্পাস বয়ন শিল্প স্থাপনের ওপর নির্ভর করে। মুম্বাই এর কার্পাস বয়ন শিল্পের অবনতির ফলে এই অঞ্চলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। কার্পাস উৎপাদক ক্ষেত্রের নিকটে স্থাপিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে কাঁচামাল ও রাবার দুটির সুবিধা পাওয়া যায়। তৈলক্ষেত্রের আবিষ্কার থেকে পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের স্থাপনা আঙ্কেলেশ্বর ভাদোদরা এবং জামনগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে হয়েছে। কান্ডালা বন্দর এই শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সহায়ক। কয়ালি তৈলশোধনাগার ক্ষেত্র থেকে পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের জন্য অনেক কাঁচামাল প্রাপ্ত হয়। শিল্প কাঠামো এখন বৈচিত্র্যময়। বয়ন শিল্প (কার্পাস, রেশম এবং কৃত্রিম তন্তু) এবং পেট্রোরাসায়নিক শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্পগুলো হল ভারী এবং রাসায়নিক মৌল, মোটর, ট্রাক্টর, ডিজেল ইঞ্জিন, বয়ন, মেসিনারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, ডাইস, পেসটিসাইডস, চিনি, ডেয়ারি দ্রব্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। বর্তমানে বৃহত্তম খনিজতেল শোধনাগার স্থাপিত হয় জামনগরে। এই অঞ্চলের মুখ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো হল আমেদাবাদ, বাদোদরা, বারুচি, কয়ালি, আনন্দ, খেরা, সুরেন্দ্রনগর, রাজকোট, সুরাট, বালসাদ এবং জামনগর।

ছোটোনাগপুর অঞ্চল (Chotanagpur Region)

এই অঞ্চলগুলো ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যার উত্তরাংশ, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত এবং ভারী ধাতব শিল্পের জন্য পরিচিত। এই অঞ্চলটি দামোদর উপত্যকায় কয়লা আবিষ্কারের বিকাশের জন্য পরিচিত এবং ধাতব এবং অধাতব খনিজ ঝাড়খন্ড ও ওড়িশার উত্তরাংশে পাওয়া যায়। কয়লার সান্নিধ্য আকরিক লৌহ ও অন্যান্য খনিজগুলো এই অঞ্চলে ভারী শিল্পগুলোর অবস্থানের সুবিধার্থে গড়ে উঠেছে। ছয়টি বড়ো সম্বন্বিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা জামসেদপুর, বার্নপুর-কুলটি, দুর্গাপুর, বোকারো এবং রাউরকেল্লা এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে দামোদর উপত্যকায় তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় এবং হুগলি শিল্পাঞ্চলের বিশাল বাজার এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে। ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, মেনিটুলস, ফার্টিলাইজার (সার), সিমেন্ট, কাগজ, রেলগাড়ির ইঞ্জিন (locomotives) এবং ভারী ইলেকট্রিকেল যন্ত্র এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো হল রাঁচি, ধানবাদ, চাইবাসা, সিন্ধ্রি, হাজারিবাগ, জামসেদপুর, বোকারো, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং ডালমিয়ানগর।

বিশাখাপত্তনম-গুন্টুর অঞ্চল (Vishakhapatnam-Guntur Region)

এই শিল্পাঞ্চলটি বিশাখাপত্তনম জেলা থেকে কারনোল এবং দক্ষিণের প্রকাশম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের শিল্প বিকাশের উপর নির্ভর করে বিশাখাপত্তনম এবং মছলিপত্তনম বন্দর এবং তাদের পশ্চাৎভূমি (hinterlands) অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র এবং খনিজগুলোর সমৃদ্ধি বিকাশ লাভ করেছে। গোদাবরী উপত্যকায় কয়লাক্ষেত্র শক্তি সরবরাহ করে। 1941 সালে জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত হয়। আমদানি করা পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম শোধনাগার বিভিন্ন পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের বিকাশকে সহজতর করে দিয়েছে। এই অঞ্চলের চিনি, বয়ন, পাট, কাগজ, সার, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম এবং হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলো মুখ্য শিল্প হিসাবে পরিচিত। গুন্টুর জেলায় একটি সীসা দস্তা গন্ধযুক্ত শিল্পের কাজ চলছে। বিশাখাপত্তনমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বাউলাডিলা থেকে আকরিক লৌহ ব্যবহার করা হয়। বিশাখাপত্তনম, বিজয়বারা, বিজয়নগর, রাজাহমুন্ডি, গুন্টুর, ইলুর এবং কারনুল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র।

গুরুগ্রাম-দিল্লি-মেত্তুর অঞ্চল (Gurugram-Delhi-Meerut Region)

সাম্প্রতিক অতীতে এই অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলটি খনিজ এবং শক্তি সম্পদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং সেই জন্য শিল্পগুলো হালকা এবং বাজারমুখী। ইলেকট্রনিক্স, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক দ্রব্য হল এই অঞ্চলের মুখ্য শিল্পসমূহ। এছাড়াও আছে কার্পাস, পশম এবং কৃত্রিম তন্তু , হোসিয়ারি, চিনি, সিমেন্ট, মেসিনটুলস, ট্রাক্টর, সাইকেল, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক এবং বনস্পতি শিল্প যা বৃহৎ আকারে গড়ে উঠেছে। সফটওয়্যার শিল্প হল সাম্প্রতিক সংযোজন। দক্ষিণ দিকে আগ্রা-মথুরা শিল্পাঞ্চলটি অবস্থিত যা কাঁচ ও চর্ম দ্রব্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তৈল শোধনাগার সহ মথুরা একটি পেট্রোরাসায়নিক ক্ষেত্র, শিল্প কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গুরুগ্রাম, দিল্লি, ফরিদাবাদ, মেরুট, মোদীনগর, গাজিয়াবাদ, আমবালা, আগ্রা এবং মথুরাতে তৈরি হয়েছিল।

কোলাম-তিরুবনন্তপুরম অঞ্চল (Kollam-Thiruvananthapuram Region)

এই শিল্পাঞ্চলটি তিরুবনন্তপুরম, কোলাম, আলায় (Alwaye) এরনাকুলাম এবং অলাপ্পুঝা জেলায় বিস্তৃত। বাগিচা, কৃষিকাজ ও জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলে শিল্পের ভিত্তি সরবরাহ করে। দেশের খনিজ বলয় থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারমুখী হালকা শিল্পগুলো এই অঞ্চলে প্রাধান্য পায়। তাদের মধ্যে কাপার্স বয়ন, চিনি, রাবার, দেশলাই বাক্স, কাঁচ, রাসায়নিক সার এবং মৎস্য ভিত্তিক শিল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ, নারকেলের ছিবড়ার দ্রব্য, অ্যালুমিনিয়াম ও সিমেন্ট শিল্পগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। কোচিতে পেট্রোলিয়াম শোধনাগারের অবস্থান এই অঞ্চলে শিল্পের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রগুলো হল কোলাম, তিরুবনন্তপুরম, অলুভা, কোচি, অলাপ্পুঝা এবং পুনালুর প্রভৃতি।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ
   (i) কোন্‌টি শিল্পের অবস্থানের কারণ নয়?
   - (a) বাজার
   - (b) মূলধন
   - (c) জনঘনত্ব
   - (d) শক্তি

   (ii) ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রথম লৌহ ও ইস্পাত সংস্থাটি হল ঃ
   - (a) IISCO
   - (b) TISCO
   - (c) বিশ্বেশ্বরা লৌহ ও ইস্পাত ওয়াকর্স
   - (d) মাইশোর লৌহ ও ইস্পাত ওয়াকর্স

   (iii) মুম্বাইয়ে প্রথম আধুনিক কার্পাস মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ ঃ
   - (a) মুম্বাই একটি বন্দর
   - (b) এটি তুলা উৎপন্ন ক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত
   - (c) মুম্বাই ছিল অর্থনৈতিক কেন্দ্র
   - (d) উপরোক্ত সমস্ত

(iv) হুগলি শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রটি হল ঃ

(a) কলকাতা—হাওড়া (c) কলকাতা—মেদিনীপুর

(b) কলকাতা—রিষড়া (d) কলকাতা—কোন্নগর

(v) নীচের কোন্‌টি দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি উৎপাদক অঞ্চল ঃ

(a) মহারাষ্ট্র (c) পাঞ্জাব

(b) উত্তরপ্রদেশ (d) তামিলনাড়ু

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ

(i) কেন তোমরা মনে করো যে, কোনো দেশের শিল্প উন্নয়নের মূলে রয়েছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প?

(ii) কার্পাস বয়ন শিল্পের দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখো। কীভাবে তারা পৃথক?

(iii) চিনি শিল্প কেন ঋতুভিত্তিক শিল্প?

(iv) পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের কাঁচামালের ভিত্তি কী? এই শিল্পের কয়েকটি পণ্যের নাম লেখো।

(v) ভারতে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সবচেয়ে মুখ্য প্রভাব কী?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ

(i) স্বদেশী আন্দোলন কীভাবে কার্পাস বয়ন শিল্পকে প্রেরণা দিয়েছে?

(ii) উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কে তুমি কী বোঝ? কীভাবে তারা ভারতে শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করেছে?

একক III

অধ্যায় 9

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও স্থিতিশীল উন্নয়ন (PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDIAN CONTEXT)

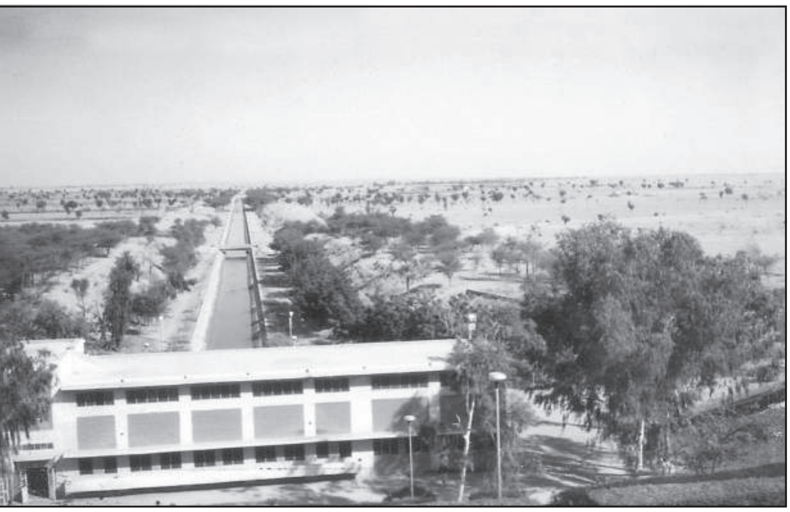

'পরিকল্পনা' শব্দটি তোমাদের জন্য নতুন নয় কারণ এটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলোর একটি অংশ। তোমরা নিশ্চয়ই এই শব্দটি তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি অথবা কোনোও পার্বত্য অঞ্চলে (hill station) ভ্রমণে যাওয়ার প্রসঙ্গো ব্যবহার করেছ। এতে চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া, একটি প্রকল্প বা কর্মসূচির রূপরেখা তৈরিকরণ এবং লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একগুচ্ছ ক্রিয়াকলাপের বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত। যদিও এটি একটি খুবই ব্যাপক বিষয়, কিন্তু এই অধ্যায়ে এটি অর্থনৈতিক উন্নতির প্রক্রিয়া প্রসঙ্গো ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এটি গতানুগতিক

> 1 জানুয়ারি, 2015 সালে 'নীতি আয়োগ' গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ভারত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি বহু স্তর ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনায় উন্নিত হয়। পরিকল্পনা গঠনের দায়িত্ব কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা স্তরের পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যুক্ত। কিন্তু 1 জানুয়ারি 2015 সালে পরিকল্পনা কমিশন 'নীতি আয়োগ'-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়।
>
> কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোকে কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করার জন্য ভারতের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে রাজ্যগুলোকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নীতি আয়োগ গঠন করা হয়েছিল।

হিট এবং মিস পদ্ধতিগুলো (hit-and-miss methods) থেকে ভিন্ন যার দ্বারা প্রায়শই সংশোধন এবং পুনর্গঠন করার কাজ করা হয়। সাধারণত পরিকল্পনার দু'টো দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যথা— ক্ষেত্রবিশেষ পরিকল্পনা (Sectoral planning) এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা (regional planning)। ক্ষেত্রবিশেষ পরিকল্পনার অর্থ হল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা-কৃষি, সেচ ব্যবস্থা, উৎপাদন, শক্তি, নির্মাণ, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক পরিকাঠামো এবং পরিসেবা বিকাশের লক্ষ্যে এক গুচ্ছ প্রকল্প বা কর্মসূচি গঠন ও রূপায়ণ।

কোনো দেশে সকল ক্ষেত্রে এক সমান অর্থনৈতিক বিকাশ হয় না। কিছু অঞ্চল বেশি উন্নত এবং কিছু অনুন্নত। সমগ্র অঞ্চলে বিকাশের এই অসম ধরন অপরিহার্য করে তোলে যে, পরিকল্পকগণ এক স্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুক এবং আঞ্চলিক অসামঞ্জস্যতা হ্রাস করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করুক। এই প্রকার পরিকল্পনাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

নির্দিষ্ট এলাকা পরিকল্পনা (Target Area Planning)

যে অঞ্চলগুলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে সে সকল অঞ্চলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। যেমনটি তোমরা জান, একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পদের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কখনো কখনো সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলও অনগ্রসর হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন। প্রায় দেড় দশক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে এটি অনুভব করা হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক অসামঞ্জস্যতা প্রবল হচ্ছে। আঞ্চলিক ও সামাজিক অসমতার প্রবলতা রোধ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনায় 'নির্দিষ্ট অঞ্চল' এবং 'নির্দিষ্ট শ্রেণি' দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিল। নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিকাশের দিকে পরিচালিত কর্মসূচির কিছু উদাহরণ হল কমান্ড অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি, খরাপ্রবণ অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি, মরুভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি, পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা *(Small Farmers Development Agency বা SFDA)* এবং প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন সংস্থা *(Marginal Farmers Development Agency বা MFDA)* প্রভৃতি হল নির্দিষ্ট শ্রেণির কর্মসূচির উদাহরণসমূহ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর- পূর্বের রাজ্যসমূহ, উপজাতি অঞ্চল এবং অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে পরিকাঠামো উন্নয়ন করার জন্য বিশেষ অঞ্চল কর্মসূচি রচনা করা হয়েছিল।

পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি (Hill Area Development Programme)

পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে উত্তর প্রদেশের (বর্তমান উত্তরাখন্ড) সবকটি পার্বত্য জেলা, আসামের মিকির ও উত্তর কাছাড় পাহাড়, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা এবং তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলা সহ মোট 15টি জেলায় আরম্ভ করা হয়েছিল। 1981 সালে অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নতিতে জাতীয় কমিটি দেশের যেসব পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতা 600 মিটারের অধিক এবং উপজাতি উপ-পরিকল্পনাধীন নয় সে সব পার্বত্য অঞ্চলকে অনগ্রসর অঞ্চল বলে অভিহিত করতে সুপারিশ করা হয়।

পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা এসকল অঞ্চলের ভূবৈচিত্র্যগত, বাস্তুতান্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাগুলোকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিগুলো পার্বত্য অঞ্চলসমূহের উদ্যানবিদ্যার বিকাশ, বাগিচা কৃষি, কৃষিকাজ, পশুপালন, মুর্গিপালন, বনায়ন এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরণ করার লক্ষ্যে বানানো হয়েছিল।

খরাপ্রবণ অঞ্চল কর্মসূচি (Drought Prone Area Programme)

এই কর্মসূচিটি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে খরা প্রবণ অঞ্চলে মানুষের কর্মসংস্থান প্রদান করা এবং উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, এই কর্মসূচিটি অসামরিক নির্মাণ কাজের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল যেখানে নিবিড় শ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু পরবর্তীকালে, এটি সেচপ্রকল্প, ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি, বনায়ন, তৃণভূমি উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ, রাস্তা, বাজার, ঋণ ও পরিসেবার মতো মৌলিক গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

পশচাদপদ অঞ্চলের উন্নয়নে জাতীয় কমিটি এই কর্মসূচির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে। দেখা গেছে যে, এই কর্মসূচিটি মূলত কৃষি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোর উন্নতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাস্তুতান্ত্রিক সমতার পুনরুদ্ধার। যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সমাজকে প্রান্তিক জমিগুলোকে কৃষির জন্য ব্যবহার করতে বাধ্য করছে এবং যার ফলে বাস্তুতান্ত্রিক অবনমন হচ্ছে, তাই খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। এই অঞ্চলগুলোতে উন্নতির অন্যান্য কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র স্তরে সংহত জলাশয় উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ। জল, মৃত্তিকা, গাছপালা এবং মানব ও প্রাণীর জনসংখ্যার মধ্যে পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোর বিকাশের কৌশলগুলোর মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন (1967) দেশের 67টি জেলাকে (সার্বিক অথবা আংশিক) খরা প্রবণ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সেচ কমিশন (1972) 30 শতাংশ সেচ সেবিত অঞ্চলের মানদন্ড প্রবর্তন করে খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করেছিল। ভারতের খরা প্রবণ অঞ্চল প্রধানত রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়ারা অঞ্চল, রায়ালসীমা ও অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা মালভূমি, কর্ণাটক মালভূমি এবং তামিলনাড়ুর উচ্চ ভূমি ও অভ্যন্তরীণ অংশের শুষ্ক-প্রায় ও শুষ্ক ভাগে বিস্তৃত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের উত্তর ভাগের খরা প্রবণ অঞ্চলগুলো সেচের বিস্তারের কারণে অনেকাংশে সুরক্ষিত থাকে।

একটি ঘটনা অধ্যয়ন-ভারমৌর অঞ্চলে সমন্বিত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প (Case Study – Integrated Tribal Development Project in Bharmaur* Region)

ভারমৌর উপজাতি এলাকাটি হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার ভারমৌর ও হোলি তহশিল নিয়ে গঠিত।। এটি 1975 সালের 21 নভেম্বর থেকে একটি অনুমোদিতউপজাতি অঞ্চল। ভারমৌর 'গাদ্দি' *'Gaddi'* নামক উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে, যাঁরা হিমালয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে চলেছে কারণ এরা ঋতু ভিত্তিক যাযাবর বৃত্তি অনুশীলন করে এবং গাদ্দিয়ালি (*Gaddiali*) উপভাষার মাধ্যমে কথাবার্তা বলে।

ভারমৌর উপজাতি অঞ্চলে জলবায়ুগত পরিস্থিতি কঠোর, ভিত্তিগত সম্পদ কম এবং পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই কারণগুলো অঞ্চলটির সমাজ ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে, ভারমৌর মহকুমার মোট জনসংখ্যা ছিল 39,113 অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে 21 জন। এটি হিমাচল প্রদেশের সবচেয়ে অনগ্রসর (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। ঐতিহাসিকভাবে, গাদ্দিরা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। অর্থনীতি মূলত কৃষিকাজ এবং এর সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলি যথা- মেষ ও ছাগল পালনের ওপর নির্ভরশীল।

ভারমৌরের উপজাতি এলাকার উন্নয়নের প্রক্রিয়া 1970 সালে শুরু হয়েছিল যখন গাদ্দিদের 'তফশিলি উপজাতি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত উপজাতি উপপরিকল্পনা 1974 সালে শুরু করা হয়েছিল এবং ভারমৌর অঞ্চলটিকে হিমাচল প্রদেশের পাঁচটি সমন্বিত উপজাতি প্রকল্প বা (ITDP)—এর একটি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। এই অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল গাদ্দিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং

এই অঞ্চলটি 32° 11' উঃ ও 32°41' উঃ অক্ষাংশে এবং 76° 22' পূঃ ও 76° 53' পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। 1,818 বর্গকিমি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে 1,500-3,700 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। গাদ্দিদের স্বদেশ হিসাবে খ্যাত এই অঞ্চলটি চারদিকে উঁচু পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এর উত্তরে পীর পাঞ্জাল এবং দক্ষিণে ধৌলাধর রয়েছে, পূর্বে ধৌলাধরের বিস্তার রোহটাং গিরিপথের নিকটে পীর পাঞ্জালের সাথে মিলিত হয়। এই অঞ্চলে ইরাবতি (*Ravi*) এবং এর উপনদীগুলো যথা- বুধিল ও তুন্দাহেন প্রবাহিত হয় এবং গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে। এই নদীগুলো অঞ্চলটিকে চারটি ভূ-প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করে যথা-হোলি (*Holi*), খানি (*Khani*), কুগতি(*Kugti*) এবং তুন্দাহ (*Tundah*)। শীতকালে ভারমৌরে জমে যাওয়ার মতো আবহাওয়াগত পরিস্থিতি ও তুষারপাত হয়। জানুয়ারি মাসে এর গড় মাসিক তাপমাত্রা 4°C এবং জুলাই মাসে 26°C থাকে।

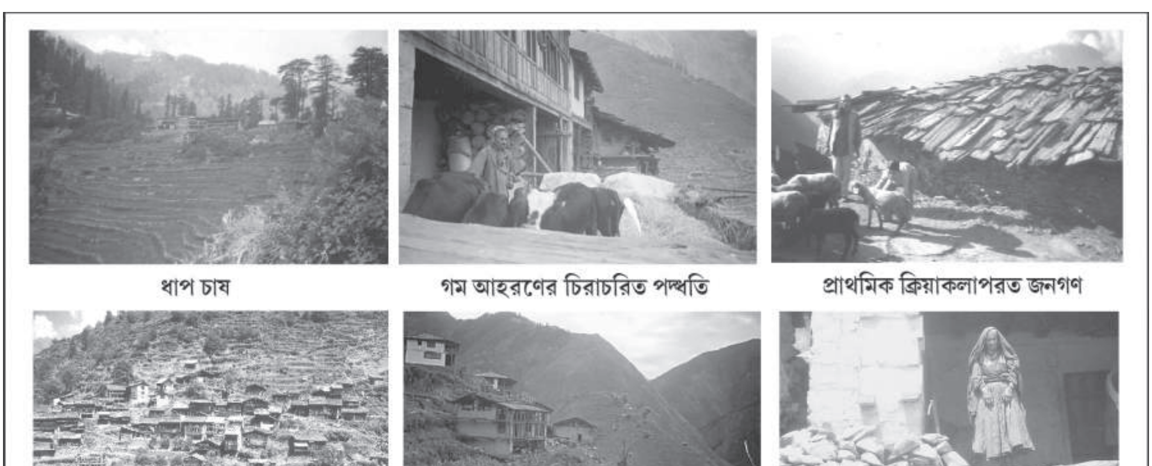

ধাপ চাষ | গম আহরণের চিরাচরিত পদ্ধতি | প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপরত জনগণ | ভারমৌর অঞ্চলের বসতি | চিরাচরিত পোশাক

চিত্র : 9.1

* ভারমৌর নামটি সংস্কৃত শব্দ ব্রাহমৌর থেকে নেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে ভারমৌরকে প্রচলিত রীতি বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

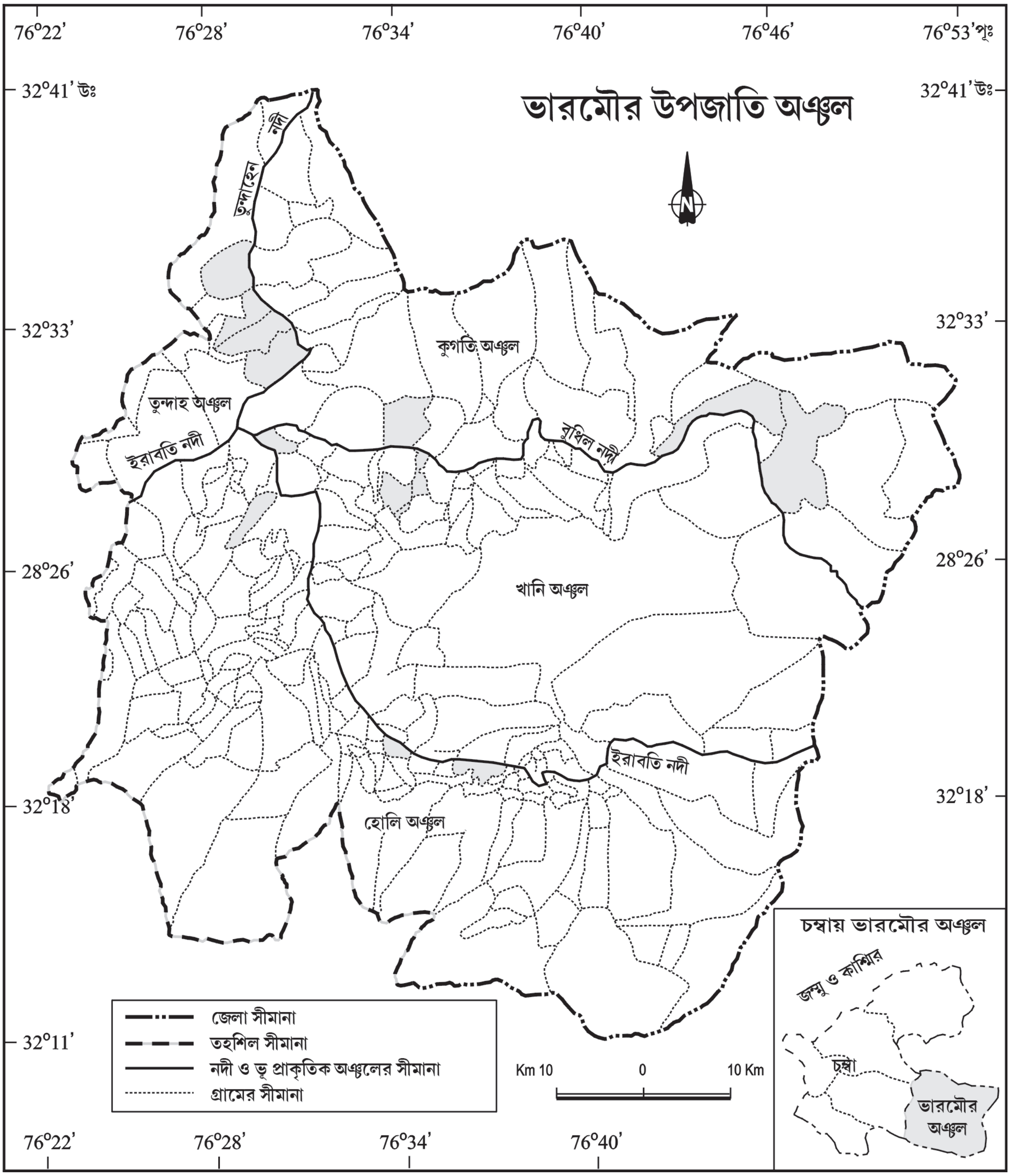

চিত্র : 9.2

ভারমৌর ও হিমাচল প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যেকার উন্নয়ন স্তরের ব্যবধান হ্রাস করা। এই পরিকল্পনাটিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষিকাজ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যাবলি এবং সামাজিক ও সম্প্রদায়গত পরিসেবাগুলোর উন্নয়নে সবচেয়ে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

ভারমৌর অঞ্চলে উপজাতি উপ-পরিকল্পনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হল বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ সুবিধা, পানীয় জল, রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির পরিকাঠামোর বিকাশ। তথাপি হোলি এবং খানি অঞ্চলগুলোতে ইরাবতি (Ravi) নদী বরাবর অবস্থিত গ্রামগুলো পরিকাঠামোগত বিকাশ থেকে

সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। তুন্দাহ (Tundah) এবং কুগতি (Kugti) অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামসমূহে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এখনও পর্যন্ত নেই।

ITDP থেকে প্রাপ্ত সামাজিক সুবিধাগুলোর মধ্যে সাক্ষরতা হারে অসাধারণ বৃদ্ধি, লিঙ্গ অনুপাতে উন্নতি এবং বাল্যবিবাহ হ্রাসকে অন্তর্ভুক্ত করে অঞ্চলটিতে নারী সাক্ষরতার হার 1971 সালে শতকরা 1.88 ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2011 সালে শতকরা 65 ভাগ হয়েছে। পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতা হারের মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যও হ্রাস পেয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, গাদ্দিদের অর্থব্যবস্থা জীবিকা স্বত্তাভিত্তিক কৃষি সহ পশুপালন নির্ভর ছিল যেখানে খাদ্য শস্য ও পশু সম্পত্তি উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিগত তিন দশকে ভারমৌর অঞ্চলে ডাল ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি এখনও পর্যন্ত চিরাচরিত প্রযুক্তি দ্বারাই শস্য চাষ করা হয়। এই অঞ্চলটির অর্থব্যবস্থায় পশুপালনের গুরুত্ব অবনমন এই ঘটনা থেকে বোঝা যেতে পারে যে, বর্তমানে মোট পরিবারের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ ঋতুভিত্তিক যাযাবর বৃত্তি অনুশীলন করে। কিন্তু গাদ্দিরা এখনও পর্যন্ত গতিশীল কারণ এদের মধ্যে অধিক সংখ্যক শীতকালে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাংরা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য পরিব্রাজন করে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)

নির্দিষ্ট সমাজের অবস্থা এবং তাদের দ্বারা উপলব্ধ পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করতে সাধারণত উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময়কালে, সমাজের অবস্থা মূলত মানব সমাজ এবং তাদের জৈব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। মানব-পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো একটি সমাজ দ্বারা পরিচালিত প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্তরের ওপর নির্ভর করে। প্রযুক্তি এবং সংস্থাসমূহ মানব পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার গতি বাড়াতে সাহায্য করেছে। ফলস্বরূপ গতিবেগটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সংস্থাগুলোর রূপান্তর ও উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করেছে। সুতরাং, উন্নয়ন একটি বহু মাত্রিক ধারণা এবং অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ইতিবাচক, অপরিবর্তনীয় রূপান্তরকে নির্দেশ করে।

উন্নয়নের ধারণাটি গতিশীল এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিকশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক বিকাশের সমার্থক ছিল যা স্থূল জাতীয় পণ্য (gross national product বা GNP) এবং মাথাপিছু আয় মাথাপিছু ব্যবহারের সময়গত বৃদ্ধি হিসাবে পরিমাপ করা হত। এমনকি অধিক অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও অসম বন্টনের কারণে দরিদ্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই 1970 এর দশকে 'পুর্বন্টনের সাথে বৃদ্ধি' এবং 'বৃদ্ধি ও সাম্যতা'-র মতো বাক্যাংশগুলো উন্নয়নের সংজ্ঞাতে সংযোজন করা হয়েছিল। পুনর্বন্টন এবং সাম্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর সাথে কাজ করার সময়, উপলব্ধি করা হয়েছিল যে, উন্নয়নের ধারণাটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুযোগের সম্যতা এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত। 1980-এর দশকে উন্নয়ন একটি ধারণা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যা একটি সমাজে সকলের বৃহৎ স্তরে সামাজিক ও পার্থিব কল্যাণ সাধন করে।

1960-এর দশকের শেষদিকে পশ্চিমের দেশগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতার সাধারণ বৃদ্ধির ফলে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটির উত্থান হয়েছিল। এটি পরিবেশের ওপর শিল্প বিকাশের অযাচিত প্রভাব সম্পর্কে মানুষের উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে। 1968 সালে এহরলিচ-এর পুস্তক '***The Population Bomb***' এবং 1972 সালে মিডোসের '***The Limits to Growth***' এবং অন্যান্যদের লেখা পুস্তকের প্রকাশনা বিশেষ করে পরিবেশবাদীদের ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে ভয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশের অধীন একটি বিস্তৃত বাক্যাংশ রূপে 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' এর নতুন মডেলের উত্থান ঘটে।

পরিবেশগত বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের জন্য জাতিসংঘ বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশন *(World Commission on Environment and Development* বা WCED) গঠিত হয় যার প্রধান ছিলেন নরওয়ে-এর প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেন ব্রুন্ডল্যান্ড (Gro Harlem Brundland')। কমিশন 1987 সালে '*Our Common Future*' শিরোনামে তার রিপোর্ট (যা ব্রুন্ডল্যান্ড রিপোর্ট নামেও পরিচিত) পেশ করে। প্রতিবেদনে স্থিতিশীল উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, "এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাগুলোর সাথে আপোষ না করে বর্তমান প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে।"

স্থিতিশীল উন্নয়ন বর্তমান সময়ের পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের দিকগুলোর তত্ত্বাবধান করে এবং সম্পদ

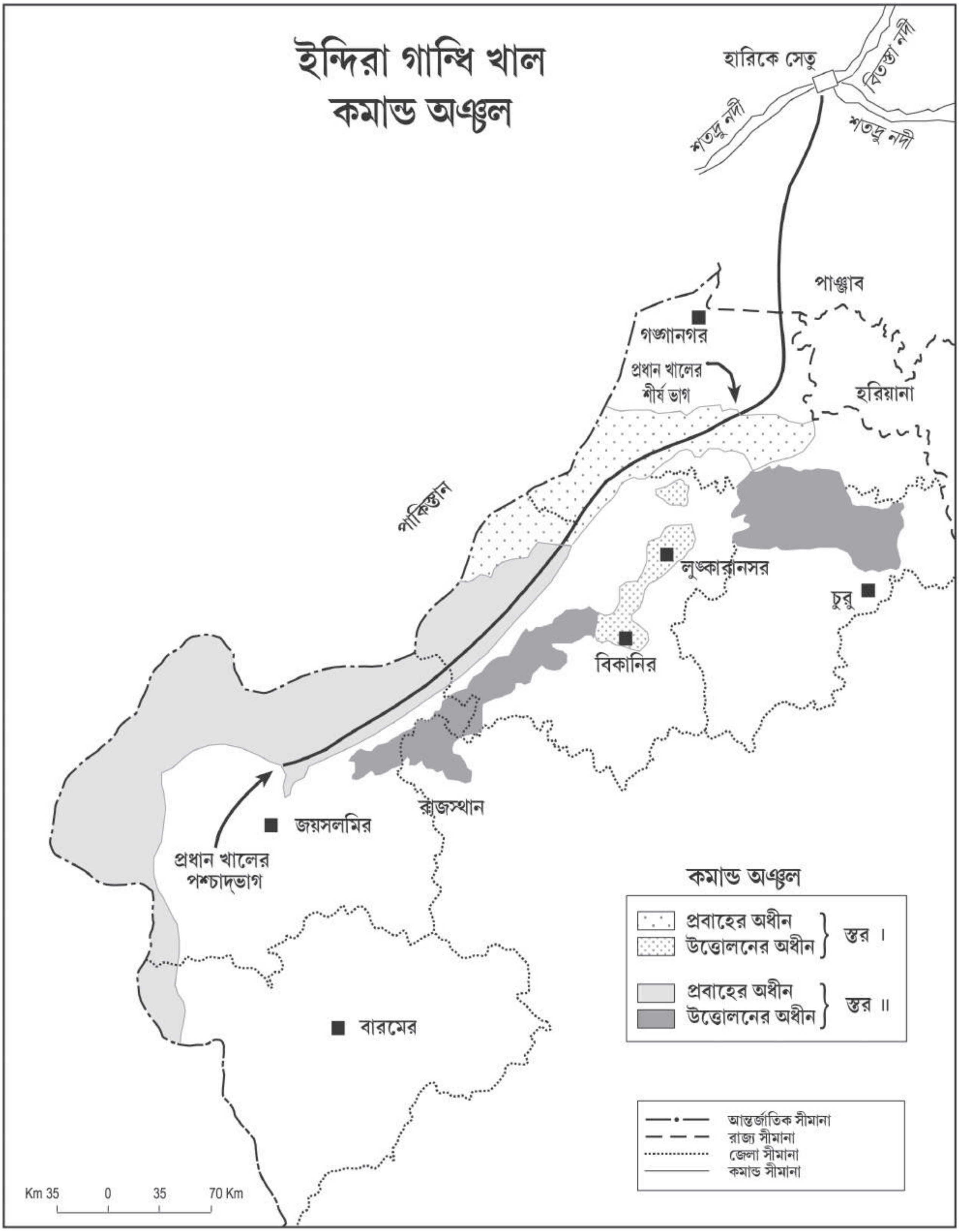

ইন্দিরা গান্ধি খাল
কমান্ড অঞ্চল
হারিকে সেতু
বিতস্তা নদী
শতদ্রু নদী
শতদ্রু নদী
পাঞ্জাব
গঙ্গানগর
প্রধান খালের
শীর্ষ ভাগ
হরিয়ানা
পাকিস্তান
লুঙ্কারানসর
চুরু
বিকানির
রাজস্থান
জয়সলমির
প্রধান খালের
পশ্চাদ্‌ভাগ
বারমের
কমান্ড অঞ্চল
প্রবাহের অধীন
উত্তোলনের অধীন
স্তর ।
প্রবাহের অধীন
উত্তোলনের অধীন
স্তর ॥
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্য সীমানা
জেলা সীমানা
কমান্ড সীমানা
Km 35 0 35 70 Km

চিত্র : 9.3

চিত্র 9.4 : ইন্দিরা গান্ধি খাল

চিত্র 9.5 : ইন্দিরা গান্ধি খাল ও এর সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ

সংরক্ষণের জন্য জোর দেয় যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসকল সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এটি সমগ্র মানবজাতির সর্বজনীন ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে।

একটি ঘটনা অধ্যয়ন (Case Study)

ইন্দিরা গান্ধি খাল (ক্যানেল) কমান্ড অঞ্চল (Indira Gandhi Canal (Nahar) Command Area)

ইন্দিরা গান্ধি ক্যানেল বা খাল যা পূর্বে রাজস্থান ক্যানেল রূপে পরিচিত ছিল, তা হল ভারতের অন্যতম বৃহত্তম খাল ব্যবস্থা। 1948 সালে কানওয়ার সেইন দ্বারা পরিকল্পিত এই খাল প্রকল্পটি 1958 সালের 31 মার্চ শুরু করা হয়েছিল। খালটি পাঞ্জাবের হারিকে বাঁধে উৎপন্ন হয় এবং রাজস্থানের থর মরুভূমিতে (মরুস্থলী) গড়ে 40 কিমি দূরত্বে পাকিস্তান সীমান্তের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। এই খালটির পরিকল্পিত মোট দৈর্ঘ্য হল 9,060 কিমি যা মোট কৃষিযোগ্য কমান্ড অঞ্চলের 19.63 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা প্রদান করবে। মোট কমান্ড অঞ্চলের শতকরা প্রায় 70 ভাগ প্রবাহ খাল (flow canal) এবং বাকি উত্তোলন খাল (lift canal) দ্বারা সেচ দেওয়ার কল্পনা করা হয়েছিল। খাল ব্যবস্থার নির্মাণকাজ দুটি ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়-I-এর কমান্ড অঞ্চলটিতে গঙ্গানগর, হনুমানগড় এবং বিকানির জেলার উত্তরাংশ অবস্থিত। এতে মৃদু তরঙ্গায়িত ভূ-বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এর কৃষিযোগ্য কমান্ড অঞ্চলের পরিমাণ হল 5.53 লক্ষ হেক্টর। পর্যায়-II এর কৃষিযোগ্য কমান্ড অঞ্চলটি বিকানির, জয়সলমির, বারমের, যোধপুর, নাগৌর এবং চুরু জেলার 1410 লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি স্থানান্তরিত বালিয়াড়িযুক্ত মরুভূমি নিয়ে গঠিত এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 50° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়। উত্তোলন খালে, ভূমিঢালের বিপরীতে জলকে প্রবাহিত করার জন্য উপরে তোলা হয়। ইন্দিরা গান্ধি খাল প্রণালীর সব উত্তোলন খাল প্রধান খালের বাঁ-দিকে যেখানে প্রবাহ খালগুলো প্রধান খালের ডানদিকে উৎপত্তি হয়।

খালটির পর্যায়-I কমান্ড অঞ্চলে সেচ 1960-এর দশকে অপরপক্ষে পর্যায়-II কমান্ড অঞ্চলে 1980-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেচ আরম্ভ হয়েছিল। সেচ খালের প্রবর্তনের ফলে এই শুষ্কভূমির বাস্তুবিদ্যা, অর্থনীতি ও সমাজকে রূপান্তরিত করেছে। এটি এই অঞ্চলে পরিবেশগত অবস্থাকে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ভাবেই প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্তিকায় আর্দ্রতার সহজলভ্যতা ও কমান্ড অঞ্চল উন্নয়নের আওতাধীন বিভিন্ন বনায়ন ও চারণভূমি বিকাশ কর্মসূচির ফলস্বরূপ এই জমিতে সবুজায়ন ঘটেছে। এটি খাল প্রণালীতে বায়ু দ্বারা ক্ষয় ও পলি সঞ্চয় হওয়ার প্রক্রিয়াকে হ্রাস করতেও সাহায্য করেছে। তবে, নিবিড় সেচ ও জলের অত্যধিক ব্যবহার জলাবদ্ধতা ও মৃত্তিকা লবণাক্ততার মতো দু'টো পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

সেচ খাল প্রবর্তন এই অঞ্চলের কৃষিজাত অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষ রূপে রূপান্তরিত করেছে। এই অঞ্চলটিতে সফলভাবে শস্য উৎপাদনের এক নিয়ন্ত্রক হল মৃত্তিকার আর্দ্রতা। সেচ খালের বিস্তারের ফলে কৃষিজাত এলাকা এবং শস্যের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অঞ্চলে বপন করা চিরাচরিত শস্য যথা- ছোলা, বাজরা ও জোয়ারের স্থান গম, কার্পাস, চিনাবাদাম এবং ধান দখল করে নিয়েছে। এটি হল প্রগাঢ় সেচের ফলাফল। এই প্রগাঢ় সেচ নিঃসন্দেহে প্রাথমিকভাবে কৃষিজাত ও পশুর উৎপাদনশীলতায় অভুতপূর্ব বৃদ্ধি করেছে। এটি জলাবদ্ধতা ও মৃত্তিকায় লবণতা সৃষ্টি করেছে এবং এভাবে দীর্ঘমেয়াদে এটি কৃষিজাত স্থিতিশীলতাকে বাঁধা প্রদান করে।

স্থিতিশীল উন্নয়নে অগ্রগতির উপায়সমূহ (Measures for Promotion of Sustainable Development)

ইন্দিরা গান্ধি খাল প্রকল্পের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বানগণ প্রশ্ন উঠিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও অনেকাংশেই বৈধ প্রমাণ করেছে বিগত চার দশকে এই অঞ্চলে যেভাবে উন্নয়ন ঘটেছে, যার ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন হয়েছে। এটি একটি কঠোর সত্য যে, কমান্ড অঞ্চলে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন করতে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জনে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর উপর জোর দেওয়া দরকার। এ কারণে, কমান্ড অঞ্চলে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সাতটি উপায়ের মধ্যে পাঁচটি পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(i) প্রথম প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে জল পরিচালনা নীতির কঠোরভাবে প্রয়োগ। এই খাল প্রকল্পটির পর্যায়-I-এ সংরক্ষণমূলক সেচ এবং পর্যায়-II-এ শস্যের জন্য ব্যাপক সেচ ও চারণভূমি বিকাশের পরিকল্পনা করেছে।

(ii) সাধারণত, শস্যের ধরনের জল নিবিড় অর্থাৎ যে শস্য চাষে জলের প্রয়োজন অধিক সে প্রকার শস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এটি মেনে চলতে হবে এবং মানুষদের বাগিচা ফসল যেমন- টকজাতীয় ফল চাষে উৎসাহ দিতে হবে।

(iii) কমান্ড অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি যথা জলের গতিপথ বাধানো, ভূমি উন্নয়ন ও সমতলীকরণ এবং ওয়ারাবন্দী প্রবাহ (কমান্ড অঞ্চলের নির্গমনপথে খালের জলের সমবণ্টন) ইত্যাদি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে জলের অপচয় হ্রাস পায়।

(iv) জলাবদ্ধতা ও মৃত্তিকায় লবণাক্ততা দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলো পুনরুধার করা হবে।

(v) বনায়ন, গাছের ছায়াবলয় (shelterbelt) তৈরি করা এবং চারণভূমি বিকাশের মাধ্যমে বাস্তু-উন্নয়ন (eco devlopment) বিশেষত পর্যায়-II-এর ক্ষণস্থায়ী পরিবেশে খুবই প্রয়োজনীয়।

(vi) এই অঞ্চলে সামাজিক স্থিতিশীলতা কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে যদি দরিদ্র অর্থনৈতিক স্থিতিযুক্ত জমির মালিকদের জমি চাষের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা দেওয়া হয়।

(vii) এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কেবলমাত্র কৃষিকাজ ও পশুপালন বিকাশের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষিকাজ ও এর সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপকে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে উন্নয়ন করতে হবে। এটি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বৈচিত্র্য আনতে এবং মৌলিক গ্রাম, কৃষি পরিসেবা কেন্দ্র এবং বাজার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের দিকে পরিচালিত করবে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।
   - (i) আঞ্চলিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত ঃ
     - (a) অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
     - (b) উন্নয়নের নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন।
     - (c) পরিবহণ নেটওয়ার্কে অঞ্চলের পৃথকীকরণ।
     - (d) গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়ন।
   - (ii) ITDP বলতে নিম্নলিখিত কোনটিকে বোঝায়?
     - (a) সমন্বিত পর্যটন উন্নয়ন কর্মসূচি।
     - (b) সমন্বিত ভ্রমণ উন্নয়ন কর্মসূচি।
     - (c) সমন্বিত উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি।
     - (d) সমন্বিত পরিবহণ উন্নয়ন কর্মসূচি।
   - (iii) ইন্দিরা গান্ধি কমান্ড অঞ্চলে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলোর মধ্যে কোনটি প্রধান?
     - (a) কৃষিজাত উন্নয়ন।
     - (b) বাস্তু উন্নয়ন।
     - (c) পরিবহণ উন্নয়ন।
     - (d) ভূমি ঔপনিবেশিকরণ।
2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ
   - (i) ভারমৌর উপজাতি অঞ্চলে ITDP -এর সামাজিক সুফলগুলো কী কী?
   - (ii) স্থিতিশীল উন্নয়ন-এর ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করো।
   - (iii) ইন্দিরা গান্ধি খাল কমান্ড অঞ্চলে সেচের সুপ্রভাব কী কী?
3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ
   - (i) খরাপ্রবণ অঞ্চল কর্মসূচির ওপর টিকা লেখো। ভারতে শুষ্কভূমির কৃষি বিকাশে এই কর্মসূচিটি কিভাবে সাহায্য করেছে?
   - (ii) ইন্দিরা গান্ধি খাল কমান্ড অঞ্চলে স্থিতিশীল উন্নয়নের অগ্রগতির কিছু উপায়সমূহ প্রস্তাব করো।

প্রকল্প

- (i) তোমাদের অঞ্চলে বাস্তবায়িত অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করো। তোমাদের অঞ্চলে এরূপ কর্মসূচির সমাজ ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব নির্ধারণ করো।
- (ii) তোমাদের নিজস্ব অঞ্চল নির্বাচন করো অথবা এমন এক অঞ্চল চিহ্নিত করো যেখানে তীব্র পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এটির সম্পদসমূহের অনুমান করো এবং এর তালিকা তৈরি করো। ইন্দিরা গান্ধি খাল কমান্ড অঞ্চল যেভাবে করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই এর স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য কতগুলো উপায় প্রস্তাব করো।

একক IV
অধ্যায় 10

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
(TRANSPORT AND COMMUNICATION)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক জিনিসই ব্যবহার করি। প্রতিদিনিই টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে ভোরের চা, দুধ, কাপড়, সাবান, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি আমাদের প্রয়োজন হয়। এই সব কিছুই বাজার থেকে ক্রয় করা যায়। তোমরা কি কখনও ভেবেছ যে এই সামগ্রীগুলোকে উৎপাদন স্থল থেকে কীভাবে নিয়ে আসা হয়? সমস্ত উৎপাদন ব্যবহারের জন্যই করা হয়। জমি ও কারখানা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যগুলো সেই স্থানে নিয়ে আসা হয় যেখান থেকে ভোক্তারা ক্রয় করতে পারে। এই দ্রব্যগুলোকে ভোক্তাদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য উৎপাদন স্থল থেকে বাজার পর্যন্ত পরিবহণ করা হয়।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শুধু ফল, সবজি, বই, কাপড় ইত্যাদির মতো বস্তুগত জিনিসই ব্যবহার করি না, এছাড়া যা ব্যবহার করি তা হল চিন্তা-ধারা, মতামত ও বার্তা। তোমরা কি জান যে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ করতে গিয়ে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থান বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত আমাদের চিন্তা-ধারা, মতামত, বার্তাও আদান-প্রদান করি?

আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কোনো বস্তুকে তার প্রাপ্যতার স্থান থেকে ব্যবহারের স্থান পর্যন্ত চলাচলের জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। মানুষ বিভিন্ন বস্তু, পদার্থ এবং চিন্তাধারাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে নানাবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করে।

নিম্নলিখিত চিত্রটি পরিবহণের প্রধান মাধ্যমগুলো প্রদর্শণ করছে।

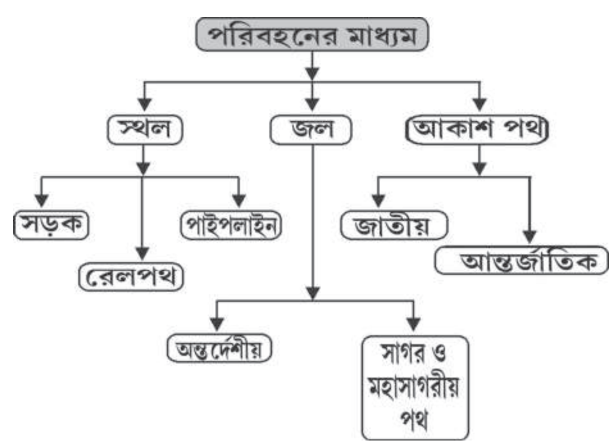

স্থল পরিবহণ (Land Transport)

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে পরিবহণের জন্য সড়ক ও কাঁচা রাস্তাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ও মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা ও রেলপথকে উন্নত করা হয়েছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের পরিবহণের চাহিদা পূরণ করার জন্য

রজ্জুপথ, রোপওয়ে, ক্যাবলওয়ে (cableways) এবং পাইপলাইনের মতো মাধ্যমগুলো বিকশিত করা হয়।

সড়ক পরিবহণ (Road Transport)

ভারতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য 54.8 লক্ষ কিমি (অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2016-17)। প্রতি বছর সড়ক পথের মাধ্যমে প্রায় 85 শতাংশ যাত্রী এবং 70 শতাংশ মালপত্র পরিবহণ করা হয়। স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণের জন্য সড়ক পরিবহণই তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত।

বৃষ্টিভেজা : শ্রীনগরে একটি সকালে বৃষ্টির মধ্যেও যাযাবররা তাদের নিয়মিত কাজে যাচ্ছেন। জম্মু-কাশ্মীরের উপরের অংশে ভারী তুষারপাত এবং সমভূমিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে শ্রীনগর জম্মুর 300 কিমি ও শ্রীনগর-লেহ-এর 434 কিমি জাতীয় রাজপথে যাতায়াত স্থগিত করা হয়েছে।

দিল্লিতে যানবাহন প্রবাহের একটি দৃশ্য

চিত্র 10.1

তোমরা জানো কি?

সিন্ধু উপত্যকা থেকে বাংলার সোনার উপত্যকা পর্যন্ত নিজের রাজত্বকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শেরশাহ শূরি, শাহিপথ (রয়্যাল) নির্মাণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে পেশোয়ারকে যুক্তকারী এই পথটিকে ব্রিটিশ সময়কালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক (জি.টি) রোড নামে নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়।। বর্তমানে এটি অমৃতসর থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথটি দুইটি অংশে দ্বিখন্ডিত ঃ (a) জাতীয় সড়কপথ (এনএইচ)-1, দিল্লি থেকে অমৃতসর এবং (b) এন.এইচ-2, দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আধুনিক সড়কপথ পরিবহণ ভারতে খুবই সীমিত ছিল। 1943 সালে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস "নাগপুর পরিকল্পনা" গঠন করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলোর সাথে ব্রিটিশ ভারতের সমন্বয়ের অভাবে বাস্তবায়িত করা যায়নি। স্বাধীনতার পর, ভারতে সড়কপথের অবস্থা সংস্কার করার জন্য একটি কুড়ি বছরের সড়ক পরিকল্পনা (1961) গ্রহণ করা হয়েছিল। যাই হোক, সড়কপথগুলো নগরীয় কেন্দ্রের চারপাশেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকাগুলোতে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ন্যূনতম ছিল।

নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনের উদ্দেশ্যে সড়কপথগুলোকে জাতীয় রাজপথ (এন.এইচ), রাজ্য রাজপথ (এস.এইচ), প্রধান জেলা সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তায় শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় সড়কপথ (National Highways)

যে সকল প্রধান পথগুলোর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষন কেন্দ্রীয় সরকার করে সেগুলোকে জাতীয় রাজপথ বলা হয়। এই পথগুলো আন্ত:রাজ্য পরিবহণ এবং সামরিক এলাকাগুলোতে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সামগ্রীর গতিবিধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলো গতিবিধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলো রাজ্যের রাজধানী, প্রধান শহর, গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, রেলপথ জংশন ইত্যাদিকেও যুক্ত করে। 1951 সালে জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য 19,700 কিমি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2015-16 সালে 100475 কিমিতে দাঁড়িয়েছে। দেশের মোট সড়ক পথের দৈর্ঘ্যের মাত্র 2 শতাংশ নির্মাণ করা হলেও সড়ক পথে যানবাহনের 40 শতাংশ জাতীয় সড়ক একাই বহন করে (সারণি 10.1)।

1995 সালে ভারতের জাতীয় রাজপথ কর্তৃপক্ষ (এন.এইচ.এ.আই) কার্যকরী হয়েছিল। এটি ভূ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এই সংস্থাটিকে জাতীয় রাজপথের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষন এবং পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় রাজপথ হিসাবে মনোনীত রাস্তার মান উন্নয়নের জন্য এটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা।

সারণি 10.1 : ভারতীয় সড়কপথ নেটওয়ার্ক 2015-16

ক্রমিক নং	পথের শ্রেণিবিভাগ	দৈর্ঘ্য (কিমি)
1.	জাতীয় রাজপথ/এক্সপ্রেসওয়ে	100475
2.	রাজ্য রাজপথ	154522
3.	প্রধান জেলা সড়ক	2577396
4.	গ্রামীণ রাস্তা	1433577
	মোট	**4265970**

উৎস: *Ministry of Road Transport and Highways Annual Report 2015-16. For latest data see website www.nhai.org*

জাতীয় রাজপথ উন্নয়ন প্রকল্প (National Highways Development Projects)

ভারতে এন.এইচ.এ.আই বিভিন্ন ধাপে কিছু প্রধান প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছে :

স্বর্ণালী চতুর্ভুজ : ভারতের চারটি বৃহৎ মেট্রো শহর দিল্লি-মুম্বাই-চেন্নাই-কলকাতাকে যুক্ত করতে একটি 5,846 কিমি দৈর্ঘ্যের 4/6 লেনের অধিক সংখ্যক যানবাহন চলাচলের পথের (traffic corridor) নির্মাণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়েছে।। স্বর্ণালী চতুর্ভূজ নির্মাণের সঙ্গে ভারতের মেগাসিটিগুলোর (mega cities) মধ্যে সময়, দূরত্ব এবং যাতায়াতের ব্যয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা যাবে।

উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডোর : উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের উদ্দেশ্য হল জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের সাথে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীকে (কোচি সালেম স্পার সহ) 4,076 কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা দ্বারা যুক্ত করা। পূর্ব-পশ্চিম করিডোর পরিকল্পনাটি আসামের শিলচরের সঙ্গে গুজরাটের বন্দর শহর-পোরবন্দরকে 3,640 কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা দ্বারা যুক্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল।

রাজ্য রাজপথ (State Highways)

এগুলো রাজ্য সরকার দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এই রাজপথগুলো রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে জেলার সদর দপ্তর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে যুক্ত করে। এই রাস্তাগুলো জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এগুলো দেশের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্যের 4 শতাংশ অধিকার করে আছে।

জেলা সড়ক (District Roads)

এই পথগুলো জেলা সদর দপ্তর এবং জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। এগুলো দেশের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্যের 14 শতাংশ অধিকার করে আছে।

গ্রামীণ পথ (Rural Roads)

গ্রামীণ এলাকায় সংযোগ স্থাপনের জন্য এই রাস্তাগুলো খুবই অত্যাবশ্যক। ভারতের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্যের প্রায় 80 শতাংশকে গ্রামীণ পথ হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। যেহেতু এই রাস্তাগুলো পার্বত্য (terrain) প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই এদের ঘনত্বের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যতা লক্ষ করা যায়।

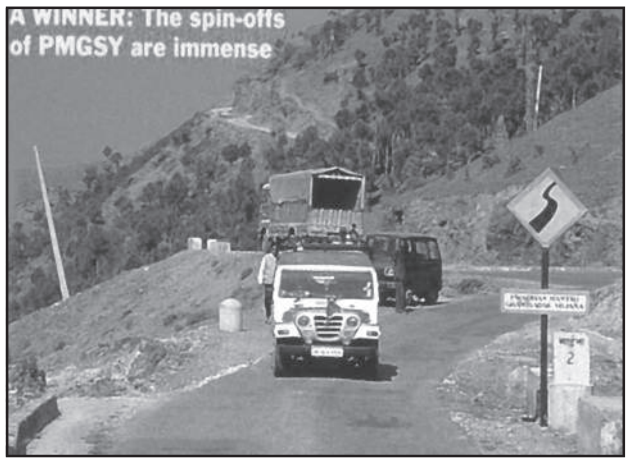

চিত্র 10.2 : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত নির্মিত রাস্তা

পাহাড়ি, মালভূমি ও বনাঞ্চল এলাকাগুলোতে গ্রামীণ সড়কের ঘনত্ব অতি স্বল্প কেন? নগরীয় কেন্দ্রগুলো থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে গ্রামীণ রাস্তার গুণমান কেন খারাপ হতে থাকে?

অন্যান্য রাস্তা (Other Roads)

অন্যান্য রাস্তাগুলোর মধ্যে সীমান্ত সড়ক (Border Road) ও আন্তর্জাতিক রাজপথ (International Highways) অন্তর্ভুক্ত। দেশের উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্তে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোর দ্রুত ও সহযোগিতার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদার করার জন্য 1960 সালের মে মাসে সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বি.আর.ও) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি

প্রধান বহুমুখী নির্মাণ সংস্থা। এটি উচ্চ অক্ষাংশীয় পার্বত্য অঞ্চলে সড়কপথ নির্মাণ করেছে যা চন্ডীগড়কে মানালি (হিমাচল প্রদেশ) ও লেহের (লাদাখ) সঙ্গো যুক্ত করে। এই পথটি গড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 4,270 মিটার গড় উচ্চতায় অবস্থিত।

কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বি.আর.ও (BRO) উচঅক্ষাংশীয় অঞ্চলগুলোতে তুষার পরিস্করণের কাজের সঙ্গো যুক্ত। কার্যকরী সংযোগের মাধ্যমে ভারতের সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই আন্তর্জাতিক রাজপথের উদ্দেশ্য (চিত্র 10.5 ও 10.6)।

দেশে সড়কগুলোর বণ্টন সমানভাবে হয়নি। 2011 সালে রাস্তাগুলোর ঘনত্ব (প্রতি 100 বর্গ কিমি এলাকায় রাস্তার দৈর্ঘ্য) শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরে 12.14 কিমি থেকে কেরালায় 517.77 কিমি পর্যন্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যেখানে জাতীয় গড় 142.68 কিমি। রাস্তার ঘনত্ব উত্তরের রাজ্যগুলোতে এবং দক্ষিণের মুখ্য রাজ্যগুলোতে বেশি। হিমালয় অঞ্চলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এটি খুবই কম। কেন এই বৈচিত্র্য দেখা যায়? ভূ- প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক স্তরের উন্নয়ন হল রাস্তার ঘনত্বের প্রধান নির্ধারক। সমতল এলাকাগুলোতে রাস্তার নির্মাণ সহজ ও সুলভ এবং পাহাড়ি ও মালভূমি অঞ্চলে খুবই কঠিন ও ব্যয় বহুল। অতএব উচ্চ-অক্ষাংশীয় অঞ্চলে বৃষ্টিবহুল ও বনাঞ্চলের রাস্তাগুলোর তুলনায় সমতলভূমিতে শুধুমাত্র ঘনত্বই নয় বরং রাস্তার গুণমানও অপেক্ষাকৃত উন্নত।

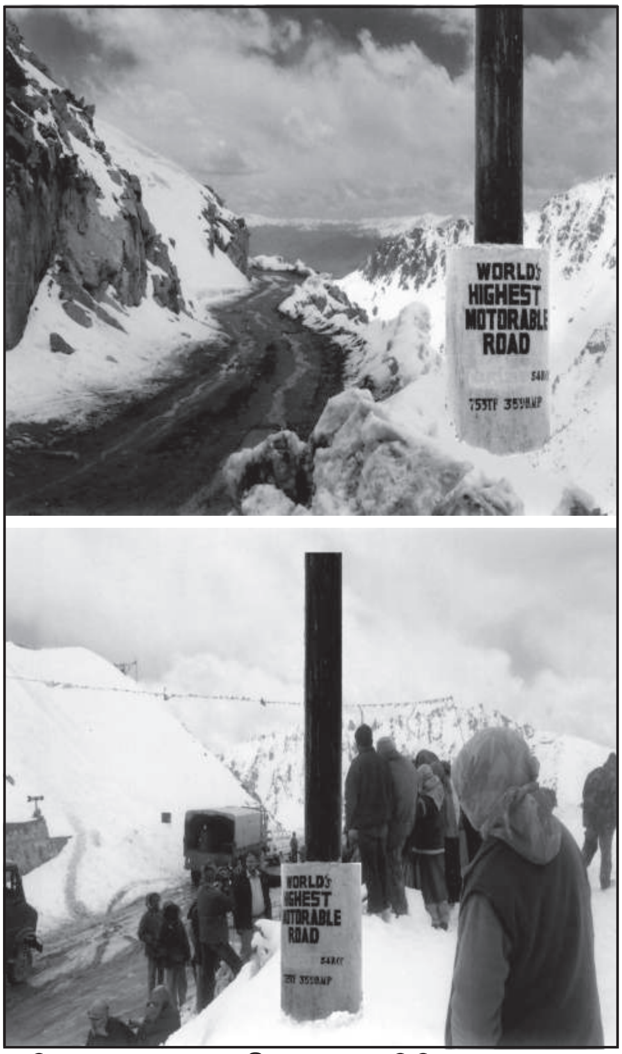

চিত্র 10.4 : জম্মু ও কাশ্মীরে খারদুংলা গিরিপথ (Khardung La Pass)

দিল্লি–লাহের বাস

চিত্র 10.5 : ওয়াঘা সীমান্তে লাহোর থেকে দিল্লিগামী বাস

চিত্র 10.6 : শ্রীনগর ও মুজাফফরাবাদের মধ্যে অমন সেতু

কাজ

এন.এইচ-1 (NH-1) এন.এইচ-2 (NH-2) বরাবর 10 টি গুরত্বপূর্ণ শহরের তালিকাপ্রস্তুত করো।

ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘতম জাতীয় রাজপথ কোন্‌টি ?

দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরু ও হায়দ্রাবাদ এবং উত্তর ভারতের দিল্লি, কানপুর ও পাটনা রাজ্যগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ?

তোমরা জানো কি?

ভারতমালা একটি প্রস্তাবিত গুচ্ছ প্রকল্প (আম্ব্রেলা স্কীম), যার উদ্দেশ্য হল :

(i) অ-প্রধান বন্দরগুলোর সংযোগ সহ উপকূলের সীমান্তবর্তী এলাকা বরাবর রাজ্য সড়কের উন্নয়ন। (ii) পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল, ধর্মীয় ও পর্যটন স্থানের সংযোগ কার্যক্রম; (iii) সেতুভারতম পরিযোজনা (*Setubharatam Pariyojana*) যা প্রায় 1500 টি মুখ্য সেতু এবং 200 টি রেল ওভার ব্রীজ ও রেল আন্ডার ব্রীজ নির্মাণ করেছে, সদ্য ঘোষিত প্রায় 9000 কিমি জাতীয় রাজপথের বিকাশের জন্য জেলা সদরের সংযোগ পরিকল্পনা। এই কর্মসূচিটি 2022 সালের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

উৎস: Economic Survey 2015-16 pp.146.

রেল পরিবহণ (Rail Transport)

ভারতীয় রেলপথ নেটওয়ার্ক বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথ নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে একটি। এটি মালপত্র এবং যাত্রী উভয়েরই চলাচল কে সহজতর করে এবং অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখে। মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, ভারতীয় রেলপথ "*.... ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানুষদের একসাথে নিয়ে এসেছিল।*"

1853 সালে ভারতীয় রেলপথের সূচনা হয় যখন বম্বে থেকে থানে পর্যন্ত 34 কিমি দীর্ঘ একটি রেললাইন নির্মিত হয়েছিল।

এই দেশে ভারতীয় রেল হল একটি বৃহত্তম সরকার অধিকৃত সংস্থা। 31 মার্চ, 2015 অনুসারে ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য 66,030 কিমি ছিল। ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের এই বিশাল আকার কেন্দ্রীয় রেল ব্যবস্থাতন্ত্রের ওপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে। তাই ভারতে, রেল ব্যবস্থাকে 16 টি বলয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। সারণি 10.3, অঞ্চল অনুসারে ভারতীয় রেলের কর্মক্ষমতাকে প্রদর্শণ করেছে।

সারণি 10.2 ভারতীয় রেল দ্বারা পরিবাহিত পণ্যদ্রব্য (মিলিয়ন টন) ও যাত্রীর (মিলিয়ন) গতি প্রকৃতি

পণ্য দ্রব্য	1970-71	2014-15 সাময়িক
কয়লা	47.9	545.8
ইস্পাত কারখানার কাঁচামাল	16.1	18.3
ঢালাই লোহা (Pig) এবং তৈরি ইস্পাত	6.2	42.8
লৌহ আকরিক	9.8	112.8
সিমেন্ট	11	109.8
খাদ্যশস্য	15.1	55.5
সার	4.7	47.4
পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল	8.9	41.1
অন্যান্য পণ্যদ্রব্য	48.2	121.8
মোট যাতায়াত	**167.9**	**1095.2**
যাত্রী নির্গমন	**2431**	**8224**

ভারতীয় রেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব (2014-15)

সারণি 10.3 ভারতীয় রেলপথ : রেল অঞ্চল ও সদর দপ্তর

রেলঅঞ্চল	সদর দপ্তর
মধ্য	মুম্বাই (সিএসটি)
পূর্ব	কলকাতা
পূর্ব-মধ্য	হাজিপুর
পূর্ব-উপকূল	ভুবনেশ্বর
উত্তর	নিউদিল্লি
উত্তর-মধ্য	এলাহাবাদ
উত্তর-পূর্ব	গোরখপুর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত	মালিগাঁও (গুয়াহাটি)
উত্তর-পশ্চিম	জয়পুর
দক্ষিণ	চেন্নাই
দক্ষিণ-মধ্য	সেকেন্দারাবাদ
দক্ষিণ-পূর্ব	কলকাতা
দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য	বিলাসপুর
দক্ষিণ-পশ্চিম	হুবলি
পশ্চিম	মুম্বাই (চার্চ গেইট)
পশ্চিম-মধ্য	জবলপুর

তোমরা জানো কি?

ভারতীয় রেলপথের প্রশস্ততার ওপর ভিত্তি করে, তিনটি শ্রেণি গঠন করা হয়েছে।

ব্রড গেজ (Broad gaugge) : ব্রড গেজের ক্ষেত্রে দুটি রেললাইনের মধ্যকার দূরত্ব 1.676 মিটার থাকে। 2016 সালের মার্চ মাসে ব্রড গেজ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য 60510 কিমি ছিল।

মিটার গেজ (Metre gauge) : দুটি রেললাইনের মধ্যকার দূরত্ব এক মিটার থাকে। 2016 সালের মার্চ মাসে এটির মোট দৈর্ঘ্য 3880 কিমি ছিল।

ন্যারো গেজ (**Narrow gauge**): এই ক্ষেত্রে দুটি রেললাইনের মধ্যকার দূরত্ব 0.762 মিটার বা 0.610 মিটার হয়। 2016 সালের মার্চ মাসে ন্যারো গেজের মোট দৈর্ঘ্য 2297 কিমি ছিল। এটি সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় রেল মিটার ও ন্যারো গেজগুলোকে ব্রড গেজে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি আরম্ভ করেছে।। অধিকন্তু, বাষ্পচালিত ইঞ্জিনগুলো ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পদক্ষেপটি গতির পাশাপাশি মালবহনের বহন ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করেছে।

কয়লা দ্বারা চালিত বাষ্প ইঞ্জিনগুলোর প্রতিস্থাপনও স্টেশনগুলোর পরিবেশকে উন্নত করেছে।

মেট্রো রেল কলকাতা ও দিল্লির নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। ডিজেলচালিত বাসের পরিবর্তে সি.এন.জি চালিত যানবাহনের প্রতিস্থাপন এবং মেট্রো রেলের সূচনা, নগরীয় কেন্দ্রগুলোতে বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে একটি ভালো পদক্ষেপ।

কোঙ্কন রেলপথ (Konkan Railway)

1998 সালে কোঙ্কন রেলপথের নির্মাণ হল ভারতীয় রেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এটি 760 কিমি দৈর্ঘ্যের রেলপথ যা মহারাষ্ট্রের রোহা থেকে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরকে যুক্ত করে। এটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার মানা হয়।। এটি 146 টি নদী, ছোটো নদী, 2000 এর কাছাকাছি সেতু ও 91টি সুড়ঙ্গপথ (tunnel) পার করে। এই পথে এশিয়ার বহত্তম 6.5 কিমি দৈর্ঘ্যের সুড়ঙ্গ পথটিও অবস্থিত। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গোয়া হল এই উদ্যোগের অংশীদার।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই শহরের চারপাশের এলাকা, কাঁচামাল, উৎপাদনকারী অঞ্চল, বাগান ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসল ক্ষেত্র, পাহাড়ি অঞ্চল এবং সেনানিবাস শহরগুলো রেলপথের সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত ছিল। এগুলো বেশিরভাগই সম্পদের শোষণের জন্যই বিকশিত করা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, রেলপথগুলো অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন হল পশ্চিম উপকূল বরাবর কোঙ্কন রেলপথের বিকাশ, যা মুম্বাই ও ম্যাঙ্গালুরুর মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

রেলপথ জনসাধারণের জন্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বজায় রয়েছে। পার্বত্য রাজ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, ভারতের মধ্যভাগ ও রাজস্থানে রেল নেটওয়ার্ক তুলনামূলকভাবে কম বিস্তৃত রয়েছে।

জল পরিবহণ (Water Transport)

ভারতে যাত্রী এবং মালপত্র উভয় পরিবহণের জন্য জলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ মাধ্যম। এটি পরিবহণের সবচেয়ে সুলভ মাধ্যম এবং এটি ভারী ও বিশাল বস্তু বহনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি একটি জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহণ মাধ্যম। জল পরিবহণ দুই প্রকারের হয়— (a) অন্তর্দেশীয় জলপথ ও (b) সামুদ্রিক জলপথ।

অন্তর্দেশীয় জলপথ (Inland Waterways)

রেলপথ আবির্ভাবের আগে, এটি পরিবহণের মুখ্য মাধ্যম ছিল। যদিও এটিকে রাস্তা ও রেলপথ পরিবহণের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। অধিকন্তু সেচের উদ্দেশ্যে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এদের গতিধারার বিশাল অংশ নৌ চলাচলের

চিত্র 10.7 : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীতে নৌ চলাচল

অযোগ্য হয়ে ওঠে। দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় 1 শতাংশের যোগদান সহকারে ভারতে 14,500 কিমির নাব্য জলপথ রয়েছে। নদী, খাল, ব্যাকওয়াটার (backwaters) খাত ইত্যাদি এটির অন্তর্গত। বর্তমানে প্রধান নদীগুলোর 5,685 কিমি জলপথ যন্ত্রচালিত জলযান দ্বারা নাব্য।

দেশের জাতীয় জলপথগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য 1986 সালে অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ (Inland Waterways Authority) গঠন করা হয়। নিম্নলিখিত জলপথগুলোকে সরকার জাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষণা করেছে। (সারণি 10.4)।

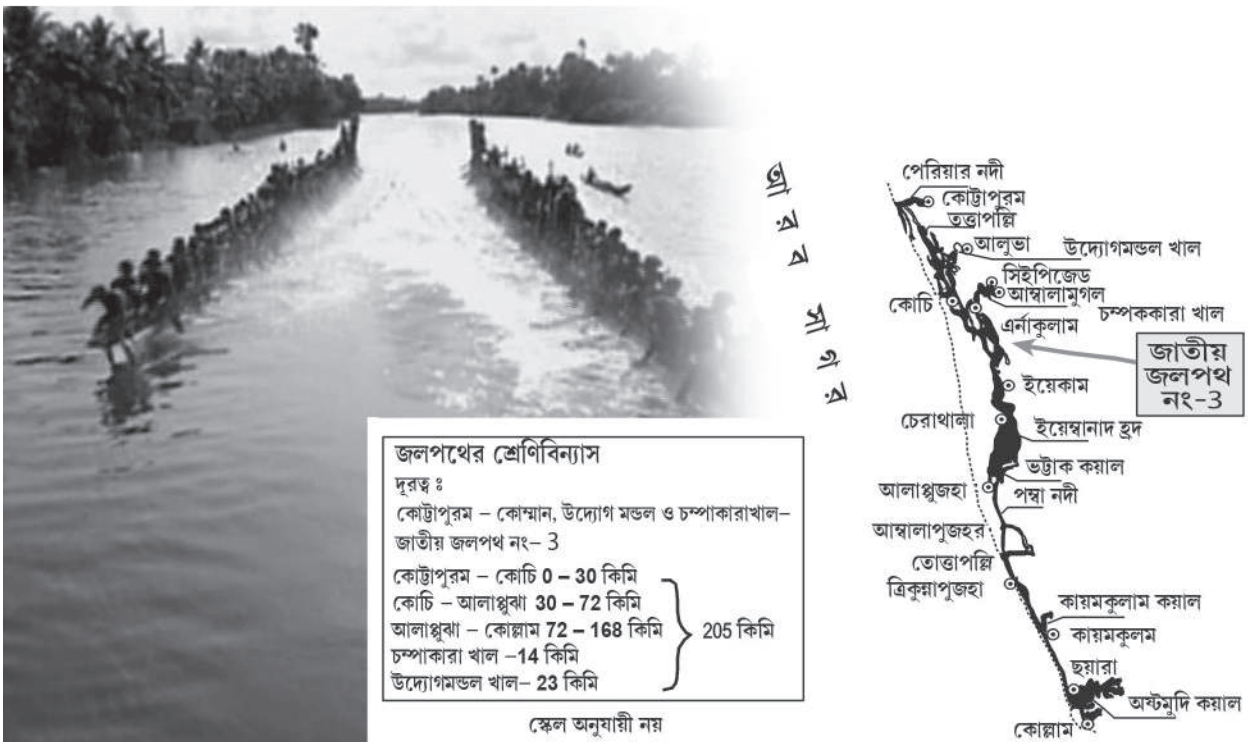

চিত্র 10.8 : জাতীয় জলপথ নং- 3

সারণি 10.4 : ভারতের জাতীয় জলপথ

জলপথ	বিস্তার	নির্দিষ্টকরণ
জাতীয় জল পথ-1 (NW 1)	এলাহাবাদ-হলদিয়া (1,620 কিমি) বিস্তার	এটি ভারতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ, যা পাটনা পর্যন্ত যন্ত্রচালিত নৌকা দ্বারা ও হরিদ্বার পর্যন্ত সাধারণ নৌকা দ্বারা নাব্য। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এটিকে 3টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— (i) হলদিয়া-ফারাক্কা (560 কিমি), (ii) ফারাক্কা-পাটনা (460 কিমি), (iii) পাটনা-এলাহাবাদ (600 কিমি)।
জাতীয় জল পথ-2 (NW 2)	সদিয়া-ধুবরি (891 কিমি) বিস্তার	ব্রহ্মপুত্র নদটি ডিব্রুগড় (1,384 কিমি) পর্যন্ত স্টিমার দ্বারা নাব্য এবং ভারত বাংলাদেশ এটিকে সমভাবে ব্যবহার করে।
জাতীয় জল পথ-3 (NW 3)	কোট্টাপুরম-কোল্লাম (205 কিমি) বিস্তার	এটির মধ্যে 168 কিমির পশ্চিম উপকূলীয় খালসহ চম্পকারা খাল (14 কিমি) ও উদ্যোগমন্ডল খাল (23 কিমি) অন্তর্ভুক্ত।
জাতীয় জল পথ-4 (NW 4)	গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর নির্দিষ্ট প্রসারিত ভাগ সহ কাকিনাড়া পুদুচেরি খালের বিস্তার (1078 কিমি)	
জাতীয় জল পথ-5 (NW 5)	ব্রাহ্মণী নদীর পাশাপাশি মতাই নদী সহ মহানদীর ব-দ্বীপ খাল ও ব্রাহ্মণী নদী এবং পূর্ব উপকূলীয় খাল (588 কিমি)	

অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ (Inland Waterways Authority) এমন 10টি অন্যান্য অন্তর্দেশীয় জলপথকে চিহ্নিত করেছে যেগুলোর আধুনিকীকরণ করা যেতে পারে। অন্তর্দেশীয় জলপথের ক্ষেত্রে কেরালার ব্যাক ওয়াটারের (কাদাল) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ব্যাকওয়াটারগুলো পরিবহণের মাধ্যমে সহজলভ্যতা প্রদান ছাড়াও বিশাল সংখ্যক পর্যটকদের কেরালায় আকর্ষণ করে। ভাল্লামকালী নামে পরিচিত বিখ্যাত নেহেরু ট্রফি দৌড় (Nehru Trophy Boat Race-VALLAMKALI) এই ব্যাকওয়াটারগুলোয় হয়ে থাকে।

সামুদ্রিক জলপথ (Oceanic Routes)

দ্বীপপুঞ্জ সহকারে ভারতে প্রায় 7,517 কিমি সুবিশাল উপকূল রেখা রয়েছে। বারোটি মুখ্য এবং 185 টি গৌণ বন্দর এই সকল জলপথকে পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে। ভারতীয় অর্থনীতির পরিবহণ বিভাগে সামুদ্রিক জলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতে পরিমাণের দিক থেকে প্রায় 95 শতাংশ ও মূল্যের দিকে 70 শতাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য সামুদ্রিক জলপথের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়াও এই সমুদ্র জলপথগুলো দ্বীপপুঞ্জ ও দেশের বাকি অংশের মধ্যেও পরিবহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

আকাশপথে পরিবহণ (Air Transportation)

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণের দ্রুততম মাধ্যম হল বায়ু পরিবহণ। এটি যাতায়াতের সময় হ্রাসের সঙ্গে দূরত্বও কমিয়ে আনে। এটি ভারতের মতো বিশালাকার দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে দূরত্ব খুবই বৃহৎ এবং ভূ- প্রকৃতি ও জলবায়ুর অবস্থা খুবই বিচিত্র।

ভারতে আকাশপথে পরিবহণ ব্যবস্থা 1911 সালে আরম্ভ হয়েছিল যখন এলাহাবাদ ও নৈনি পর্যন্ত 10 কিলোমিটার স্বল্প দূরত্বের জন্য বায়ুডাক (airmail) পরিবহণের কাজ আরম্ভ করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেই এটির প্রকৃত উন্নয়ন ঘটে। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (Airport Authority of India) ভারতীয় বায়ুক্ষেত্রে (Indian Air Space) সুরক্ষিত, সক্ষম আকাশপথে পরিবহণ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দায়বদ্ধ। এই কর্তৃপক্ষটি 125 টি বিমানবন্দর পরিচালনা করে।

ভারতে আকাশপথে পরিবহণ এয়ার ইন্ডিয়া দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে বহু বেসরকারি কোম্পানিও যাত্রী পরিসেবা আরম্ভ করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া যাত্রী ও মালপত্র পরিবহণ উভয়ের জন্যই আন্তর্জাতিক আকাশপথে পরিসেবা প্রদান করে। এটি বিশ্বের সমস্ত মহাদেশগুলোকে নিজের পরিসেবার মাধ্যমে যুক্ত করেছে। কিছু বেসরকারি কোম্পানি বিদেশি দেশগুলোতে বিমান পরিসেবা আরম্ভ করেছে।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ইতিহাস (History of Indian Airlines)

1911 – ভারতে আকাশপথে পরিবহণ (Air transport) এলাহাবাদ ও নৈনির মধ্যে আরম্ভ করা হয়েছিল।

1947 – ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, টাটা সন্স লিমিটেড, এয়ার সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া ও ডেকান এয়ারওয়েজ নামক চারটি প্রধান কোম্পানি আকাশপথে পরিবহণ প্রদান করেছিল।

1951 – আরও চারটি কোম্পানি এই পরিসেবায় যোগদান করে। এইগুলো হল ভারত এয়ারওয়েজ, হিমালয়ান এভিয়েশন লিমিটেড, এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া এবং কলিঙ্গা এয়ারলাইন্স।

1953 –আকাশপথে পরিবহণ পরিসেবাকে জাতীয়করণ করা হয় এবং দুটি নিগম গঠন করা হয়, যথা – এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে 'ইন্ডিয়ান' নামেও জানা যায়।

দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দেশীয় বাহন, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস তার নাম থেকে 'এয়ার লাইনস' শব্দটি বাদ দিয়েছিল এবং 8 ডিসেম্বর, 2005 সাল থেকে 'ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত হয়। নতুন ব্র্যান্ড নাম 'ইন্ডিয়ান' এখন বিমানের উভয় পাশের দেখা যায়। কমলা রঙের ল্যাজের ওপর চিত্রিত 'আই এ বা I A' লোগোটিও পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে একটি নতুন লোগো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা আংশিক দৃশ্যমান একটি নীল চাকা এবং ওড়িশার কোনার্কের সূর্য মন্দির দ্বারা অনুপ্রানিত, নিরন্তর গতি, অভিসরণ অপসরণের প্রতীক। এটি সদৃঢ়তার সাথে সাথে ঠিক সময়ে দাঁড়িয়ে থাকার বিশ্বাসকেও বাস্তব রূপ দান করে।

2010 সালে দেশীয় বিমান পরিবহণে 520.21 লক্ষ যাত্রী এবং প্রায় 23 লক্ষ মেট্রিক টনের জাহাজবাহী পণ্যসম্ভার (cargo) জড়িত ছিল।

পার্বত্য অঞ্চলের পবন হংস হেলিকপ্টার পরিসেবাটি সক্রিয় রয়েছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটকদের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও, পবন হংস লিমিটেড প্রধানত পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্র এবং পর্যটকদের জন্য হেলিকপ্টার পরিসেবা প্রদান করে।

খোলা আকাশ নীতি (Open Sky Policy)

ভারতীয় রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে এবং তাদের রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগী করে তোলার জন্য সরকার 1992 সালের এপ্রিল মাসে জাহাজ বাহী পণ্যসম্ভারের জন্য একটি 'খোলা আকাশ নীতি' শুরু করেছিল। এই নীতি অনুযায়ী বিদেশী বিমান বা রপ্তানিকারকদের সংগঠন যে কোনো পণ্যবাহী বিমানকে দেশে আনতে পারে।

তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন (Oil and Gas Pipelines)

তরল ও গ্যাসকে দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত পরিবহণে পাইপ লাইনগুলো অত্যধিক সুবিধাজনক এবং সক্ষম মাধ্যম। এমনকি কঠিন পদার্থকে ঘন তরলে (slurry) রূপান্তর করেও পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহণ করা যেতে পারে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ও আই এল (OIL) অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উৎপাদন ও পরিবহণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এটি 1959 সালে একটি কোম্পানি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ও আই এল দেশের ভেতরে আসামের নাহারকাটিয়া তৈল ক্ষেত্র থেকে বিহারের বারাউনি শোধানাগার পর্যন্ত এশিয়ার প্রথম 1,157 কিলোমিটার বিস্তৃত দৈর্ঘ্যের পাইপ লাইন নির্মাণ করেছিল। 1966 সালে আবারও একে কানপুর পর্যন্ত বিস্তার করা হয়েছিল। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাইপ লাইনের অপর একটি বিস্তৃর্ণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা হয়েছে যাদের মধ্যে আঙ্কেলেশ্বর-কয়ালি, মুম্বাই হাই-কয়ালি এবং হাজিরা-বিজয়পুর-জগদীশপুর (HBJ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি, উত্তরপ্রদেশের মথুরার সাথে গুজরাটের সালায়াকে যুক্ত করে 1,256 কিমি দৈর্ঘ্যের একটি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এটি গুজরাট থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধরে ভায়া মথুরা অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করে। ও আই এল দ্বারা লুমালিগড় থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 660 কিমি দৈর্ঘ্যের পাইপ লাইন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (Communication Networks)

মানবজাতি দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি বিকশিত করেছে। পূর্বেকার সময়ে ড্রাম বা গাছের ফাঁপা কান্ড বাজিয়ে, ধোঁয়া বা আগুনের মাধ্যমে ইঙ্গিত প্রদান করে অথবা দ্রুত দৌড় বাজের (Runner) সাহায্যে বার্তা পাঠানো হত। ঘোড়া, উট, কুকুর, পাখি এবং অন্যান্য প্রানীদেরকেও বার্তা পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হত। প্রাথমিকভাবে, যোগাযোগের মাধ্যমেই ছিল পরিবহণ মাধ্যম। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, ছাপার প্রেস, টেলিফোন, উপগ্রহ ইত্যাদির আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেক দ্রুততর এবং সহজতর বানিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বার্তা পৌঁছানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। মানদন্ড (Scale) এবং গুনাগুনের ভিত্তিতে যোগাযোগের মাধ্যমকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

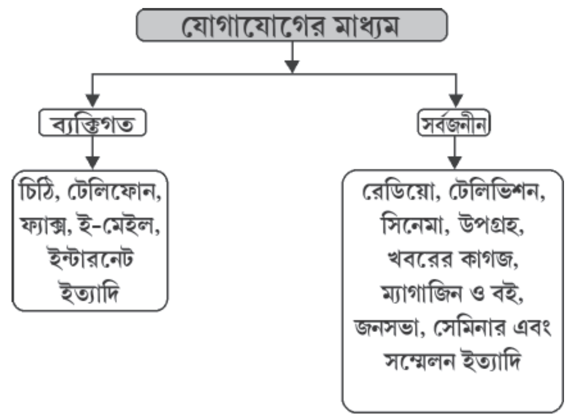

ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা (Personal Communication System)

সমস্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে ইন্টারনেট সবচেয়ে কার্যকর এবং উন্নত একটি মাধ্যম। এটি শহরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি জ্ঞান ও তত্ত্বের জগতে অভিগমন পেতে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ স্থাপনে ব্যবহারকারীকে সক্ষম করে তোলে। ই-বানিজ্য এবং অর্থলেনদেন পরিচালনার জন্য এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টারনেট বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ তথ্যসহ ডেটার (Data) বিশাল কেন্দ্রীয় সঞ্চয় ভান্ডারের মতো হয়। ইন্টারনেট ও ই-মেইলের মাধ্যমে এই নেটওয়ার্কটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে তত্ত্বের একটি দক্ষ উপলব্ধি প্রধান করে। এটি সরাসরি যোগাযোগের মৌলিক সুবিধাগুলোসহ আমাদের সক্ষম করে তোলে। তোমরা নিশ্চয় পৌর অঞ্চলে সাইবার ক্যাফেগুলোর বিস্তার লক্ষ করে থাকবে।

গণ যোগাযোগ ব্যবস্থা (Mass Communication System)

বেতার বা রেডিয়ো (Radio)

1923 সালে বোম্বের রেডিয়ো ক্লাবের মাধ্যমে বেতার সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই এটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং জনগণের সামাজিক -সাংস্কৃতিক জীবনকে বদলে দিয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই রেডিয়ো দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল। সরকার এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিল এবং 1930 সালে ভারতীয় সম্প্রচার ব্যবস্থা (Indian Broadcasting System) অধীনে যোগাযোগের এই জনপ্রিয় মাধ্যমটিকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছিল। এটিকে 1936 সালে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো (All India Radio) তে এবং 1957 সালে আকাশবাণীতে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো সংসদ, শিক্ষা এবং মনোরঞ্জন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সম্প্রচার করে। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনের মতো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের বিশেষ সংবাদ বুলেটিনও সম্প্রচারিত হয়।

দূরদর্শন বা টেলিভিশন (Television/T.V.)

সংবাদ প্রচার এবং জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম রূপে দূরদর্শন সম্প্রচারের উত্থান হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, টেলিভিশনের পরিসেবাগুলো শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় রাজধানীতে সীমাবন্ধ ছিল যেখানে এটি 1959 সালে আরম্ভ হয়েছিল। 1972 সালের পর আরও কয়েকটি কেন্দ্র চালু হয়েছিল। 1976 সালে টেলিভিশনকে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে সংযোজচ্যুত করা হয়েছিল এবং এটি দূরদর্শন (DD) রূপে পৃথক পরিচিতি লাভ করে। ইনস্যাট-আই এ (ন্যাশনাল টেলিভিশন-ডিডিআই) চালু হওয়ার পর, সমগ্র নেটওয়ার্কের জন্য সাধারণ জাতীয় অনুষ্ঠান (Common National Programmes.CNP) আরম্ভ করা হয়েছিল এবং এর পরিসেবাগুলো পশ্চাদপদ এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করা হয়েছিল।

উপগ্রহ যোগাযোগ (Satellite Communication)

উপগ্রহগুলো নিজেরাই যোগাযোগের মাধ্যম, পাশাপাশি যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহারকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। যা হোক, বৃহত্তর অঞ্চলের অনবরত ও সারসংক্ষিপ্ত দৃশ্য প্রাপ্তিতে উপগ্রহের ব্যবহার আর্থিক ও সামরিক কারণে দেশের জন্য উপগ্রহ যোগাযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর নজরদারি ইত্যাদির জন্য উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্রগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাহ্যিক গঠন এবং উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে ভারতের উপগ্রহ পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট সিস্টেম (INSAT) এবং ইন্ডিয়ান রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট সিস্টেম (IRS)। 1983 সালে স্থাপিত ইনস্যাট (INSAT) হল একটি বহুমুখী উপগ্রহ পদ্ধতি যা টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য (Data) ও কর্মসূচির জন্য উপযোগী।

আই আর এস (IRS) উপগ্রহ পদ্ধতিটি 1988 সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার বৈকানুর থেকে আই আর এস-আই এ (IRS-IA) উৎক্ষেপনের সাথে চালু হয়েছিল। ভারতও তার নিজস্ব উৎক্ষেপনকারী বাহন পিএসএলডি (Polar Satellite Launch Vehicle) তৈরি করেছিল। এই উপগ্রহগুলো বেশ কয়েকটি বর্ণালি ব্যান্ডে ডেটা (Data) সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য এগুলোকে ভূপৃষ্ঠের স্টেশনগুলোতে প্রেরণ করে। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার (NRSC) ডেটা অধিগ্রহণ করে এবং এর প্রক্রিয়াকরণের জন্য সুবিধা প্রদান করে। প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় এগুলো খুবই উপকারী।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :
   - (i) ভারতীয় রেলপথ পদ্ধতিতে কয়টি অঞ্চলে (Zone) বিভক্ত করা হয়েছে?
     - (a) 9
     - (b) 12
     - (c) 16
     - (d) 14
   - (ii) নীচের কোন্‌টি ভারতের দীর্ঘতম সড়কপথ?
     - (a) N.H.-1
     - (b) N.H.-6
     - (c) N.H.-7
     - (d) N.H.-8
   - (iii) জাতীয় জলপথ নং– 1 কোন্ নদীর উপর এবং কোন্ দুটি স্থানের মধ্যে অবস্থান করে?
     - (a) ব্রহ্মপুত্র, সাদিয়া–ধুবরি
     - (b) গঙ্গা, হলদিয়া–এলাহাবাদ
     - (c) পশ্চিম উপকূলীয় খাল, কোট্টাপুরম থেকে কোল্লাম
   - (iv) নিম্নের কোন্ বছরে প্রথম বেতার কার্যক্রম সম্প্রচার হয়েছিল?
     - (a) 1911
     - (b) 1936
     - (c) 1927
     - (d) 1923
2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :
   - (i) পরিবহণ কোন্ ধরনের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে? পরিবহণের প্রধান তিনটি মাধ্যমের নাম লেখো।
   - (ii) পাইপ লাইনে পরিবহণের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা করো।
   - (iii) 'যোগাযোগ' বলতে কী বোঝায়?
   - (iv) ভারতের আকাশপথে পরিবহণে 'এয়ার ইন্ডিয়া' এবং 'ইন্ডিয়ান' এর অবদান আলোচনা করো।
3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :
   - (i) ভারতে কোন্‌গুলো পরিবহণের প্রধান মাধ্যম? তাদের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলো আলোচনা করো।
   - (ii) ভারতে রেলপথ উন্নয়নের একটি বিশদ বিবরণ দাও এবং তাদের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
   - (iii) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়কের ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রকল্প

ভারতীয় রেল, যাত্রীদের যে সুবিধাগুলো প্রদান করে সেগুলো খুঁজে বের করো।

একক IV

অধ্যায় 11

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (INTERNATIONAL TRADE)

তোমরা ইতোমধ্যে "মানব ভূগোলের মূলতত্ত্ব" বইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। কোনও দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সব দেশের জন্য পারস্পরিক লাভজনক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠনের পাশাপাশি বাণিজ্যের দিক সম্বন্ধীয় বিষয়েও আমূল পরিবর্তন এসেছে। যদিও বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অবদান মোট পরিমাণের এক শতাংশেরও কম, তবুও এটি বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চলো আমরা ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত রূপ নিয়ে পর্যালোচনা করি। 1950-51 সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ 1,214 কোটি টাকা ছিল, যা 2016-17 সালে বেড়ে 44,29,762 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি 1950-51 সালের পরিপ্রেক্ষিতে 2016-17 সালের শতকরা বৃদ্ধির হার নিরূপণ করতে পারবে? বৈদেশিক বাণিজ্যের এই তীব্র বৃদ্ধির পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি বৃদ্ধি, সরকারের উদারনীতি এবং বাজারের বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

সময়ের সাথে সাথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে (সারণি 11.1)। যদিও আমদানি ও রপ্তানির মোট পরিমাণ বেড়েছে, তবুও আমদানি মূল্য রপ্তানির চেয়ে বেশি।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের গঠনশৈলীর পরিবর্তিত রূপ

2012-13 সাল থেকে 2016-17 সালের মধ্যবর্তী সময়কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যেকার ব্যবধানের প্রসার

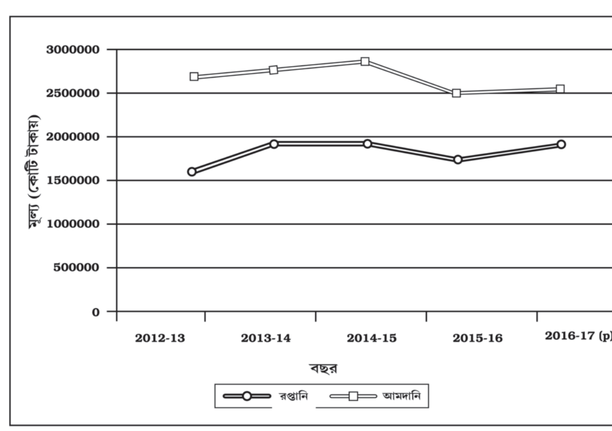

উৎস : *Economic Survey, 2016-17*

চিত্র 11.1

সারণি *11.1* ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

মূল্য (কোটি টাকায়)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
2004-05	3,75,340	5,01,065	-1,25,725
2009-10	8,45,534	13,63,736	-5,18,202
2013-14	19,05,011	27,15,434	-8,10,423
2016-17	18,52,340	25,77,422	-7,25,082

উৎস : *http://commerce.nic.in/publications/annual-report - 2010-11 and Economic Survey 2016 - 17*

কাজ

সারণিতে প্রদর্শিত প্রত্যেকটি রপ্তানি বস্তুর প্রবণতাকে দর্শিয়ে বিভিন্ন রঙের কলম বা পেনসিল ব্যবহার করে স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো।

সারণি 11.2 : ভারতের রপ্তানির গঠনশৈলী, 2009-2017

(রপ্তানির শতকরা ভাগ)

পণ্যদ্রব্য	2009-10	2010-11	2015-16	2016-17
কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত পণ্যসমূহ	10.0	9.9	12.6	12.3
আকরিক ও খনিজসমূহ	4.9	4.0	1.6	1.9
উৎপাদিত দ্রব্য	67.4	68.0	72.9	73.6
অপরিশোধিত ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যসমূহ	16.2	16.8	11.9	11.7
অন্যান্য পণ্যসামগ্রী	1.5	1.2	1.1	0.5

উৎস : *Economic Survey 2016-17*

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্যের গঠন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত পণ্যের অংশীদারি কমেছে, অন্যদিকে পেট্রোলিয়াম, অপরিশোধিত পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর অংশীদারি বেড়েছে। 2009-10 সাল থেকে 2010-11 সাল এবং 2015-16 সাল থেকে 2016-17 সাল পর্যন্ত বছরের পর বছর আকরিক খনিজ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশীদারি মূলত স্থির ছিল।

কঠোর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কারণে চিরাচরিত বস্তুগুলোর হ্রাস ব্যাপকভাবে হয়েছে। কৃষি জাত পণ্যের মধ্যে চিরাচরিত বস্তু যেমন- কফি, কাজুবাদাম প্রভৃতির রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে, যদিও ফুলচাষে উৎপাদিত পণ্য, তাজা ফল, সামুদ্রিক পণ্য ও চিনি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে।

2016-17 সালে ভারতের মোট রপ্তানির 73.6 শতাংশ এককভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রের অধীন ছিল। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়। চিন এবং অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ হল আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বৃহত্তর অংশে গ্রহরত্ন ও অলংকারের অবদান রয়েছে।

কাজ

সারণি 11.3 অধ্যয়ন করো, 2016-17 সালে রপ্তানি করা প্রধান পণ্যগুলো নির্বাচন করো এবং স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো।

ভারতের আমদানির গঠনশৈলীর পরিবর্তনীয় রূপ (Changing Patterns of the Composition of India's Import)

1950 এবং 1960 এর দশকে ভারত গুরুতর খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছিল। এ সময়ে আমাদানিকৃত প্রধান বস্তুগুলো ছিল খাদ্যশস্য, মূলধনি পণ্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। আমদানি বিকল্পের সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হওয়ায় আর্থিক উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণ বিপরীতে ছিল। 1970 এর দশকের পরবর্তী সময়ে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের কারণে খাদ্যশস্যের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু 1973 সালের জ্বালানির শক্তির সংকটের ফলে

সারণি 11.3 : কিছু সংখ্যক প্রধান পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

পণ্যদ্রব্য	2016-17
কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত পণ্যসমূহ	228001
আকরিক ও খনিজসমূহ	35947
উৎপাদিত দ্রব্য	1363232
খনিজ জ্বালানি এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ	216280

উৎস : *Economic Survey 2016-17.*

(পেট্রোলজাত) খনিজ তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ আমদানি বাজেটও বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের আমদানির পরিবর্তে সার ও খনিজ তেল আমদানি করা হয়েছিল। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বিশেষ প্রকার ইস্পাত, ভোজ্যতেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মূলত আমদানি বাণিজ্যের ডালা (basket) তৈরি করে। সারণি 11.4 তে আমদানির পরিবর্তিত রূপটি দেখো এবং এর পরিবর্তনগুলোকে বোঝার চেষ্টা করো।

সারণি 11.4 তে দেখাচ্ছে যে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের আমদানি খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি কেবল জ্বালানি হিসাবেই নয়, শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এটি ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও উন্নতমানের জীবনযাত্রার ইঙ্গিত দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্ষিপ্ত মূল্যবৃদ্ধিও এর আরেকটি কারণ। রপ্তানি নির্ভর শিল্প ও দেশীয় ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ার কারণে মূলধনি পণ্যের আমদানিতে স্থিতিশীল বৃদ্ধি বজায় রয়েছে। অ-বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহণের সরঞ্জাম, ধাতু নির্মাতারা এবং যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম ছিল মূলধনি পণ্যের প্রধান উপকরণ। ভোজ্য তেলের আমদানি হ্রাসের সাথে সাথে খাদ্য ও খাদ্য সংক্রান্ত পণ্য আমদানিও হ্রাস পেয়েছে। ভারতের আমদানিকৃত অন্যান্য মুখ্য উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে মুক্তো ও স্বল্প মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য, ধাতব আকরিক ও ধাতু বর্জিতাংশ (metal scrap), অ-লৌহবর্গীয় ধাতু, বৈদ্যুতিন পণ্য ইত্যাদি। 2016-17 সালে ভারতের আমদানিকৃত কিছু সংখ্যক প্রধান পণ্য দ্রব্যাদির বিবরণ সারণি 11.5 তে দেওয়া হয়েছে।

সারণি 11.5 এর ভিত্তিতে কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ করা যেতে পারে :

আরোহী বা অবরোহী ক্রমে সব বস্তুগুলোকে সাজাও এবং 2016-17 সালের ভারতের আমদানি তালিকার প্রথম পাঁচটি বস্তু বা উপকরণের নাম লেখো।

ভারত কৃষি সমৃদ্ধ দেশ হওয়া সত্ত্বেও কেন ভোজ্য তেল আমদানি করে?

পাঁচটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং পাঁচটি ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নির্বাচন করো এবং স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে তাদের উপস্থাপন করো।

তোমরা কি আমদানিকৃত কিছু উপকরণ শনাক্ত করতে পারবে যেগুলোর বিকল্প ভারতে বিকশিত করা যেতে পারে?

সারণি 11.4 : 2009-17 সাল পর্যন্ত ভারতের আমদানির গঠনশৈলী

(শতাংশে)

পণ্যদ্রব্যের সমষ্টি	2009-10	2010-11	2015-16	2016-17
খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত পণ্যসমূহ	3.7	2.9	5.1	5.6
জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল, তেল ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ)	33.2	31.3	25.4	26.7
সার	2.3	1.9	2.1	1.3
কাগজের বোর্ড উৎপাদন ও নিউজ প্রিন্ট	0.5	0.6	0.8	0.9
মূলধনি পণ্য	15.0	13.1	13.0	13.6
অন্যান্য	42.6	47.7	38.1	37.0

উৎস : *Economic Survey 2016-17*

সারণি 11.5 : কিছু সংখ্যক প্রধান পণ্যদ্রব্যাদির আমদানি

(কোটি টাকায়)

পণ্যদ্রব্য	2016-17
সার এবং সার উৎপাদন	33726
ভোজ্যতেল	73048
মণ্ড ও পরিত্যক্ত কাগজ	6537
অ-লৌহবর্গীয় ধাতু	262961
লৌহ ও ইস্পাত	55278
খনিজ তেল, তেল এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ	582762
মুক্তো, মূল্যবান ও স্বল্প মূল্যবান পাথর	159464
ঔষধি ও চিকিৎসা বিষয়ক দ্রব্য	33504
রাসায়নিক দ্রব্য	147350

উৎস : *Economic Survey 2016-17*

বাণিজ্যের দিক (Direction of Trade)

ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও মুখ্য বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সাথে রয়েছে।

2016-17 এর সময়কালে অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল অনুযায়ী বাণিজ্যের তালিকা সারণি 11.6 তে দেখানো হয়েছে।

সারণি 11.6 : ভারতের আমদানি বাণিজ্যের দিক

(কোটি টাকায়)

অঞ্চল	আমদানি সমূহ	
	2010-11	2016-17
ইউরোপ	323857	403972
আফ্রিকা	118612	193327
উত্তর আমেরিকা	100602	195332
লাতিন আমেরিকা	64576	115762
এশিয়া ও এ.শি.য়া.ন	1029881	1544520

উৎস : *Department of Commerce based on DCCI&S provisional data, Economic Survey 2011-12 and 2016-17.*

ভারতের লক্ষ্য হল আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজের অংশীদারিত্বকে দ্বিগুণ করা। আমদানি উদারিকরণ, আমদানি শুল্ক হ্রাস, ডি-লাইসেন্সিং এবং প্রক্রিয়াকরণ থেকে পণ্যের পেটেন্টে (product patents) পরিবর্তন প্রভৃতির মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা শুরু হয়ে গেছে।

কাজ

প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের দেখিয়ে একটি বহুবিধ স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো।

ভারতের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য সমুদ্র ও আকাশপথের দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যদিও বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি ছোটো অংশ নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশে সড়ক পথের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে সমুদ্র বন্দর (Sea Ports as Gateways of International Trade)

ভারতের তিন দিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এবং একটি দীর্ঘ উপকূলরেখা প্রদান করে। জল, সস্তা পরিবহণের জন্য একটি মসৃণ তল প্রদান করে যেখানে কোনো কোলাহল নেই। ভারতে সমুদ্র পথে যাত্রার

চিত্র 11.3 : বন্দরে পণ্য খালাস

এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। পত্তন যার অর্থ বন্দর, কোনো স্থানের নামের পরে পত্তন যুক্ত হয়ে অনেক বন্দর গড়ে ওঠেছে। ভারতের বন্দর সম্পর্কে একটি মজাদার বিষয় হল এর পশ্চিম উপকূলে পূর্ব উপকূলের চেয়ে বেশি বন্দর রয়েছে।

তোমরা কি দু'টি উপকূল বন্দরের অবস্থানের ভিন্নতার কারণ খুঁজে বের করতে পারবে?

যদিও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বন্দরগুলোর ব্যবহার হয়ে আসছে, তবুও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে বন্দরের উত্থান ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা ঔপনিবেশ স্থাপনের পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই কারণে দেশে বন্দরের আয়তন ও গুণমানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে কিছু বন্দর রয়েছে যার প্রভাব ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং কিছুর প্রভাব ক্ষেত্র সীমিত। বর্তমানে ভারতে 12 টি প্রধান বন্দর এবং 200 টি ছোটো বা মাঝারি বন্দর রয়েছে। প্রধান বন্দরগুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নীতি প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করে। ছোটো বন্দরগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নীতি এবং কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধান বন্দরগুলো মোট যাতায়াতের বৃহৎ অংশ পরিচালনা করে।

ব্রিটিশরা এই বন্দরগুলোকে তাদের পশ্চাৎভূমির সম্পদের শোষণ কেন্দ্র রূপে ব্যবহার করত। অভ্যন্তর ভাগে রেলপথের সম্প্রসারণে স্থানীয় বাজারগুলোকে আঞ্চলিক বাজারে, আঞ্চলিক বাজারগুলোকে জাতীয় বাজারে এবং জাতীয় বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে যুক্ত করার সুবিধা প্রদান করেছিল। এই প্রবণতাটি 1947 সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আশা করা হয়েছিল যে দেশের স্বাধীনতা এই প্রবণতাকে বদলে দেবে, কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আলাদা হয়ে যায়, যেমন– করাচি বন্দর পাকিস্তানে এবং চট্টগ্রাম বন্দরটি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। এই ক্ষতিপূরণের জন্য পশ্চিম কান্ডালা এবং পূর্বে হুগলি নদীর তীরে কলকাতার নিকটে ডায়মণ্ড হারবারের মতো অনেকগুলো নতুন বন্দর তৈরি করা হয়েছিল।

এই মুখ্য বিপত্তি সত্ত্বেও, স্বাধীনতার লাভের পরবর্তীকালে ভারতীয় বন্দরগুলো নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে, ভারতীয় বন্দরগুলো প্রচুর পরিমাণে দেশীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যকেও পরিচালনা করছে। অধিকাংশ বন্দরই আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত। পূর্বে বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের দায়িত্ব ছিল সরকারি সংস্থাগুলোর, কিন্তু বন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং এই বন্দরগুলোকে আন্তর্জাতিক স্তরের বন্দরের সমকক্ষ বানানোর প্রয়োজনীয়তায় ভারতের বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভারতীয় বন্দরগুলোর পরিচালিত জাহাজবাহী পণ্যসম্ভারের ধারণ ক্ষমতা 1951 সালে 20 মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2016 সালে 837 মিলিয়ন টনেরও অধিক হয়েছে।

পশ্চাৎভূমিসহ কিছু ভারতীয় বন্দর সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

কচ্ছ উপসাগরের শীর্ষদেশে অবস্থিত **কান্ডালা বন্দর** দেশের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের চাহিদা মেটাতে এবং মুম্বাই বন্দরের চাপ কমাতে একটি মুখ্য বন্দর রূপে বিকশিত হয়েছিল। এই বন্দরটি বিশেষত বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যসমূহ ও সার ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। কান্ডালা বন্দরের চাপ কমাতে ভাদিনারে পুরোদেশীয় তটভূমিতে টার্মিনাল (terminal) তৈরি করা হয়েছে।

পশ্চাৎভূমির সীমানা নির্ধারণ করা কঠিন কারণ এটি কোনো এলাকার ওপরে স্থির নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি বন্দরের পশ্চাৎভূমি অন্যটির সাথে অধিক্রমণ করতে পারে।

মুম্বাই হল একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়যুক্ত দেশের সবচেয়ে বড়ো বন্দর। বন্দরটি মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, উত্তর আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের সাধারণ যাত্রাপথের নিকটে অবস্থিত, যেখান থেকে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ ভাগ পরিচালনা করা হয়। এই বন্দরটি 20 কিমি দীর্ঘ ও 6 -10 কিমি প্রস্থ, যেখানে জাহাজ রাখার জন্য 54টি নোঙ্গার এবং দেশের বৃহত্তম টার্মিনাল রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের কিছু অংশ নিয়ে মুম্বাই বন্দরের মুখ্য পশ্চাৎভূমি গঠিত।

মুম্বাই বন্দরের চাপ হ্রাস করার জন্য একটি পরিপূরক বন্দর হিসাবে নভ: সেবায় **জওহরলাল নেহেরু বন্দর** গড়ে তোলা হয়েছিল। এটি ভারতের বৃহত্তম ধারক বন্দর (container port)।

জুয়ারি মোহনার প্রবেশদ্বারে **মর্মাগও বন্দরটি** অবস্থিত, যা গোয়ার একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। জাপানে লৌহ আকরিক রপ্তানি করার জন্য 1961 সালে বন্দরের পুনর্নির্মাণের পরে এর গুরুত্ব বাড়ে। কঙ্কন রেলপথ নির্মাণ এই বন্দরটির পশ্চাৎভূমিকে যথেষ্ট প্রসারিত করেছে। কর্ণাটক, গোয়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এর পশ্চাৎভূমি গঠন করে।

নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরটি কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত এবং এটি রপ্তানিকৃত লৌহ-আকরিক ও ঘনিভূত লৌহ সরবরাহের চাহিদা পূরণ করে। এটি সার, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যসমূহ, ভোজ্যতেল,

চিত্র 11.4 : ভারত — প্রধান বন্দর ও সমুদ্রপথসমূহ

কফি, চা, কাষ্ঠমণ্ড, সুতা, গ্রানাইট পাথর, গুড় প্রভৃতিও পরিচালনা করে। এই বন্দরের মুখ্য পশ্চাৎভূমি হল কর্ণাটক।

ভেম্বানদ কায়াল, যা "আরব সাগরের রানি (*Queen of the Arabian Sea*) নামে পরিচিত, এর শীর্ষদেশে অবস্থিত **কোচি বন্দরও** একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। সুয়েজ-কলম্বো যাত্রাপথের নিকটবর্তী হওয়ায় এই বন্দরের সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে। এটি কেরালা, দক্ষিণ কর্ণাটক এবং দক্ষিণ পশ্চিম তামিলনাড়ুর চাহিদা পূরণ করে।

কলকাতা বন্দরটি বঙ্গোপসাগর থেকে 128 কিমি অভ্যন্তরে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। মুম্বাই বন্দরের মতো এই বন্দরটিও ব্রিটিশরা গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতা হওয়ায় প্রারম্ভিক সুবিধা পেয়েছিল। বিশাখাপত্তনম, পারাদ্বীপ এবং কলকাতার পরিপূরক বন্দর হলদিয়ার মতো অন্যান্য বন্দরগুলোর দিকে রপ্তানির অভিমুখ পরিবর্তনের কারণে এই বন্দরটি তার গুরুত্ব যথেষ্ট হারিয়ে ফেলেছে।

কলকাতা বন্দর হুগলি নদী দ্বারা আহরিত সিল্ট বা পলির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যা একে সমুদ্রের সাথে যুক্ত হওয়ায় পথ প্রদান করে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ ইত্যাদি এর পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত। এগুলো ছাড়াও, এটি স্থলবেষ্টিত নেপাল ও ভুটানের মতো আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে বন্দরের সুবিধা প্রদান করে।

হলদিয়া বন্দর কলকাতা থেকে 105 কিমি নিম্নপ্রবাহে (downstream) অবস্থিত। কলকাতা বন্দরের চাপ লাঘব করার জন্য এটি নির্মিত হয়েছে। লৌহ আকরিক, কয়লা, খনিজ তেল, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ও সার, পাট, পাটজাত দ্রব্য, তুলা এবং কার্পাস সূতো প্রভৃতির মতো বিশাল আয়তনের জাহাজবাহী পণ্যসম্ভার পরিচালনা করে।

পারাদ্বীপ বন্দরটি কটক থেকে প্রায় 100 কিমি দূরে মহানদী ব-দ্বীপে অবস্থিত। এর পোতাশ্রয় গভীরতম হওয়ায় খুব বড়ো জাহাজ চলাচল করতে বিশেষভাবে উপযুক্ত। এটি মূলত অধিক মাত্রায় লৌহ আকরিক রপ্তানি করার জন্য বিকশিত হয়েছিল। ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ড হল এর পশ্চাৎভূমির অংশ বিশেষ।

বিশাখাপত্তনম বন্দরটি অন্ধ্রপ্রদেশের একটি স্থলবেষ্টিত বন্দর যেখানে কঠিন শিলা ও বালি কেটে একটি খালের সাহায্যে সমুদ্রের সাথে বন্দরটিকে যুক্ত করা হয়েছে। লৌহ আকরিক, খনিজ তেল এবং সাধারণ জাহাজবাহী পণ্যসম্ভার পরিচালনা করার জন্য একটি বহি:পোতাশ্রয় নির্মাণ করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলাঙ্গানা হল এই বন্দরের মুখ্য পশ্চাৎভূমি।

পূর্ব উপকূলের প্রাচীনতম বন্দরগুলোর মধ্যে চেন্নাই বন্দর একটি। এটি 1859 সালে নির্মিত একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়। উপকূলের নিকটে অগভীর জলরাশির কারণে এটি বড়ো জাহাজের পক্ষে উপযোগী নয়। তামিলনাড়ু ও পদুচেরি হল এর পশ্চাৎভূমি।

তামিলনাড়ুতে নবনির্মিত **এন্নোর বন্দর** চেন্নাই এর 25 কিমি উত্তরে চেন্নাই বন্দরের চাপ হ্রাস করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তুতিকোরিন বন্দরের নির্মাণও চেন্নাই বন্দরের চাপ হ্রাস করার জন্য হয়েছিল। এটি বিভিন্ন রকমের জাহাজবাহী পণ্যসম্ভার চলাচলে সাহায্য করে। যার মধ্যে কয়লা, লবণ, খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি প্রভৃতি রয়েছে।

বিমানবন্দর (Airports)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিমান পরিসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দীর্ঘ দূরত্বে উচ্চ মূল্য যুক্ত বা পচনশীল দ্রব্য খুব স্বল্প সময়ে পরিবহণ ও পরিচালন করার সুবিধা প্রদান করে। এটি ভারী ও বিশাল আয়তনের পণ্য পরিবহণের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনুপযুক্ত। এটি অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মহাসাগরীয় যাত্রাপথের তুলনায় এই ক্ষেত্রের অংশগ্রহণকে কমিয়ে দেয়।

দেশে 25টি প্রধান বিমানবন্দর কার্যত ছিল (বার্ষিক প্রতিবেদন 2016-17)। এগুলো হল আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, গোয়া, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই, তিরুবানন্তপুরম, শ্রীনগর, জয়পুর, কালিকট, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর, কোচিন, লখনউ, পুনে, চণ্ডীগড়, ম্যাঙ্গালুরু, বিশাখাপত্তনম, ইন্দোর, পাটনা, ভুবনেশ্বর ও কন্নুর প্রভৃতি।

তোমরা ইতোমধ্যে আগের অধ্যায়ে বিমান পরিবহণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। ভারতে বিমান পরিবহণের মুখ্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে তোমরা পরিবহণ অধ্যায়টির ওপর আলোচনা করো।

কাজ

তোমরা আবাসস্থলের নিকটতম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম লেখো। সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশীয় বিমানবন্দরযুক্ত রাজ্যটি শনাক্ত করো।

এমন চারটি শহর শনাক্ত করো যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক বিমান পথ মিলিত হয় এবং এর কারণও উল্লেখ করো।

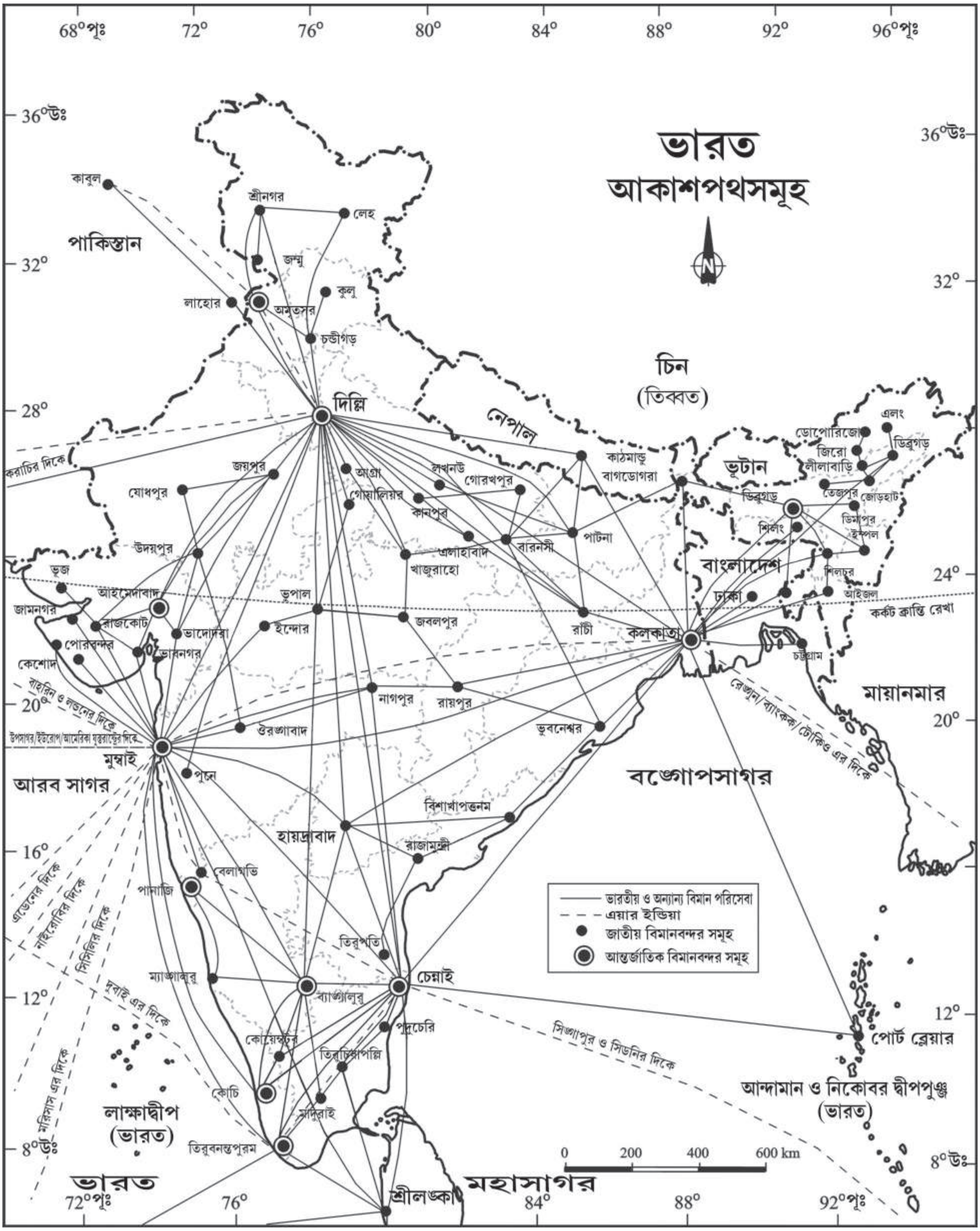

চিত্র 11.5 : ভারত — বিমানপথসমূহ

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

   (i) দু'টি দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যকে বলা হয়—

   (a) আন্তদেশীয় বাণিজ্য
   (b) বহিঃ বাণিজ্য
   (c) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
   (d) স্থানীয় বাণিজ্য

   (ii) নীচের কোন্‌টি একটি স্থল বেষ্টিত পোতাশ্রয়?

   (a) বিশাখাপত্তনম
   (b) মুম্বাই
   (c) এন্নোর
   (d) হলদিয়া

   (iii) ভারতের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা হয়—

   (a) স্থল ও সমুদ্র পথে
   (b) স্থল ও আকাশ পথে
   (c) সমুদ্র ও আকাশ পথে
   (d) সমুদ্র পথে

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

   (i) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করো।
   (ii) বন্দর এবং পোতাশ্রয়ের মধ্যেকার পার্থক্য নির্দেশ করো।
   (iii) পশ্চাৎভূমির অর্থ বর্ণনা করো।
   (iv) বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে আমদানিকৃত গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রির নাম লেখো।
   (v) ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বন্দরসমূহের নাম লেখো।

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।

   (i) ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের গঠনশৈলী বর্ণনা করো।
   (ii) ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত রূপের উপর একটি টীকা লেখো।

একক V

অধ্যায় 12

ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত কিছু বিষয় ও সমস্যাসমূহ (GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE ON SELECTED ISSUES AND PROBLEMS)

পরিবেশগত দূষণ (Environmental Pollution)

মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ থেকে যে শক্তি এবং বস্তুসমূহের নির্গমণ ঘটে তার প্রতিক্রিয়ার ফলে হয় পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। পরিবেশের দূষক উপাদানগুলো যে মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার উপর ভিত্তি করে পরিবেশ দূষণের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। দূষণকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় — (i) বায়ু দূষণ (ii) জল দূষণ (iii) ভূমি (মাটি) দূষণ এবং (iv) শব্দ দূষণ।

জল দূষণ (Water Pollution)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে যে নির্বিচারে জলের ব্যবহার শুরু হয়েছে তা জলের গুণগত মানের যথেষ্ট অবনমন ঘটায়। নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি থেকে যে ভূপৃষ্ঠস্থ জল পাওয়া যায় তা মোটেই বিশুদ্ধ নয়। এতে অল্প পরিমাণ ভাসমান কণা, জৈব এবং অজৈব বস্তু থাকে। জলে যখন এ ধরনের পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন জল দূষিত হয় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায়, জলের নিজস্ব-শোধন ক্ষমতাও জলকে বিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

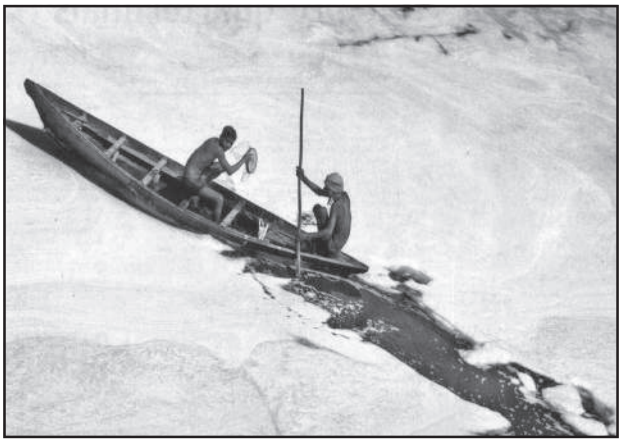

চিত্র 12.1 : নোংরা সরিয়ে এগিয়ে চলা নতুন দিল্লির উপকণ্ঠে মারাত্মক দূষিত যমুনা নদীর ফেনার ব্যাপক আস্তরণের মধ্যে নৌকা চালানো।

যদিও জল দূষণের জন্য দায়ী দূষক উপাদানগুলোর অধিকাংশ প্রাকৃতিক উৎস থেকে সৃষ্টি হয় (ভূমিক্ষয়, ভূমিধস, প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষয় ও পচন ইত্যাদি) তথাপি মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের কারণে সৃষ্ট দূষকসমূহ হল প্রধান মাথা ব্যথার কারণ। মানবজাতি শিল্পায়ন, কৃষি এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জলকে দূষিত করছে। তবে এই সকল কার্যকলাপের মধ্যে শিল্প হল জল দূষণের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যোগানদার।

সারণি 12.1 ঃ দূষণের উৎস ও শ্রেণিবিভাগ

দূষণের শ্রেণি	দূষণে জড়িত উপাদানসমূহ	দূষণের উৎস
বায়ু দূষণ	সালফার এর অক্সাইডসমূহ (SO_2, SO_3), নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন অ্যামোনিয়া, সিসা, অ্যালডিহাইড, অ্যাসবেস্টস এবং বেরিলিয়াম।	কয়লার দহন, পেট্রোল এবং ডিজেল, শিল্প প্রক্রিয়াসমূহ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি নিষ্কাশন প্রভৃতি।
জল দূষণ	দুর্গন্ধ, দ্রবীভূত এবং ভাসমান কঠিন পদার্থসমূহ, অ্যামোনিয়া, এবং ইউরিয়া, নাইট্রেট এবং নাইট্রাইটস ক্লোরাইড, ফ্লুরাইড, কার্বনেট, তেল এবং গ্রিজ, কীটনাশক এবং জীবাণুনাশকের অবশিষ্টাংশ, ট্যানিন, কোলিফোম এমপিএম (ব্যাকটেরিয়ার হিসাব), সালফাইট এবং সালফাইড, ভারী ধাতু যেমন- সিসা, আর্সেনিক, পারদ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ।	নিকাশি নিষ্কাশন, পৌর প্রবাহ, শিল্প কেন্দ্রের বিষাক্ত নিঃসৃত আবর্জনা, কৃষি জমির উপরদিয়ে প্রবাহ এবং পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র।
ভূমি দূষণ	মানুষ এবং প্রাণীদের মল-মূত্রে উপস্থিত ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া, আবর্জনাতে অবস্থিত রোগ বাহকসমূহ, কীটনাশক এবং সারের অবশিষ্টাংশের ক্ষারত্ব, ফ্লুরাইড, তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ।	মানুষের অনুপযুক্ত কার্যকলাপ, অপরিশোধিত শিল্পকেন্দ্রজাত বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা, কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার।
শব্দ দূষণ	উচ্চ পর্যায়ের শব্দ বা সহ্য ক্ষমতার বাইরে।	বিমান, মোটর গাড়ি, ট্রেন এবং বিজ্ঞাপন মাধ্যম।

শিল্পগুলো প্রচুর পরিমাণে অনভিপ্রেত পদার্থের উৎপাদন করে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিল্পজাত বর্জ্য, দূষিত জল, বিষাক্ত গ্যাসসমূহ, রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ, অসংখ্য ভারী ধাতু, ধূলা, ধোঁয়া প্রভৃতি। বেশির ভাগ শিল্পজাত দ্রব্যগুলো প্রবাহমান জলস্রোতে অথবা হ্রদে নিষ্কাশন করা হয়। ফলস্বরূপ, বিষাক্ত উপাদানসমূহ জলাধার, নদী এবং অন্যান্য জলাশয়গুলোতে জমা হয়, যা জলের জৈবিক প্রণালী বিনষ্ট করে। সর্বাধিক জল দূষণকারী শিল্পগুলো হল চর্মশিল্প, কাগজ এবং কাগজের খন্ড, বয়নশিল্প এবং রাসায়নিক শিল্পসমূহ।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়, যেমন অজৈব সার, কীটনাশক এবং আগাছা নাশক ও দূষণকারী পদার্থ। এই রাসায়নিক উপাদানগুলো নদী, হ্রদ এবং জলাশয়ের জলের সাথে মিশে। এই রাসায়নিক উপাদানগুলো ক্রমে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ভূ-গর্ভস্থ জলে প্রবাহিত হয়। রাসায়নিক সারগুলো ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ যেমন — তীর্থযাত্রা, ধর্মীয় মেলা, পর্যটন প্রভৃতিও জল দূষণের কারণ। ভারতে প্রায় সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের উৎসগুলো দূষিত এবং এই

সারণি 12.2 ঃ গঙ্গা ও যমুনা নদীতে দূষণের উৎসসমূহ

নদী এবং রাজ্য	দূষণের বিস্তার	দূষণের প্রকৃতি	প্রধান দূষক সমূহ
গঙ্গা (উত্তর প্রদেশ) বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ	(a) কানপুরে নিম্নপ্রবাহ (b) বারানসীতে নিম্নপ্রবাহ (c) ফারাক্কা ব্যারেজ	(1) কানপুরের মতো শহর থেকে আগত শিল্পজাত দূষণ। (2) পৌর অঞ্চলগুলো থেকে আগত গার্হস্থ্য বর্জ্য। (3) নদীতে মৃত পশুর দেহ নিক্ষেপ।	কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা এবং কলকাতা শহরগুলোর গার্হস্থ্য বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ করে।
যমুনা (দিল্লি) এবং (উত্তর প্রদেশ)	(a) দিল্লি থেকে চম্বল সঙ্গমস্থল পর্যন্ত (b) মথুরা এবং আগ্রা	(1) হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ দ্বারা সেচের জন্য সংগৃহীত জল। (2) কৃষিজ কার্যকলাপের ফলস্বরূপ যমুনার জলে উচ্চমাত্রায় সুক্ষ দূষকের প্রবাহ। (3) দিল্লি শহরের গার্হস্থ্য ও শিল্পজাত বর্জ্যের নদীতে প্রবাহ।	দিল্লির গার্হস্থ্য বর্জ্য ফেলা হয়।

জল মানুষের ব্যবহারের জন্য অযোগ্য।

জল দূষণ হল বিভিন্ন জলবাহিত রোগের উৎস। যে রোগগুলো মূলত দূষিত জলের প্রভাবে হয়ে থাকে সেগুলি হল- ডায়রিয়া, আন্ত্রিক কৃমি, হেপাটাইটিস প্রভৃতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ভারতের সংক্রামক রোগের প্রায় এক-চতুর্থাংশই হল জলবাহিত রোগ। যদিও সমস্ত নদীতেই দূষণ একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তা সত্ত্বেও ভারতের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর ক্ষেত্রে এই দূষণ বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গার জলের গুণগত অবস্থার উন্নতিকরণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্বচ্ছ গঙ্গার জন্য জাতীয় মিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কারণেই 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে।

নমামি গঙ্গে কর্মসূচি (Namami Gange Programme)

নদী হিসেবে গঙ্গার জাতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এই নদীটির কার্যকরীভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার 'নমামি গঙ্গে কর্মসূচি'টি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে শুরু করা হয় —

- শহরগুলোতে নর্দমা পরিশোধন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- শিল্পকেন্দ্রের নিঃসৃত আবর্জনাকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- নদীর সম্মুখভাগের উন্নয়ন সাধন।
- নদীর তীর বারবার জৈব বৈচিত্র্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ করা।
- নদীর পৃষ্ঠতলের সাফাই করা।
- উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে 'গঙ্গা গ্রামসমূহ' এর উন্নয়ন করা এবং
- ধর্মীয় রীতিনীতির নামে নদীতে দূষিত পদার্থের সংযোজনকে এড়ানোর জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বায়ুদূষণ (Air Pollution)

বায়ুদূষণ হল বায়ুতে দূষণকারী পদার্থ যেমন— ধূলা, উদ্বায়ী পদার্থ, গ্যাস, কুয়াশা, দুর্গন্ধ, ধোঁয়া বা বাষ্প প্রভৃতি যখন যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুতে দীর্ঘ সময়কাল ধরে যুক্ত হয় যা উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূল এবং সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকারক। শক্তির উৎস হিসেবে যখন বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, তখন বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমণ বেড়ে যায়, যার ফলশ্রুতিই হল বায়ুদূষণ। জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, খনি খনন, এবং শিল্পসমূহ হল বায়ু দূষণের প্রধান উৎস। এই প্রক্রিয়াগুলো সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড, হাইড্রো-কার্বন, কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সিসা এবং অ্যাসবেস্টস বাতাসে ছাড়ে। বায়ুদূষণ শ্বসন, স্নায়বিক এবং সংবহন তন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে। নগর অঞ্চলে যে ধোঁয়াযুক্ত কুয়াশা দেখা যায় তাকে শহুরে ধোঁয়াশা বলে, যা বায়ুদূষণের ফলেই

হয়ে থাকে। এটি মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলে। বায়ুদূষণের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টিও হতে পারে। শহুরে পরিবেশের বৃষ্টির জলের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টির পিএইচ মান (pH value) সর্বদা পরবর্তী বৃষ্টিপাতগুলোর তুলনায় কম থাকে।

শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

শব্দ দূষণ হল মানুষের পক্ষে অসহনীয় এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যা বিভিন্ন শব্দের উৎস থেকে উৎপত্তি হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ফলে শব্দ দূষণের সমস্যাটি একটি গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শব্দ দূষণের বিভিন্ন উৎসগুলো হল- বিভিন্ন কারখানা, যান্ত্রিক নির্মাণকার্য এবং ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়া, মোটরগাড়ি এবং বিমান প্রভৃতি। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় অন্তর কতগুলো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ দূষণ ঘটায় যেমন সাইরেন, বিভিন্ন উৎসবে এবং কমিউনিটির কর্মসূচিতে

চিত্র 12.2 পঞ্চপটমলাই এর বক্সাইট খনিতে শব্দ নিরীক্ষণ

ব্যবহৃত লাউড স্পিকারও। সুস্থিত শব্দের মাত্রার পরিমাপ করা হয় ডেসিবল (dB) এককের সাহায্যে।

এই সকল উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো উপদ্রব হল যানবাহনের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ দূষণ, কারণ এর তীব্রতা এবং প্রকৃতি কিছু উপাদানের উপর নির্ভর করে, যেমন— বিমানের প্রকৃতি, যানবাহন, রেলগাড়ি এবং রাস্তার অবস্থার পাশাপাশি যানবাহনের অবস্থার সাথে (মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে) সম্পর্কযুক্ত। সামুদ্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রে, শব্দ দূষণ পোতাশ্রয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে কারণ সেখানে জাহাজ থেকে মাল খালাস ও বোঝাই করা হয়। শিল্প কারখানাগুলো থেকেও শব্দ দূষণ ঘটে থাকে কিন্তু তাদের প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে দূষণের তীব্রতা। শব্দ দূষণে অবস্থান - নির্দিষ্ট এবং এর তীব্রতা শব্দ দূষণের উৎস যেমন শিল্পাঞ্চল, পরিবহণপথ,

তোমরা জানো কি?

সমুদ্রগুলো 40 বছর আগের তুলনায় এখন 10 গুণ বেশি কোলাহলপূর্ণ

স্ক্রিপ্স ইন্সটিটিউট অফ্ ওমেনোগ্রাফির একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সামুদ্রিক কোলাহল 1960 এর দশক থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সিন উইগিনস্, জন হিলডবোল্ড এবং হোয়েল একোসটিক্র, কলোরাডোর মার্ক ম্যাকডোনাল্ডের সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌসেনার গোপন নথিপত্র পাঠের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশ্বব্যাপী জাহাজ চলাচলের কারণে সমুদ্রতলদেশীয় শব্দ দূষণ অনেকটা বেড়েছে। ওনারা বলেন, বিশ্বের জনসংখ্যা সাম্প্রতিক দশকে বৃদ্ধি পাওয়াতে সমুদ্র তলদেশীয় অঞ্চলটি আরও বেশি কোলাহলপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। এর সাথে এই বিশাল পরিমাণ কোলাহলের ফলে সামুদ্রিক জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা এখনও অজানা রয়ে গেছে, তার কথাও বলেছেন। তথ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, সমুদ্রতলদেশীয় কোলাহল 1960 এর দশক থেকে দশগুণ বেড়েছে। তাঁরা বলেন যে 2003-04 সালের কোলাহল 1964-66 সালের চাইতে 10 থেকে 12 ডেসিবল বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণটি হতে পারে বিশ্বব্যাপী জাহাজ চলাচলের ব্যাপক বৃদ্ধি, মহাসাগরগুলোতে জাহাজের নিয়মিত চলাচল এবং জলযানের দ্রুত গতি।

বিমানবন্দর প্রভৃতি থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। শব্দ দূষণ ভারতের বড়ো বড়ো নগর ও মহানগরগুলোতে যথেষ্ট ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরের বর্জ্যের নিষ্পত্তি (Urban Waste Disposal)

শহর অঞ্চলগুলোতে সাধারণত জনাধিক্য, ঘিঞ্জিবসতি, দ্রুত বর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার উপযোগী সুযোগ সুবিধার অভাব এবং এর পরিণামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নগন্য অবস্থা ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুর উপস্থিতি দেখা যায়। কঠিন বর্জ্য পদার্থের কারণে পরিবেশ দূষণ এখন বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার মূল কারণ হল, বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভুত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণের বিরাট বৃদ্ধি ঘটছে। কঠিন বর্জ্য বলতে বিভিন্ন পুরাতন এবং ব্যবহৃত সামগ্রী যেমন — ক্ষুদ্র বিবর্ণ ধাতুর টুকরা, ভাঙ্গা কাঁচের সামগ্রী, প্লাস্টিকের পাত্র, পলিথিনের ব্যাগ, ছাই, ফ্লোপিসমূহ, সিডি প্রভৃতি যা বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত করা হয়। এই সকল বাতিল সামগ্রী আবর্জনা, নোংরা এবং জঞ্জাল প্রভৃতি নামে পরিচিত এবং এগুলোকে দুটি উৎস থেকে নিষ্কাশন করা হয়। এগুলি হল — (i) গৃহস্থালি বা গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং (ii) শিল্পকেন্দ্র বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। গৃহস্থালির বর্জ্য সমূহ হয় সরকারি জমিতে বা ব্যক্তিগত ঠিকাদারদের মালিকানাধীন স্থানে ফেলা হয়।

অপরদিকে, শিল্প ইউনিটগুলোতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পদার্থসমূহ সংগ্রহ

ও ব্যবস্থাপনা করা হয় সরকারি (মিউনিসিপাল) ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং এদেরকে সরকারের অধীনস্থ নিম্ন জমিতে (গর্ত ভরাট করার অঞ্চলে)। শিল্পক্ষেত্রে, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে এবং দালানবাড়ি নির্মাণ অথবা দালান ভাঙ্গার ফলে, যে বিশাল পরিমাণ ছাই এবং ধ্বংসাবশেষ সৃষ্টি হয় সেগুলো ভয়ানক প্রতিক্রিয়াযুক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে। কঠিন বর্জ্য থেকে নোংরা গন্ধ বের হয় এবং মাছি , ইঁদুর ও কাঠবিড়ালির ন্যায় তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত প্রাণীর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে যারা টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, ডায়ারিয়া, ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রভৃতি রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

এই ধরনের বর্জ্য নিয়মিতভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং যখন এগুলো অসাবধানতায় ফেলে রাখা হয়, তখন বাতাসের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির জলের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে।

শহরের কেন্দ্রগুলোর চারপাশে শিল্প ইউনিটের কেন্দ্রীভবন শিল্পজাত বর্জ্যের নিষ্কাশনের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। শিল্পজাত বর্জ্য নদীতে ফেললে জলদূষণ হয়। নগরকেন্দ্রিক শিল্পগুলো থেকে নদীতে যে দূষণ ঘটে এবং নর্দমার ময়লা জলের প্রভাবে যে দূষণ হয় তা নদীর নিম্নপ্রবাহে ভয়ানক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

শহরের বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ভারতের ক্ষেত্রে একটি গভীর সমস্যা। মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই,ব্যাঙ্গালুরু প্রভৃতি মহানগরগুলো থেকে প্রায় 90 শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি করা হয়। কিন্তু, দেশের অধিকাংশ শহর ও নগরগুলোতে প্রায় 30 থেকে 50 শতাংশ বর্জ্য উৎপাদন হয় ও এই অবস্থাতেই রাস্তার পাশে, বাড়িঘরের মাঝের মুক্ত জমিতে এবং পরিত্যক্ত জমিতে জমা হয় যা গভীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সৃষ্টি করে।

আমি সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে একতালা থেকে দোতলায় চলে এসেছি কিন্তু স্তুপীকৃত আবর্জনা এখান থেকে দৃশ্যটি দেখতে বাধা সৃষ্টি করছে।

একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ দৌরালা বাস্তু সংস্থানের পুনরুদ্ধার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি আদর্শ উদাহরণ

'দূষণকারীদের মূল্য দিতে হয়', সর্বজনীন নিয়ম অনুসরণ করে মীরাটের নিকটবর্তী দৌরালায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং মানব স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রচেষ্টাগুলো এখন ফলপ্রসূ হয়েছে। এক্ষেত্রে মীরাটের একটি এনজিও বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মডেল রূপায়ণ করেছিল। দৌরালার শিল্প কর্মকর্তা এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সভায় বাস্তুতন্ত্র বিনষ্টের পরিণাম নিয়ে আলোচনা হয়। জোরালো যুক্তি, নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা এবং জনসাধারণের প্রবল দাবির চাপে এই গ্রামের বারো হাজার অধিবাসীদের নব জীবনের সুযোগ ঘটেছে। 2003 সালে দৌরালাবাসীদের দৈন্যদশা সুশীল সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। এই গ্রামের ভৌমজল ভারী ধাতু দ্বারা দূষিত হয়েছিল। এর পেছনে কারণ ছিল দৌরালায় শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য জল ভৌম জলস্তরের সাথে মিশছিল। এনজিওসমূহ প্রতি ঘরে ঘরে অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমীক্ষা করেছিল এবং একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল। সংগঠনটি, গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে বসে স্বাস্থ্য সমস্যার সহনশীল সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়াস করেছিল। শিল্পোদ্যোগক্তারা বাস্তুতন্ত্রের অবনতি রোধ করার জন্য খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিল। গ্রামের জলের ট্যাংকের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল এবং গ্রামের লোকদের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য 900 মিটার দীর্ঘ একটি অতিরিক্ত পাইপ লাইন বসানো হয়েছিল। গ্রামের নোংরাপূর্ণ পুকুরটি সংস্কার করা হয়েছিল এবং এটিকে পলিমুক্ত করে পুনরায় জলপূর্ণ করা হয়েছিল। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য কাঠামো নির্মাণ করা হয় যা বর্ষায় ভৌমজলের দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 1000 টি গাছ রোপণ করা হয়েছে যা পরিবেশকে নির্মল করেছে।

এই সকল বর্জ্যকে সম্পদরূপে গণ্য করা উচিত এবং এদেরকে শক্তি উৎপাদনে ও জৈবসার প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা উচিত। অ-সুরক্ষিত বর্জ্যগুলো ধীরে ধীরে রাসায়নিক পরিবর্তনে সক্রিয় হয়ে বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত মিথেন সহ অন্য জৈব গ্যাস পরিবেশে মুক্ত করে।

কাজ

আমরা কী ছুঁড়ে ফেলি? কেন ফেলি?

আমাদের বর্জ্য পদার্থসমূহের কী পরিণতি হয়?

কাগজ সংগ্রহকারীরা কেন আবর্জনার স্তূপ ঘাঁটে?

আমাদের শহরের বর্জ্যগুলোর কি কোনো মূল্য আছে?

সারণি 12.3 ঃ মুম্বাইয়ের মাহিমে শহুরে বর্জ্যের একটি দৃশ্য

গ্রাম - শহর পরিযান (Rural-Urban Migration)

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের দিকে জনসংখ্যা বিভিন্ন কারণে চলে আসে। এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে শহরাঞ্চলে শ্রমের অধিক চাহিদা, গ্রামাঞ্চলে চাকরির কম সুবিধা এবং গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে উন্নয়নের ধরনে ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি। ভারতে নগরগুলোতে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোটো ও মাঝারি শহরগুলোতে সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতার কারণে দরিদ্র জনসাধারণ সাধারণত এই সকল ছোটো শহরগুলোতে বসবাস না করে সরাসরি মহানগরগুলোতে জীবিকার সন্ধানে চলে আসে।

এই বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য নিম্নে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা পেশ করা হল। এটি সযত্নে পড়ো এবং গ্রাম থেকে শহরে পরিযান প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করো।

একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা (A Case Study)

রমেশ চুক্তির ভিত্তিতে তালচেরে (ওড়িশার কয়লা অঞ্চল) একটি নির্মাণস্থলে একজন ঢালাই শ্রমিক হিসাবে গত দুই বছর ধরে কাজ করছে। সে ঠিকাদারের সাথে বিভিন্ন স্থানে যেমন — সুরাট, মুম্বাই, গান্ধিনগর, ভারুচ, জামনগর এবং এমন আরও অনেক স্থানে গিয়ে কাজ করত। সে নিজের গ্রামে পিতার কাছে প্রতি বছর 20,000 টাকা পাঠাত। তার প্রেরিত অর্থ পরিবারের দৈনন্দিন ভোগ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা প্রভৃতি কাজে খরচ করা হত। রমেশের পাঠানো অর্থের কিছুটা কৃষিকাজ, জমি ক্রয় এবং দালান নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্যও ব্যবহার করা হত। রমেশের পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। পনেরো বছর আগে, রমেশের পরিবারিক অবস্থার চিত্রটা ছিল ভিন্ন। সেই সময় পরিবারটি খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছিল। তার তিন ভাই এবং তার পরিবার তিন একর জমি নিয়েই বাঁচার লড়াই করছিল। নবম শ্রেণির পর রমেশকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছিল। বিবাহের পর রমেশ আরো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল।

তোমরা জানো কি?

বর্তমান সময়ে, বিশ্বের ছয় বিলিয়ন মোট জনসংখ্যার মধ্যে 47 শতাংশ শহরে বসবাস করে এবং নিকট ভবিষ্যতে শহরগুলোর সাথে আরও জনসংখ্যা যুক্ত হবে। 2008 সাল নাগাদ এই অনুপাত 50 শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শহরের জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির প্রভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হবে শহরাঞ্চলগুলোকে আরো উন্নততর বসবাসের জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে যেখানে প্রত্যাশিত গুণমানযুক্ত জীবন নির্বাহের উপযোগী কাম্য পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাগুলো উপস্থিত থাকবে।

2050 সাল নাগাদ, বিশ্বের জনসংখ্যার আনুমানিক দুই-তৃতীয়াংশ শহরাঞ্চলে বাস করবে। এমনকি শহরের জায়গায়, পরিকাঠামোতেও সম্পদের ওপর আরো চাপ বাড়বে।এর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়বে শহরের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, অপরাধজনিত সমস্যা এবং শহরের দারিদ্রের উপর। শহরের জনসংখ্যা কতগুলো কারণে বৃদ্ধি পায়। সে কারণগুলো হল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি (যখন জন্ম হার মৃত্যু হারকে ছাপিয়ে যায়), নিট শহরমুখী অভিবাসন (শহর থেকে যত মানুষ অন্যত্র চলে যায় তার চাইতে বেশি মানুষ শহরে এসে বসতি গড়ে) এবং শহর এলাকার সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলকে শহরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনসংখ্যার হিসেব থেকে দেখা গেছে, 1961 সালের পর শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মোটামুটি 60 শতাংশ কারণ জানা গেছে এবং দেখা গেছে এর মধ্যে 29 শতাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা বেড়েছে।

এই সময়ে, সে তার গ্রামের কয়েকজন সফল বহিঃ পরিযায়ীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল যারা লুধিয়ানায় কাজ করছিল এবং গ্রামে তাদের পরিবারকে অর্থ ও কিছু ভোগ্যপণ্য প্রেরণের মাধ্যমে সহায়তা করছিল। সেই সময় রমেশ, পরিবারের শোচনীয় দরিদ্রতা এবং লুধিয়ানায় চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়ে সে পাঞ্জাবে চলে যায়। 1988 সালে সে সেখানে একটি পশমের কাপড় তৈরির কারখানায় প্রতিদিন ২০ টাকা মজুরিতে ছয়মাস কাজ করেছিল। এই স্বল্প আয়ে তার ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের সমস্যার পাশাপাশি সে নতুন সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়েও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এর কিছুদিন পর রমেশ বন্ধুদের পরামর্শক্রমে লুধিয়ানা থেকে সুরাটে গিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সুরাটে ঝালাই করার কাজ শিখেছিল এবং এরপর একই ঠিকাদারের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করছিল। যদিও রমেশের গ্রামে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, তথাপি সে তার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে থাকার বেদনা সহ্য করছে। সে পরিবারের সদস্যদের, তার সাথে নিয়ে যেতে পারেনি কারণ, তার কাজ অস্থায়ী প্রকৃতির এবং তার কোনো স্থায়ী কর্মসংস্থান নেই।

মন্তব্য (Comments)

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রমেশের মতো গরিব, অর্ধ শিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিকেরা প্রায়শই গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে স্বল্প মজুরিতে ছোটোখাটো কাজ করার জন্য পাড়ি দেয়। যেহেতু গন্তব্যস্থলে পরিবার চালানোর জন্য মানানসই মজুরি পায় না তাই পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের স্ত্রীদের গ্রামেই রেখে আসে। এই কারণে, গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনে পুরুষদের প্রভাব বেশি।

বস্তির সমস্যাসমূহ (Problems of Slums)

"নগর বা নগর কেন্দ্র"-- এর ধারণাকে জনবসতি ভূগোলে (Settlement Geography) সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'গ্রামীণ'-এর সাথে পার্থক্য বোঝাতে। এই বিষয়ে বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তোমরা অবহিত হয়েছ। তোমরা "মানব ভূগোলের মূলতত্ত্ব" শিরোনামের বইতেও পড়েছ যে এই ধারণাটিকে বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

তোমরা কি কোনো বস্তি দেখেছ? তোমার শহরে একটি বস্তি পরিদর্শন করো এবং বস্তিবাসীরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় সেই সম্পর্কে লেখো।

ধারাভি-এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি (Dharavi–Asia's Largest Slum)

"…. বাসগুলো শুধু কর্ণবিদারক শব্দ করে বস্তির চৌহুদ্দি ছুঁয়ে চলে যায়। অটোরিক্‌শা চলাচল করতে পারে না। ধারাভি মধ্য বোম্বের একটি অংশ যেখানে তিন চাকার গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বস্তির মাঝ দিয়ে কেবলমাত্র একটি প্রধান সড়ক অতিক্রম করেছে, এটি 'নব্বই ফুট রাস্তা' এই ভুল নামে খ্যাত, যা রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্যের বেশির ভাগ অর্ধেকের চাইতেও কম হ্রাস

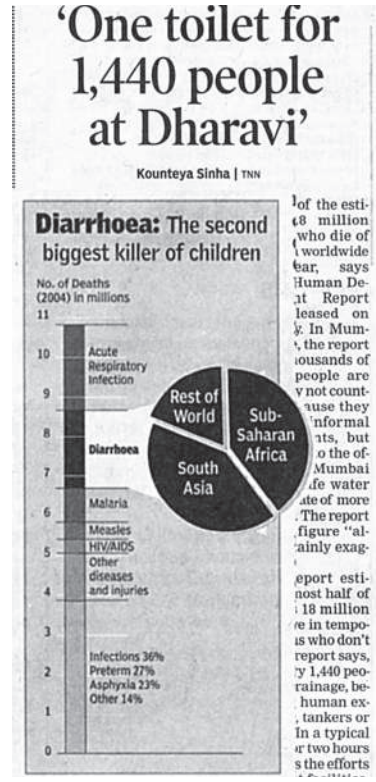

পেয়ে গেছে। পাশের কিছু অলিগলি এত সংকীর্ণ যে, এমনকি একটি সাইকেলও অতিক্রম করতে পারে না।

সমগ্র বস্তিটি অস্থায়ীভাবে নির্মিত ভবন নিয়ে তৈরি যা দুই অথবা তিনতলাযুক্ত এবং মরিচে পড়া লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরের অংশে যেতে হয়। এখানে একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে পুরো পরিবার বসবাস করে। কখনো কখনো একই পরিবারের বারো বা ততোধিক লোকের থাকার ব্যবস্থা করা হয় একটি মাত্র কক্ষে। এটি অনেকটা ভিক্টোরিয়ান লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের শিল্প এলাকার আবাসের ক্রান্তীয় সংস্করণ। কিন্তু ধারাভি খুবই নিরাশাজনক রহস্যের কেন্দ্রস্থল। বিত্ত ও বৈভবপূর্ণ মুম্বাই নির্মাণে এই বস্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ছায়াহীন, বৃক্ষহীন সূর্যালোক, অসংগৃহীত আবর্জনা, নোংরা জলের আবদ্ধ ডোবা যেখানে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী যেমন— চকচকে কালো কাক ও লম্বা ধূসর বর্ণের ইঁদুর রয়েছে। এই স্থানে ভারতের কয়েকটি খুব সুন্দর, মূল্যবান এবং ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা হয়। ধারাভিতে সুক্ষ্ম সিরামিক ও মৃৎশিল্প, সুক্ষ্ম সুতার কাজ ও জরির কাজ, আধুনিক চর্মদ্রব্য, উচ্চ ফ্যাশনের পোশাক, সুক্ষ্মভাবে তৈরি ধাতব কাজ, উৎকৃষ্ট গহনার সেটিংস, কাঠের খোদাই এবং আসবাবপত্র তৈরি হয় যা ভারতের এবং বিদেশের সবচেয়ে ধনীদের ঘরেও প্রবেশাধিকার পায়।

ধারভি হল সমুদ্রের একটি অংশ যা বর্জ্য পদার্থ দ্বারা ভরাট করা হয়েছে এবং বর্জ্যসমূহ এই অঞ্চলে বসবাস করতে আসা জনগণের সৃষ্ট বর্জ্য। এদের মধ্যে অধিকাংশ তপশিলি জাতি এবং দরিদ্র মুসলমান ছিল। এখানে ২০ মিটার উঁচু জায়গায় এলো মেলোভাবে নির্মিত ঢেউখেলানো ধাতুর ভবনগুলো রয়েছে যেগুলো চামড়া শোধন এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেখানে মনোরম স্থানও রয়েছে, কিন্তু পচনশীল আবর্জনা সর্বত্রই রয়েছে ..."।

(Seabrook, 1996, pp. 50, 51-52)

শহর ও গ্রামীণ বসতি অঞ্চলসমূহের কার্যাবলী ভিন্ন ছিল। আবার কখনো কখনো তারা একে অপরের পরিপূরক হত। এগুলো ছাড়াও গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে দুটি পৃথক সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পার্থক্যের ধারা বর্তমান।

ভারতে গ্রামীণ জনসংখ্যার (2011 সালের মোট জনসংখ্যার 69 শতাংশ) আধিক্য রয়েছে এবং যেখানে মহাত্মা গান্ধি গ্রামগুলোকে আদর্শ প্রজাতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন, তা সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকাগুলো এখনও অর্থনীতির প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে রয়েছে। এখানে শহরের মূল কেন্দ্রগুলোর পরিশিষ্ট হিসেবে গ্রামগুলো টিকে আছে।

এর থেকে ধারণা হতে পারে গ্রাম ভারতের বিপরীতে নগর কেন্দ্রগুলো এক রৈখিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিপরীত দিকে, ভারতের নগর কেন্দ্রগুলো অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নের অন্য সূচকসমূহে অনেক বেশি পার্থক্যযুক্ত। সর্বাগ্রে নগর কেন্দ্রগুলোতে ফার্ম হাউস এবং উচ্চ আয়যুক্ত শ্রেণির লোকের বসতি, যেখানে প্রশস্ত সড়ক, স্ট্রীট লাইট, জল এবং শৌচ ব্যবস্থার সুবিধা, খোলা জায়গা, ব্যক্তিগত সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে। নগর কেন্দ্রের অপর প্রান্তে রয়েছে বস্তিগুলো 'কুঁড়ে ঘর' এবং কুটীরের সমাহার। এই অঞ্চলগুলোতে সেসব লোকজন বসবাস করতে বাধ্য হয় যারা গ্রামীণ এলাকা থেকে এই সকল নগরকেন্দ্রিক এলাকায় জীবিকার সন্ধানে চলে আসে। কিন্তু এই সকল স্থানে ঘর ভাড়া খুব বেশি এবং জমির দরও বেশি। তাই তারা উপযুক্ত মাথা গোঁজার জায়গা জোগাড় করতে পারে না। এই কারণে তারা পরিবেশগত বসবাসের অনুপযুক্ত ও মন্দ স্থান দখল করে বসতি স্থাপন করে।

বস্তিগুলো হল এমন বসত অঞ্চল যার পছন্দ ন্যূনতম, জরাজীর্ণ বাড়িঘর, দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বায়ু চলাচল ব্যবস্থার অভাব, প্রাথমিক সুযোগ সুবিধার অভাব, যেমন পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং শৌচালয়ের সুবিধা প্রভৃতি। প্রকাশ্যে মলত্যাগ, অপরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও জনাকীর্ণ সংকীর্ণ রাস্তাঘাট এবং গুরুতর স্বাস্থ্য, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা, বস্তিগুলোতে বিরাজ করে। 'স্বচ্ছভারত অভিযান (SBM) হল ভারত সরকারের একটি কর্মসূচি যা 'নগর নবীকরণ অভিযান'—এর অংশ হিসেবে শহরে বস্তিগুলোতে কার্যকর করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হল বস্তিগুলোতে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। উপরন্তু বস্তিতে বসবাসকারী লোকেরা কম মজুরিতে, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শহরের অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। ফলস্বরূপ তারা অপুষ্টিতে ভোগে এবং বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা ও রোগের সহজ শিকার হয়। তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাতে পারে না। অভাব-অনটনের কারণে তারা মাদক, মদ ও অপরাধ জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও দারিদ্র্যের কারণে বস্তিবাসীদের জীবনে পলায়নী প্রবৃত্তি, অনীহা দেখা যায়। পরিণতিতে, শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সামাজিক দিক থেকে বহিষ্কারের ঘটনা বেড়ে যায়।

বস্তির ছেলে-মেয়েরা কেন বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়?

ভূমির অবক্ষয় বা অবনমন (Land Degradation)

কৃষি জমি জোগানের সীমাবদ্ধতার কারণেই নয় কৃষি জমির গুণগত মান হ্রাসের ফলেও কৃষি জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকা ক্ষয়, জল জমে থাকা বা জলমগ্নতা, জমির লবণাক্ততা এবং ক্ষারকীয়তা জমির গুণমানের অবনমন ঘটায়। যদি জমিগুলোর উর্বরতা রক্ষার ব্যবস্থা না করেই ক্রমাগত ব্যবহার করা হয় তবে কী ঘটবে? সেক্ষেত্রে জমির অবক্ষয় হয় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। জমির অবনমন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস যা অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে ঘটে।

যদিও সকল অবক্ষয়িত ভূমি পতিত জমি নয়, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হারে অবক্ষয় ঘটতে থাকলে সেটা পতিত জমিতে রূপান্তরিত হবে।

ভূমির অবক্ষয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। সেগুলো হল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট। জাতীয় দূরসংবেদন কেন্দ্র (National Remote Sensing Centre, NRSC) দূর সংবেদন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে পতিত জমির শ্রেণিবিভাগ করে এবং এগুলোর সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুসারে শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব। সংকীর্ণ খাত বা র‍্যাভাইন ভূমি (gullied / ravinous land), মরু বা উপকূলবর্তী বালি, উন্মুক্ত পাহাড়ি এলাকাসমূহ, খাড়া ঢাল যুক্ত ভূমি, এবং হিমবাহের এলাকাসমূহ হল কিছু পতিত জমির প্রকারভেদ যেগুলো প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ দ্বারা পতিত জমিতে পরিণত হয়। এছাড়াও অন্যান্য কিছু অবক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি রয়েছে যা জলমগ্ন এবং জলাভূমি বিশিষ্ট

কাজ

সারণি 12.3 -এ প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি পাই চিত্র তৈরি করো যেখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট চাষযোগ্য পতিত জমির চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি 12.3 - বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত পতিত জমির শ্রেণিবিভাগ

বিষয়সমূহ	ভৌগোলিক এলাকার শতাংশ হারে
মোট পতিত জমি	17.98
উন্মুক্ত এবং চাষ অযোগ্য পতিত জমি	2.18
প্রাকৃতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত চাষযোগ্য পতিত জমি	2.4
প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট অবক্ষয়প্রাপ্ত চাষযোগ্য পতিত জমি	7.51
মনুষ্য সৃষ্ট কারণে অবক্ষয়প্রাপ্ত চাষযোগ্য পতিত জমি	5.88
মোট অবক্ষয়প্রাপ্ত চাষযোগ্য পতিত জমি	15.8

উৎস : Calculated from NRSA Wasteland Atlas, 2000

এলাকা সমূহ, লবণাক্ত ও ক্ষারকীয় জমি এবং ঝোপঝাড়যুক্ত বা ঝোপঝাড় বিহীন জমি যেগুলো পতিত জমিতে রূপান্তরের পেছনে প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট কারণসমূহ দায়ী।

এছাড়াও আরো কিছু ধরনের পতিত জমি রয়েছে যেমন- অবক্ষয়িত জুমচাষ অঞ্চল, অবক্ষয়প্রাপ্ত বাগিচা চাষ অঞ্চলের জমি, অবক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমি এবং খনন ও শিল্পভিত্তিক পতিত জমি প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে। সারণি 12.3 তে দেখা যায় যে, যেসকল পতিত জমি মনুষ্যসৃষ্ট সেগুলো প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট পতিত জমির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা (A Case Study)

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমতম প্রান্তের কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে ঝাবুয়া জেলাটি অবস্থিত। এটি ভারতের পাঁচটি সর্বাধিক অনগ্রসর জেলার মধ্যে অন্যতম। এর মূল বৈশিষ্ট্য হল এখানে উপজাতি জনগণের (প্রধানত ভীলের) বসবাস বেশি। এখানকার জনগণ দরিদ্র যা প্রধানত সম্পদের অবক্ষয়, বনভূমি ও ভূমি উভয়ের গুণগতমান হ্রাস পাওয়ার ফলে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। এই কার্যক্রম ঝাবুয়া জেলাতে সফলতার সঙ্গে রূপায়ণ করা হয়েছে যা ভূমির অবনমন প্রতিরোধ করতে এবং মৃত্তিকার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। জলবিভাজিকা পরিচালন কার্যক্রম- ভূমি, জল এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা ও সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার উন্নতি ঘটায়। বিগত পাঁচ বছরে শুধু গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে কর্মসূচিটি ঝাবুয়া জেলার আওতাধীন 20 শতাংশ এলাকা (রাজীব গান্ধি মিশন ফর ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে রূপায়িত) বিশোধন করে।

পেটলাওয়াদ ব্লকটি ঝাবুয়া জেলার একেবারে উত্তরে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলটি একটি মজাদার এবং সফল ঘটনার সাক্ষ্য বয়ে বেড়ায় যেখানে জলবিভাজিকা পরিচালন কার্যক্রম সরকার এনজিওর অংশীদারিত্বে এবং সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পেটলাওয়াদ ব্লকের ভীল সম্প্রদায়ের লোকেরা উদাহরণস্বরূপ (কারাভাটগ্রামের সাটবুন্ডি মহল্লা) তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সৃষ্ট সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থানের মাধ্যমে (Common Property Resource) একটি বিশাল অংশকে পুনর্জীবিত করে। প্রতিটি পরিবার সর্বজনীন মালিকানাধীন সম্পত্তিতে একটি করে গাছ লাগিয়েছিল এবং দেখাশোনা করেছিল। তারা পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত ঘাসও পশুচারণ ভূমিতে রোপণ করেছে। তারা এসকল ভূমির চারপাশে ন্যূনতম দুই বছরের জন্য সামাজিক বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। এরপরেও, তারা ঘোষণা করেন যে, এসকল জমিতে আবার পশুচারণ হবে না, কিন্তু গবাদি পশুদের গোশালায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তারা সুনিশ্চিত ছিলেন যে এই পশুচারণের মাঠগুলো যা তারা গড়ে তুলেছেন তা তাদের গবাদিপশুদের জন্য ভবিষ্যতেও খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।

এই অভিজ্ঞতার একটি মজদার দিক হল, সম্প্রদায়টির এই পশুচারণ ভূমি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পূর্বে এই ভূমিটিতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের অপর এক গ্রামবাসী এই অঞ্চলটি জবর দখল করেছিল। গ্রামের লোকজন তহশীলদারের দ্বারস্থ হয় যাতে তারা সর্বজনীন মালিকানাধীন ভূমিটির অধিকার পেতে পারে। এই বিবাদ মেটাতে গ্রামবাসীরা সেই অবৈধ দখলদারকে তাদের দলের একজন সদস্য করে নেন এবং সর্বজনের জমি/পশুচারণ ভূমির সবুজায়নের সুফলগুলো ভোগ করার সুযোগ উনাকেও করে দেন (জমি, সম্পত্তি এবং কৃষি অধ্যায়ের সর্বজনীন সম্পত্তির সংস্থান অংশটি দেখো)।

চিত্র 12.4 : ঝাবুয়ার সর্বজনের মালিকানাধীন অবস্থার জমিতে চা রোপণ

উৎস ঃ Evaluation Report, Rajiv Gandhi Mission for Watershed Management, Government of Madhya Pradesh, 2002

চিত্র 12.5 : ঝাবুয়ার সর্বজনীন মালিকানা জমিকে সমতল করার কাজে সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

অনুশীলন (EXERCISES)

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।
   (i) নিম্নের কোনোটি সর্বাধিক দূষিত নদী ?
      (a) ব্রহ্মপুত্র (c) যমুনা
      (b) শতদ্রু (d) গোদাবরী
   (ii) নিম্নে উল্লেখিত কোনো রোগটি জলদূষণের কারণে হয় ?
      (a) কনজাংটিভাইটিস্ (c) শ্বসন অঙ্গে সংক্রমণ
      (b) ডায়ারিয়া (d) ব্রংকাইটিস্
   (iii) নিম্নের কোন্‌টি অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ ?
      (a) জলদূষণ (c) শব্দ দূষণ
      (b) ভূমি দূষণ (d) বায়ু দূষণ
   (iv) আকর্ষক এবং বিকর্ষক উপাদানটি দায়ী হল —
      (a) পরিব্রাজন (c) বস্তি
      (b) ভূমির অবক্ষয় (d) বায়ু দূষণ
2. নিম্নের প্রশ্নোগুলো প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।
   (i) দূষক ও দূষণের মধ্যে পার্থক্য কী ?
   (ii) বায়ু দূষণের প্রধান উৎসগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করো।
   (iii) ভারতের পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যাগুলো উল্লেখ করো।
   (iv) মানব স্বাস্থ্যে বায়ুদূষণের প্রভাবগুলো কী কী ?
3. নিম্নের প্রশ্নগুলো প্রতিটি 150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও।
   (i) ভারতের জল দূষণের প্রকৃতি বর্ণনা করো।
   (ii) ভারতের বস্তিগুলোর সমস্যা বর্ণনা করো।
   (iii) ভূমির অবনমন বা অবক্ষয় হ্রাস করার ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ দাও।

পরিশিষ্ট (i)

ভারত ঃ রাজ্য ভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন, ঘনত্ব এবং বৃদ্ধি, 2011

রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত কোড	ভারত/রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল #	মোট জনসংখ্যা ব্যক্তিবর্গ	জাতীয় ভাগ (%)	ঘনত্ব	দশকীয় বৃদ্ধি হার 2001-11
	ভারত	**1210193422**	**100**	**382**	**17.64**
01	জম্মু ও কাশ্মীর	12,548,926	1.04	124	23.71
02	হিমাচল প্রদেশ	6,856,509	0.57	123	12.81
03	পাঞ্জাব	27,704,236	2.29	550	13.73
04	চণ্ডীগড় #	1,054,686	0.09	9,252	17.10
05	উত্তরাখণ্ড	10,116,752	0.84	189	19.17
06	হরিয়ানা	25,353,081	2.09	573	19.90
07	জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি #	16,753,235	1.38	11,297	20.96
08	রাজস্থান	68,621,012	5.67	201	21.44
09	উত্তরপ্রদেশ	199,581,477	16.49	828	20.09
10	বিহার	103,804,637	8.58	1,102	25.07
11	সিকিম	607,688	0.05	86	12.36
12	অরুণাচলপ্রদেশ	1,382,611	0.11	17	25.92
13	নাগাল্যান্ড	1,980,602	0.16	119	-0.47
14	মণিপুর	2,721,756	0.22	122	18.65
15	মিজোরাম	1,091,014	0.09	52	22.78
16	ত্রিপুরা	3,671,032	0.30	350	14.75
17	মেঘালয়	2,964,007	0.24	132	27.82
18	আসাম	31,169,272	2.58	397	16.93
19	পশ্চিমবঙ্গ	91,347,736	7.55	1,029	13.93
20	ঝাড়খণ্ড	32,966,238	2.72	414	22.34
21	ওড়িশা	41,947,358	3.47	269	13.97
22	ছত্তিশগড়	25,540,196	2.11	189	22.59
23	মধ্যপ্রদেশ	72,597,565	6.00	236	20.30
24	গুজরাট	60,383,628	4.99	308	19.17
25	দমন ও দিউ #	242,911	0.02	2,169	53.54
26	দাদরা ও নগর হাবেলি #	342,853	0.03	698	55.50
27	মহারাষ্ট্র	112,372,972	9.29	365	15.99
28	অন্ধ্রপ্রদেশ	84,665,533	7.00	308	11.10
29	কর্ণাটক	61,130,704	5.05	319	15.67
30	গোয়া	1,457,723	0.12	394	8.17
31	লাক্ষাদ্বীপ #	64,429	0.01	2,013	6.23
32	কেরালা	33,387,677	2.76	859	4.86
33	তামিলনাড়ু	72,138,958	5.96	555	15.60
34	পুদুচেরি #	1,244,464	0.10	2598	27.72
35	আন্দামান ও নিকেবর দ্বীপপুঞ্জ #	379,944	0.03	46	6.68

উৎস ঃ *Census of India, 2011*

পরিশিষ্ট (ii)

ভারত ঃ দশকীয় জন্মহার, মৃত্যু হার এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, 1901 – 2011

দশক	স্থূল জন্ম হার 1000	স্থূল মৃত্যু হার 1000	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (প্রতি 1000)
1901 - 1911	49.2	42.6	6.6
1911 - 1921	48.1	47.2	0.9
1921 - 1931	46.4	36.2	10.2
1931 - 1941	45.9	37.2	8.7
1941 - 1951	39.9	27.4	12.5
1951 - 1961	41.7	22.8	18.9
1961 - 1971	41.1	19.0	22.1
1971 - 1981	37.2	15	22.2
1981 - 1991	29.5	9.8	19.7
1991 - 2001	25.4	8.4	17.0
2001 - 2011	21.8	7.1	14.7

** উৎস ঃ Sample Registration System (SRS) Bulletin, October 2012*

সারণি ঃ পরিব্রাজনের ধারা নির্দেশকারী অন্তিম বাসস্থান ভিত্তিক পরিব্রাজন (স্থিতিকাল 0-9 বছর) ভারত, 2001

পরিব্রাজন প্রবাহ/ধারা	অন্তঃ রাজ্য		আন্তঃ রাজ্য	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
গ্রামীণ – গ্রামীণ	9985581	38894493	1759523	2714779
গ্রামীণ – পৌর	6503461	7718115	3803737	2569218
পৌর – গ্রামীণ	2057789	3155362	522916	530436
পৌর – পৌর	4387563	5510731	221882	2288598

উৎস ঃ Data Highlights, Census of India, 2001

পরিশিষ্ট (iii)

ভারত ঃ গ্রামীণ ও পৌর জনসংখ্যা 2011

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	ভারত/রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জনসংখ্যা		শতকরা পৌর • জনসংখ্যা
		গ্রামীণ	পৌর	
	ভারত	**833087662**	**377,105,760**	**31.16**
01	জম্মু ও কাশ্মীর	9,134,820	3,414,106	27.21
02	হিমাচল প্রদেশ	6,167,805	688,704	10.04
03	পাঞ্জাব	17,316,800	10,387,436	37.49
04	চণ্ডীগড়	29,004	1,025,682	97.25
05	উত্তরাখণ্ড	7,025,583	3,091,169	30.55
06	হরিয়ানা	16,531,493	8,821,588	34.79
07	জাতীয় রাজধানী	419,319	16,333,916	97.50
08	রাজস্থান	51,540,236	17,080,776	24.89
09	উত্তরপ্রদেশ	155,111,022	44,470,455	22.28
10	বিহার	92,075,028	11,729,609	11.30
11	সিকিম	455,962	151,726	24.97
12	অরুনাচলপ্রদেশ	1,069,165	313,446	22.67
13	নাগাল্যান্ড	1,406,861	573,741	28.97
14	মণিপুর	1,899,624	822,132	30.21
15	মিজোরাম	529,037	561,977	51.51
16	ত্রিপুরা	2,710,051	960,981	26.18
17	মেঘালয়	2,368,971	595,036	20.08
18	আসাম	26,780,516	4,388,756	14.08
19	পশ্চিমবঙ্গ	62,213,676	29,134,060	31.89
20	ঝাড়খণ্ড	25,036,946	7,929,292	24.05
21	ওড়িশা	34,951,234	6,996,124	16.68
22	ছত্তিশগড়	19,603,658	5,936,538	23.24
23	মধ্যপ্রদেশ	52,537,899	20,059,666	27.63
24	গুজরাট	34,670,817	25,712,811	42.58
25	দমন ও দিউ	60,331	182,580	75.16
26	দাদরা ও নগর হাবেলী	183,024	159,829	46.62
27	মহারাষ্ট্র	61,545,441	50,827,531	45.23
28	অন্ধ্রপ্রদেশ	56,311,788	28,353,745	33.49
29	কর্ণাটক	37,552,529	23,578,175	38.57
30	গোয়া	551,414	906,309	62.17
31	লাক্ষাদ্বীপ	14,121	50,308	78.08
32	কেরালা	17,455,506	15,932,171	47.72
33	তামিলনাড়ু	37,189,229	34,949,729	48.45
34	পুদুচেরি	394,341	850,123	68.31
35	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	244,411	135,533	35.67

পরিশিষ্ট (iv)

ভারত ঃ ধর্মীয় শ্রেণিসমূহের শতকরা ভাগ।

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন	অন্যান্য ধর্ম	ধর্ম যা উল্লেখিত নয়
জম্মু ও কাশ্মীর	28.44	68.31	0.28	1.87	0.90	0.02	0.01	0.16
হিমাচল প্রদেশ	95.17	2.18	0.18	1.16	1.15	0.03	0.01	0.12
পাঞ্জাব	38.49	1.93	1.26	57.69	0.12	1.16	0.04	0.32
চণ্ডীগড়	80.78	4.87	0.83	13.11	0.11	0.19	0.02	0.10
উত্তরাখণ্ড	82.97	13.95	0.37	2.34	0.15	0.09	0.01	0.12
হরিয়ানা	87.46	7.03	0.20	4.91	0.03	0.21	0.01	0.17
দিল্লি	81.68	12.86	0.87	3.40	0.11	0.99	0.01	0.08
রাজস্থান	88.49	9.07	0.14	1.27	0.02	0.91	0.01	0.10
উত্তরপ্রদেশ	79.73	19.26	0.18	0.32	0.10	0.11	0.01	0.29
বিহার	82.69	16.87	0.12	0.02	0.02	0.02	0.01	0.24
সিকিম	57.76	1.62	9.91	0.31	27.39	0.05	2.67	0.30
অরুনাচল প্রদেশ	29.04	1.95	30.26	0.24	11.77	0.06	26.20	0.48
নাগাল্যান্ড	8.75	2.47	87.93	0.10	0.34	0.13	0.16	0.12
মণিপুর	41.39	8.40	41.29	0.05	0.25	0.06	8.19	0.38
মিজোরাম	2.75	1.35	87.16	0.03	8.51	0.03	0.07	0.09
ত্রিপুরা	83.40	8.60	4.32	0.03	3.41	0.02	0.04	0.14
মেঘালয়	11.53	4.40	74.59	0.10	0.33	0.02	8.71	0.32
আসাম	61.47	34.22	3.74	0.07	0.18	0.08	0.09	0.16
পশ্চিমবঙ্গা	70.54	27.01	0.72	0.07	0.31	0.07	1.03	0.25
উত্তরাখণ্ড	67.83	14.53	4.30	0.22	0.03	0.05	12.84	0.21
ওড়িশা	93.63	2.17	2.77	0.05	0.03	0.02	1.14	0.18
ছত্তিশগড়	93.25	2.02	1.92	0.27	0.28	0.24	1.94	0.09
মধ্যপ্রদেশ	90.89	6.57	0.29	0.21	0.30	0.78	0.83	0.13
গুজরাট	88.57	9.67	0.52	0.10	0.05	0.96	0.03	0.10
দমন ও দিউ	90.50	7.92	1.16	0.07	0.09	0.21	0.03	0.10
দাদরা ও নগর হাবেলী	93.93	3.76	1.49	0.06	0.18	0.35	0.09	0.14
মহারাষ্ট্র	79.83	11.54	0.96	0.20	5.81	1.25	0.16	0.25
অন্ধ্রপ্রদেশ	88.46	9.56	1.34	0.05	0.04	0.06	0.01	0.48
কর্ণাটক	84.00	12.92	1.87	0.05	0.16	0.72	0.2	0.27
গোয়া	66.08	8.33	25.10	0.10	0.08	0.08	0.02	0.21
লাক্ষাদ্বীপ	2.77	96.58	0.49	0.01	0.02	0.02	0.01	0.10
কেরালা	54.73	26.56	18.38	0.01	0.01	0.01	0.02	0.26
তামিলনাড়ু	87.58	5.86	6.12	0.02	0.02	0.12	0.01	0.26
পুদুচেরি	87.30	6.05	6.29	0.02	0.04	0.11	0.01	0.17
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	69.45	8.52	21.28	0.34	0.09	0.01	0.15	0.18

উৎস ঃ *Census of India, 2011*

পরিশিষ্ট (v)

ভারত ঃ কাজে অংশীদারিত্বের হার এবং পেশাগত গঠন, 2011

রাজ্যসমূহ/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ	কাজের অংশীদারিত্বের হার (%)	কৃষক	মোট কর্মীর % হার	কৃষি শ্রমিক	মোট কর্মীর % হার	দেশীয় শিল্প	মোট কর্মীর % হার	অন্যান্য শ্রমিক	মোট কর্মীর % হার
ভারত	**39.8**	**11,86,92,640**	**24.6**	**14,43,29,833**	**30**	**1,83,36,307**	**3.8**	**20,03,84.531**	**41.6**
জম্মু ও কাশ্মীর	34.5	12,45,316	28.8	5,47,705	12.7	1,72,586	4	23,57,106	54.5
হিমাচল প্রদেশ	51.9	20,62,062	57.9	1,75,038	4.9	58,719	1.6	12,63,603	35.5
পাঞ্জাব	35.7	19,34,511	19.5	15,88,455	16	3,85,960	3.9	59,88,436	60.5
চণ্ডীগড়	38.3	2,578	0.6	1,687	0.4	4,799	1.2	3,95,072	97.8
উত্তরাখণ্ড	38.4	15,80,423	40.8	4,03,301	10.4	1,14,312	3	17,74,239	45.8
হরিয়ানা	35.2	24,80,801	27.8	15,28,133	17.1	2,62,280	2.9	46,45,294	52.1
জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি	33.3	33,398	0.6	39,475	0.7	1,81,852	3.3	53,32,324	95.4
রাজস্থান	43.6	1,36,18,870	45.6	49,39,664	16.5	7,20,573	2.4	1,06,07,148	35.5
উত্তরপ্রদেশ	32.9	1,90,57,888	29	1,99,39,223	30.3	38,98,590	5.9	2,29,19,014	34.8
বিহার	33.4	71,96,226	20.7	1,83,45,649	52.8	14,11,208	4.1	77,71,904	22.4
সিকিম	50.5	1,17,401	38.1	25,986	8.4	5,143	1.7	1,59,608	51.8
অরুনাচলপ্রদেশ	42.5	3,02,723	51.5	36,171	6.2	8,365	1.4	2,40,398	40.9
নাগাল্যান্ড	49.2	5,37,702	55.2	62,962	6.5	22,838	2.3	3,50,620	36
মণিপুর	45.1	4,57,891	39.5	1,11,061	9.6	89,495	7.7	5,00,606	43.2
মিজোরাম	44.4	2,29,603	47.2	41,787	8.6	7,852	1.6	2,07,463	42.6
ত্রিপুরা	40	2,95,947	20.1	3,53,618	24.1	41,496	2.8	7,78,460	53
মেঘালয়	40	4,94,675	41.7	1,98,364	16.7	20,488	1.7	4,72,092	39.8
আসাম	38.4	40,61,627	33.9	18,45,346	15.4	4,91,321	4.1	55,71,396	46.5
পশ্চিমবঙ্গ	38.1	51,16,668	14.7	1,01,88,842	29.3	24,64,124	7.1	1,69,86,701	48.9
ঝাড়খণ্ড	39.7	38,14,832	29.1	44,36,052	33.9	4,55,162	3.5	43,92,228	33.5
ওড়িশা	41.8	41,03,989	23.4	67,39,993	38.4	7,83,080	4.5	59,14,527	33.7
ছত্তিশগড়	47.7	40,04,796	32.9	50,91,882	41.8	1,87,631	1.5	28,95,916	23.8
মধ্যপ্রদেশ	43.5	89,44,439	31.2	1,21,92,267	38.6	9,59,259	3	85,78,168	27.2
গুজরাট	41	54,47,500	22	68,39,415	27.6	3,43,999	1.4	1,21,36,833	49
দমন ও দিউ	49.9	2,316	1.9	772	0.6	684	0.6	1,17,499	96.9
দাদরা ও নগর হাবেলী	45.7	28,164	17.9	17,799	11.3	2,195	1.4	1,09,003	69.4
মহারাষ্ট্র	44	1,25,69,373	25.4	1,34,86,140	27.3	12,25,426	2.5	2,21,46,939	44.8
অন্ধ্রপ্রদেশ	46.6	64,91,522	16.5	1,69,67,754	43	14,39,137	3.7	1,45,24,493	36.8
কর্ণাটক	45.6	65,80,649	23.6	71,55,963	25.7	9,13,227	3.3	1,32,22,758	47.4
গোয়া	39.6	31,354	5.4	26,760	4.6	14,708	2.5	5,04,426	87.4
লাক্ষাদ্বীপ	29.1	0	0	0	0	264	1.4	18,489	98.6
কেরালা	34.8	6,70,253	5.8	13,22,850	11.4	2,73,022	2.3	93,52,938	80.5
তামিলনাড়ু	45.6	42,48,457	12.9	96,06,547	29.2	13,64,893	4.2	1,76,64,784	53.7
পুদুচেরি	35.7	12,099	2.7	68,391	15.4	7,892	1.8	3,56,586	80.1
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	40.1	16,567	10.9	4,781	3.1	3,727	2.4	1,27,460	83.6

উৎস : Census of India, 2011

পরিশিষ্ট (vi)

সারণি *1* ঃ ভারতের ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ, ***2008-09***

ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি	1960-61* (‘ 000 হেক্টর)	2008-09** (মিলিয়ন হেক্টর)	
Reporting Area	**299151**	**305.69**	**100%**
বনভূমি	54189	69.63	22.78%
অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি	14795	26.31	8.61%
অনুর্বর ও পরিত্যক্ত জমি	35921	17.02	5.57%
স্থায়ী তৃণভূমি ও চারণভূমির অন্তর্গত অঞ্চল	14082	10.34	3.38%
বিবিধ খামার ফসল ও কুঞ্জবন হিসাবে ব্যবহৃত ভূমি	4500	3.40	1.11%
চাষযোগ্য পরিত্যক্ত ভূমি	18632	12.76	4.17%
আপাতত পতিতভূমি ব্যতীত অন্য পতিত ভূমি	10478	10.32	3.37%
আপাতত পতিত ভূমি	11155	14.54	4.76%
মোট কৃষিজ ভূমি	135399	141.36	46.24%

*উৎস ঃ *Statistical Abstract of India*
*** Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture 2008-09*

সারণি 2 ঃ 1993-94 সালের মূল্যে ক্ষেত্রে ভিত্তিক দেশীয় উৎপাদন

(in Rs. Crores)

ক্ষেত্র	1960-61	1999-2000
প্রাথমিক	112848	314252
দ্বিতীয় স্তর	34239	279066
তৃতীয় স্তর	59793	555049
মোট দেশীয় উৎপাদন	206880	1148367

উৎস ঃ Economic Survey, Government of India

সারণি *3* ঃ ভারতের প্রধান ফসলের উৎপাদিত অঞ্চল ও ফলন

ক্রমিক নং	ফসল	বিশ্বের উৎপাদনে শতকরা ভাগ ও ক্রম (2011)	আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর) (2010-11)*	উৎপাদন (কি.মি/হেক্টর) (2010-11)*	% সেচের অন্তর্গত (2008-09)
1	ধান	21.7 (দ্বিতীয়)	42.6	2240.0	58.7
2	গম	12.3 (দ্বিতীয়)	29.2	2938.0	91.3
3	জোয়ার	NA	7.1	956.0	8.9
4	বাজরা	NA	9.4	1069.0	9.4
5	ভুট্টা	NA	8.5	2507.0	25.2
I	**মোট দানাশস্য**	**11.1 (তৃতীয়)**	99.4	2247.0	55.9
6	ছোলা	NA	9.2	896.0	33.6
7	অড়হর	NA	4.4	655.0	4.5
II	**সব ধরনের ডাল**	**25.9 (প্রথম)**	26.3	689.0	**16.0**
III	**মোট খাদ্যশস্য**	**NA**	125.7	1921.0	**48.3**
8	চিনাবাদাম	18.2 (দ্বিতীয়)	6.0	1268.0	20.9
9	র‍্যাপসিড	13.7 (তৃতীয়)	6.5	1179.0	73.9
IV	**মোট তৈলবীজ**	**NA**	26.8	1159.0	27.1
10	কার্পাস	32.5 (দ্বিতীয়)	11.1		35.3
11	পাট	54.7 (প্রথম)	0.8	2344.0	
12	আখ	19 (দ্বিতীয়)	4.9	69.0 (টন/হেক্টর)	93.7
13	চা	20.6 (দ্বিতীয়)	0.6	1500.0c	NA
14	কফি	3.6 (সপ্তম)	0.4	750.0 c	NA

* কাঁচামাল

পাওয়া যায় না।

উৎস ঃ *Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation and FAO, Regional office for Asia and the Pacific, Bangkok and India's Position in world Agriculture in 2011– Pocket Book on Agricultural Statistics - 2013.*

সারণি *4* ঃ 20015-16 সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৃহত্তম রাজ্য

উৎপাদন—মিলিয়ন টন

ফসলের শ্রেণি	ফসল	রাজ্য	উৎপাদন
1	2	3	4
1. খাদ্য শস্য			
	ধান	পশ্চিমবঙ্গ	15.75
		উত্তরপ্রদেশ	12.51
		পাঞ্জাব	11.82
		ভারত	**104.32**
	গম	উত্তরপ্রদেশ	26.87
		মধ্যপ্রদেশ	17.69
		পাঞ্জাব	16.08
		ভারত	**93.50**
	ভুট্টা	কর্ণাটক	3.27
		মধ্যপ্রদেশ	2.58
		বিহার	2.40
		ভারত	**21.81**
	মোট মোটা দানাশস্য	রাজস্থান	5.91
		কর্ণাটক	5.70
		মধ্যপ্রদেশ	3.83
		ভারত	**37.94**
	মোট ডাল	মধ্যপ্রদেশ	5.12
		রাজস্থান	1.95
		মহারাষ্ট্র	1.41
		ভারত	**16.47**
	মোট খাদ্য শস্য	উত্তরপ্রদেশ	44.01
		মধ্যপ্রদেশ	30.21
		পাঞ্জাব	28.41
		ভারত	**252.22**
II. তৈল বীজ			
	চিনাবাদাম	গুজরাট	2.36
		রাজস্থান	1.06
		তামিলননাড়ু	0.88
		ভারত	**6.77**
	র‍্যাপসিড ও সরিষা	রাজস্থান	3.27
		হরিয়ানা	0.81
		মধ্যপ্রদেশ	0.70
		ভারত	**6.82**
	সয়াবিন	মধ্যপ্রদেশ	4.91
		মহারাষ্ট্র	2.10
		রাজস্থান	1.00
		ভারত	**8.59**
	সূর্যমুখী	কর্ণাটক	0.17
		হরিয়ানা	0.04
		অন্ধ্রপ্রদেশ	0.02
		ভারত	**0.33**

Group of Crops	Crops	States	Production
1	2	3	4
	মোট তৈলবীজ	মধ্যপ্রদেশ	6.24
		রাজস্থান	5.71
		গুজরাট	4.10
		ভারত	**25.30**
III. অন্যান্য অর্থকরী ফসল			
	আখ	উত্তরপ্রদেশ	145.39
		মহারাষ্ট্র	72.26
		কর্ণাটক	38.48
		ভারত	**352.16**
	কার্পাস *	গুজরাট	9.7
		মহারাষ্ট্র	6.5
		তেলেঙ্গানা	3.86
		ভারত	**30.15**
	পাট ও মেস্তা **	পশ্চিমবঙ্গ	7.78
		বিহার	1.58
		আসাম	0.89
		ভারত	**10.46**

** : উৎপাদন প্রতি আঁটি 170 কি.গ্রা. মিলিয়ন*

*** : উৎপাদন প্রতি আঁটি 180 কি.গ্রা. মিলিয়ন*

উৎস : *Pocket Book of Agricultural Statistics 2016*

পরিশিষ্ট (vii)

ভারত ঃ রাস্তার ঘনত্ব–*2011*

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	আয়তন (বর্গ কিমি)	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমিতে)	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমিতে) (প্রতি 100 বর্গ কিমি অঞ্চল)
অন্ধ্রপ্রদেশ	275045	238,001	86.53
অরুণাচলপ্রদেশ	83743	21,555	25.74
আসাম	78438	241,789	308.74
বিহার	94163	130,642	138.74
ছত্তিশগড়	135191	93,965	69.51
গোয়া	3702	10,627	287.06
গুজরাট	196024	156,188	79.68
হরিয়ানা	44212	41,729	94.38
হিমাচল প্রদেশ	55673	47,963	86.15
জম্মু ও কাশ্মীর	222236	26,980	12.14
ঝাড়খণ্ড	79714	23,903	29.99
কর্ণাটক	191791	281,773	146.92
কেরালা	38863	201,220	517.77
মধ্যপ্রদেশ	308245	197,293	64.01
মহারাষ্ট্র	307713	410,521	133.41
মণিপুর	22327	19,133	85.70
মেঘালয়	22429	11,984	53.43
মিজোরাম	21081	9,810	46.53
নাগাল্যান্ড	16579	34,146	205.96
ওড়িশা	155707	258,836	166.23
পাঞ্জাব	50362	84,193	167.18
রাজস্থান	342239	241,318	70.51
সিকিম	7096	4,630	65.25
তামিলনাড়ু	130058	192,339	147.89
ত্রিপুরা	10486	33,772	322.07
উত্তরাখণ্ড	53483	49,277	92.14
উত্তরপ্রদেশ	240928	390,256	161.98
পশ্চিমবঙ্গ	88752	299,209	337.13
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল			
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	8249	1,386	16.81
চন্ডীগড়	114	2,284	2,003.94
দাদরা ও নগর হাবেলি	491	808	164.61
দমন ও দিউ	112	236	211.08
দিল্লি	1483	29,648	1,999.18
লাক্ষাদ্বীপ	32	190	594.69
পুদুচেরি	479	2,740	572.10
ভারত (জওহর রোজগার যোজনায় নির্মিত রাস্তা বহির্ভূত)	3287240	**3,790,342**	**115.30**
ভারত (জওহর রোজগার যোজনায় নির্মিত রাস্তা বহির্ভুত)		**4,690,342**	**142.68**

উৎস ঃ *Basic Road Statistics of India 2008-09, 2009-10 & 2010-11. Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi, August 2012*

এক নজরে অন্ধ্রপ্রদেশ

ভৌগোলিক আয়তন (বর্গকিমি)	160,205
মোট জনসংখ্যা (Lakh)	496.7
পুরুষ জনসংখ্যা (Lakh)	247.3 (49.9%)
মহিলা জনসংখ্যা (Lakh)	246.4 (49.9%)
লিঙ্গানুপাত (প্রতি 1000 জন পুরুষে মহিলা)	996
স্বাক্ষরতার হার (%)	67.41

উৎসঃ www.ap.gov.in/AP

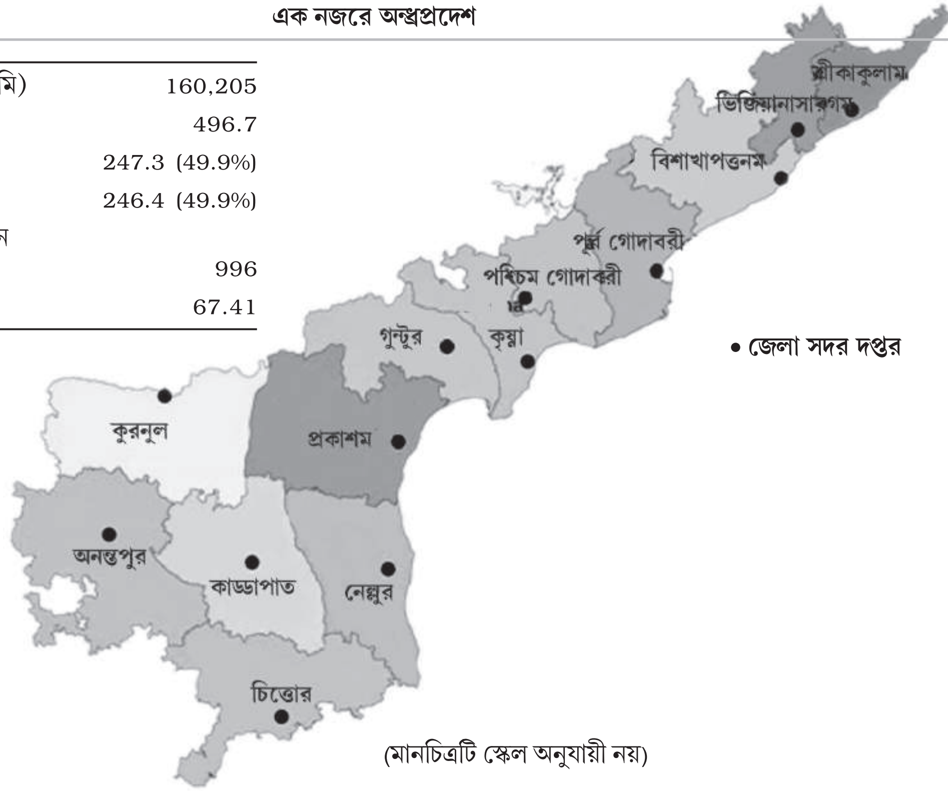

(মানচিত্রটি স্কেল অনুযায়ী নয়)

এক নজরে তেলেঙ্গানা

ভৌগোলিক আয়তন (বর্গকিমি)	112077
মোট জনসংখ্যা (2011 জনগণনা অনুযায়ী)	350.04 Lakh
পুরুষ	176.12 Lakh
মহিলা	173.92 Lakh
লিঙ্গানুপাত (প্রতি 1000 জন পুরুষে মহিলা)	988 Ratio
স্বাক্ষরতার হার	66.54%
জনঘনত্ব	312/sq.km
দশকীয় বৃদ্ধি হার (2001–2011)	13.58

উৎস ঃ *TG State portal Website: http://www.telangana.gov.in/About–State profile*

(মানচিত্রটি স্কেল অনুযায়ী নয়)

শব্দকোশ (GLOSSARY)

কৃষি-জলবায়ু (Agro-climatic)
জলবায়ু ও ভূমি সম্পদের সামগ্রিক পরিস্থিতি যা একটি অঞ্চলের কৃষি এবং তৎসহ অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভৌম জলধার বা অ্যাকুইফার (Aquifer)
একটি পরিপৃক্ত ভূতাত্ত্বিক একক (উদাহরণ: বালি, নুড়ি, ভগ্ন শিলা) যা একটি গর্তের সহায়তায় যথেষ্ট পরিমাণে কূপগুলোতে জল সরবরাহ করতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে ভৌম জলের পুনরুজ্জীবন (Artificial Recharge to Groundwater)
কৃত্রিম উপায়ে ভৌম জলের পুনরুজ্জীবনের অর্থ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূ-নিম্নস্থ জলাধারকে পুনরুদ্ধারের প্রাকৃতিক অবস্থাকে অধিক হারে বৃদ্ধি করা হয়।

কমাণ্ড অঞ্চল (Command Area)
সেচ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি খাল ব্যবস্থার দ্বারা জল সরবরাহের মাধ্যমে সেবিত অঞ্চল।

চাষযোগ্য কমান্ড অঞ্চল (Culturable command area)
এটি একটি খাল ব্যবস্থার দ্বারা সেচযুক্ত চাষযোগ্য জমিকে বোযায়। এটি স্থুল কমান্ড অঞ্চল থেকে পৃথক। স্থুল কমান্ড অঞ্চল একটি খাল ব্যবস্থার দ্বারা সেবিত সমস্ত জমির সাথে অ-কৃষিযোগ্য জমিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

বাস্তু সংস্থানিক উন্নয়ন (Eco-development)
অবনমিত বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতান্ত্রিক ধারন ক্ষমতার সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

প্রসবন (Emigration)
উপার্জন, জীবনযাপন, বাসস্থান এবং বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সাধারনত এক দেশ থেকে অপর একটি দেশে জনসাধারনের চলে যাওয়াকে বোঝায়।

ব্যাপক জলসেচ (Extensive irrigation)
জলসেচ উন্নয়নের একটি কৌশল যোখানে একটি বিশাল অঞ্চলে সেচের জল দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রতি একক এলাকায় জলের ব্যবহার এক্ষেত্রে কম।

প্রবাহ পদ্ধতি বা প্রণালী (Flow system or channel)
খালের একটি প্রণালী যেখানে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে জল প্রবাহিত হয়।

ভৌম জল (Groundwater)
পরিপৃক্ত অঞ্চলের ভৌমস্তরের নীচে যে জল অবস্থান করে তাকে ভৌমজল বোঝায় এবং একে কূপ অথবা অন্যান্য পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয় অথবা প্রস্রবন রূপে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং ভিত্তি প্রবাহ (Base flow) রূপে ছড়া ও নদীতে প্রবাহিত হয়।

ভৌম জলের স্তর (Groundwater Table)
ভৌমজলস্তর হল সেই শীর্ষ অবস্থান যেখানে সমস্ত ছিদ্রযুক্ত স্থান বা ফাটল সম্পূর্ণ জলে পরিপূর্ণ থাকে।

অভিবাসন (Immigration)
এক অঞ্চল থেকে অন্য একটি অঞ্চলে সাধারনত বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ব্যক্তির চলাচলকে বোঝায়।

অন্ত:সারী জলসেচ (Intrusive irrigation)
জলসেচ উন্নয়নের একটি কৌশল যেখানে প্রতি একক জলের প্রয়োগ বেশি।

উত্তোলন পদ্ধতি বা প্রণালী (Lift system or channel)
খালের একটি প্রণালী যেখানে জলকে ভূমির ঢালের বিপরীতে উপরে তোলার জন্য প্রবাহিত করতে বাধ্য করা হয়।

পরিযান / প্রব্রজন (Migration)
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য একটি স্থানে বা বিদেশে জনসাধারণের চলাচলকে বোঝায়।

পরিযান স্রোত (Migration stream)
পরিযান স্রোত বলতে সাধারণ উৎস এর গন্তব্যসহ এক দল পরিযায়ীকে বোঝায়।

মোট পরিযান বা পরিযানের ভারসাম্য (Net migration or balance of migration)
কোন স্থানে আগমন এবং ছেড়ে চলে যাওয়া মোট ব্যক্তি সংখ্যার পার্থক্য। অন্য কথায়, এটি হল আগত পরিযায়ী ও অভিবাসীর সমষ্টি থেকে চলে যাওয়া পরিযায়ী ও প্রবাসীদের সমষ্টির বিয়োগফল। গাণিতিক শব্দে এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেমন-

মোট পরিযান (Net migration) =
(আগত পরিযায়ী + অভিবাসী) – (চলে যাওয়া পরিযায়ী + প্রবাসী)

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting)
ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভস্থ (Subsurface) অ্যাকুইফার বা ভৌমজলাধারে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশলই হল বৃষ্টির জলসংরক্ষণ।

উদ্বাস্তু (Refugee)
মানুষ নিজের দেশে জীবন হুমকির মুখে থাকা পরিস্থিতি, নিরাপত্তাহীনতা, যুদ্ধ বা মানব অধিকার লঙ্ঘনের কারণে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

প্রেরণ (Remittance)
নিজের উৎসস্থলে পরিযায়ীদের পাঠানো সমস্ত নগদ বা উপকরণ। মানি ওর্ডার প্রেরণের একটি রূপ।

ঋতুনিয়ন্ত্রিত যাযাবর বৃত্তি (Transhuemance)
ঋতুভিত্তিক পরিযানের অনুশীলন যেখানে পশুচারণকারী সম্প্রদায়রা গ্রীষ্মকালে তাদের পশুদের নিয়ে চারণভূমির দিকে পরিযান করে। এই সম্প্রদায়গুলো শীতকালে তাদের স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে আসে।

ওয়ারবন্দি পদ্ধতি (Warebandi system)
এটি হল খালের নির্গমন পথের কমান্ড অঞ্চলে জলের একটি যথাযথ বন্টন পদ্ধতি।

জলাশয় (Watershed)
জলাশয় হল ভূমির একটি প্রাকৃতিক ভূ-জলবদ্যিার একক যা জল সংগ্রহ করে এবং প্রবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। এ জাতীয় একক কয়েক হেক্টরের ছোটো এলাকা হতে পারে অথবা গঙ্গা নদী উপত্যকার মতো কয়েকশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে হতে পারে।

REFERENCES

Alagh, Y. K. 1990. Agro-Climatic Planning and Regional Development, *Indian Journal of Agricultural Economics*, 45(3): 244-268.

Ashis Nandi (1998): Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity, *Oxford University Press*, Oxford.

Baker, Susan 2006. Sustainable Development, *Routledge*, London.

Bhalla, G. S. (ed.) 1994. Economic Liberalization and Indian Agriculture, *Institute for Studies in Industrial Development*, New Delhi

Chand, Mahesh and V. K. Puri, 1983. Regional Planning in India, *Allied Publishers Limited*, New Delhi.

Dantwala, M. L. and others 1986. Indian Agricultural Development Since Independence, *Indian Society of Agricultural Development*, New Delhi.

Elliot, Jennifer A 1994. An Introduction to Sustainable Development, *Routledge*, London.

Government of India. 1998. 'Water Statistics of India'. *Central Water Commission*, New Delhi.

Government of India. 1999. 'Integrated Water Resources Development – A Plan for Action'. *National Commission for Integrated Water Resources Development*, Ministry of Water Resources, New Delhi.

Government of India. 2002. 'National Water Policy 2002'. *Ministry of Water Resources*, New Delhi.

Government of India. 2002. Water Supply and Sanitation: A WHO – UNICEF Sponsored Study'. *Planning Commission*, New Delhi.

Ivan Illich (1981): The De-linking of Peace and Development, *Gandhi Marg*, pp.257-65.

Jaglan, M. S. 1990. Impact of Irrigation on Environmental and Socio-economic Conditions: A Case Study of Indira Gandhi Canal Command Area, unpublished thesis, CSRD, SSS, *Jawaharlal Nehru University*, New Delhi.

Jaglan, M. S. and M. H. Qureshi, 1996. Irrigation Development and Its Environmental Consequences in Arid Areas of India, *Environmental Management*, 20(3): 323-336.

Kumar, R, R. D. Singh and K. D. Sharma 2005. 'Water Resources of India', *Current Science*, 89(5), pp.794-811.

Kuper, A. and Jessica Kuper, 1989. The Social Science Encyclopedia, *Routledge Publishers*, New York.

Kurup, Raghava C. G. (ed.) 1966, Handbook of Agriculture, *Indian Council of Agricultural Research*, New Delhi.

Mahbub-ul-Haq (1993): Human Development in a Changing World, *United Nations Development Programme* (UNDP) Occasional Paper-4.

Mishra, R. P. 1988.On the Concept of Region and Regional Planning, in Moonis Raza (ed.) Contribution to Indian Geography: Regional Development, *Heritage Publishers*, New Delhi.

Paul, Streeten (1984); Basic Needs: Some Unsettled Questions, *World Development*, Vol.12, No. 9, pp. 973-78.

Paul, Streeten (1995): Human Development: The Debate about the Index, *International Social Science Journal* No. 143, pp-25-37.

Planning Commission of India, Eighth Five Year Plan (1992-97), Vol. I, *Government of India*, New Delhi.

Soni, V. 2003. 'Water Carrying Capacity of a City: Delhi'. *Economic and Political Weekly*, November, 8, pp.4745-4749.

Sudhir Anand and Amartya K.Sen. 1994. Human Development Index: Methodology and Measurement, *Human Development Report Office*, Occasional Papers, pp.1-19.

Sudhir Anand and Martin Ravallion. 1993. Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services, *Journal of Economic Perpectives*, Vol. 7, No. 1, pp.133-150.

Sundaram, K.V. 1986. Urban and Regional Planning in India, *Vikas Publishing House*, New Delhi.

Thakur, B. R. 2005. Socio-economic Transformation in Bharmaur Tribal Area of Himachal Pradesh since Inception of ITDP, unpublished PhD thesis, *Department of Geography, Kurukshetra University*, Kurukshetra

Tisdell, Clement A. 1990. Natural Resources, Growth and Development, *Prager Publishers*, New York.

UNDP. 1990-2003. Human Development Reports, *Oxford University Press*, Oxford.

Wilbanks, Thomas J. 1994. Sustainable Development in Geographic Perspective, *AAG*, 84 (4): 541-556.

World Commission on Environment and Development (WECD). 1987. Our Common Future, *Oxford University Press*, Oxford.

World Development Report. 1992. Development and Environment, *Oxford University Press*. Oxford.

Notes

Notes